নবপর্যায় ৪

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০২

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নবপর্যায় ৪

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০২

বিশ্বভারতী পত্রিকা নবপর্যায় ৪ : বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০২
সম্পাদক : প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ০ সহকারী সম্পাদক : সুবিমল লাহিড়ী

সূচিপত্র

চিত্রসূচি

প্রচ্ছদলিপি : বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

মুখাবয়ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ

বিশ্বভারতী পত্রিকা
নবপর্যায় ৪ : বৈশাখ আষাঢ় ১৪০২

একজন রুশ কৃষকের চিঠি

আলেক্‌সেয়ই পাভ্‌লোভিচ্‌ নাজ়ারোভ ছিলেন উত্তর রাশিয়ার চেরেপাভেৎস্‌ অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষক। জীবিকা ছিল চাষবাস আর মধুসংগ্রহ। এ ছাড়া বইপড়া আর বই সংগ্রহের নেশা। উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সামাজিক জীবনের এক বিশিষ্ট চিহ্নই ছিল শিক্ষিত জ্ঞানপিপাসু রুশ গ্রাম্য সমাজ। নাজ়ারোভ দর্শনচর্চাও করতেন। তাঁর মনে হয়েছিল সনাতন ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মিক দর্শনচিন্তা প্রাচ্যের সম্পদ, অন্য দিকে পশ্চিম হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক দার্শনিক সংস্কৃতির আধার। তাই তাঁর কৃষকমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সুর খুঁজে ফিরছিল। এরই তাগিদে তিনি নানা ধরনের দর্শন-সংক্রান্ত রচনা ও বই সংগ্রহ করেন এবং এক প্রকৃত দার্শনিক আদর্শে সমাজগঠনে উদ্যোগী হন।

জ্ঞানপিপাসু এই মানুষটি যখন নানা ধরনের রচনা পড়তে ব্যস্ত, তারই মধ্যে একবার তিনি তৎকালীন সুইজারল্যান্ডের লুসেন শহরের Institut International De Psychologie Bibliologique-এর গ্রন্থাগারিক অধ্যক্ষ ন. রুবাকিন-এর (১৮৬২-১৯৪৬) লেখা একটি বই 'ভেলিকাইয়া স্লোভা জিজ্‌নি' (জীবনের মূলমন্ত্র) পড়ে রুবাকিনকে একটি চিঠি লেখেন (২৫ অক্টোবর ১৯২৬)। চিঠিতে লেখেন : নাজ়ারোভ ভারতীয় দর্শনের পূজারী, ইতিমধ্যে উপনিষদ ও শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের কিয়দংশ পড়েছেন, এবং এসব রচনায় যে আধ্যাত্মিক জীবনের কর্মচিন্তা ব্যক্ত হয়েছে অনুরূপ ধ্যানধারণা তাঁকে এক নতুন ভাবনাচিন্তার পথ দেখিয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি কিছু গ্রীক ও জার্মান দার্শনিকের দর্শনতত্ত্বও চর্চা করেছেন। এইসব চর্চার উদ্দেশ্যে তিনি ও তাঁর এক বন্ধু মিলে রাশিয়ার এই সুদূর গ্রামে একটি ধর্মীয়, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক আশ্রম প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর বন্ধুটি বিবাহ ক'রে সস্ত্রীক আমেরিকা চলে যান। অতএব এমন পরিস্থিতিতে এসব ভাবনাচিন্তাকে বাস্তবায়িত করা তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়, এ বিষয়ে যদি রুবাকিন তাঁকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারেন তা হলে তিনি সত্যই উপকৃত হবেন। অবিবাহিত তিনি, একা থাকেন, বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হতে পারেন নি, ধর্ম ও দর্শন চর্চার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ; বর্তমানে তাঁর কর্মপরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে রুবাকিনের সাহায্য একান্তই দরকার। তাই রুবাকিনের কাছে সর্বাগ্রে তাঁর অনুরোধ, দর্শন ও ধর্ম -সংক্রান্ত কিছু বই যদি তিনি পাঠাতে পারেন, বর্তমান রাশিয়ায় এসব বইয়ের ক্রমশই বড়ো অভাব বোধ হচ্ছে।

নাজ়ারোভকে সময়মতো উত্তর না দিতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে রুবাকিন লিখছেন (১৯ জানুয়ারি ১৯২৭): চিঠি পড়ে তাঁকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছে এই ঘটনা যে রুশদেশের প্রত্যন্ত গ্রামবাসী একজন মানুষ আধ্যাত্মিক নীড়, জীবনীশক্তি ও মানবতাবোধের সন্ধানী। নাজ়ারোভের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন অবিলম্বে সেই পরিকল্পনার পাণ্ডুলিপি পাঠান। যদিও তা প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন, কারণ অর্থাভাব। রুবাকিন নাজ়ারোভের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করে জানতে চেয়েছেন: কবে থেকে কীভাবে এবং কী কারণে তিনি এই সত্যের সন্ধানী, সে সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করতে পারলে তিনি বুঝতে পারবেন যে সত্যের অনুগামী এই ব্যক্তিটি তাঁর সমভাবাপন্ন আরও অনেক মানুষকে খুঁজে পাবেন কি না। পরিশেষে রুবাকিন নাজ়ারোভের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

পরবর্তী চিঠিতে (১৯২৮) নাজ়ারোভ লিখছেন রুবাকিনকে, তিনি ভারতীয় দর্শনচিন্তার পুরোধা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি চিঠি লিখতে চান এবং সেই চিঠিটি পাঠাতে চান রুবাকিনেরই সাহায্যে। উত্তরে রুবাকিন তাঁর সম্মতি জানান এবং সেইসঙ্গে এও জানান যে ভারতে চিঠি পৌঁছোতে কিছু সময় লাগে। এ ছাড়া, চিঠিটি লেখা হবে রুশভাষায়, কাজেই কবি নিশ্চয় কোনো অনুবাদকের সাহায্য নিয়ে সেটি পড়বেন, ফলে উত্তর বিলম্বিত হবার সম্ভাবনা। তিনি আরও জানান যে চিঠিতে নাজ়ারোভ-এর একটি পরিচয়লিপি তিনি যুক্ত করে দেবেন, যাতে তাঁর চিঠিটিকে কবি অগ্রাধিকার দেন। এর পর নাজ়ারোভ রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিটি রুবাকিনের কাছে পাঠালে রুবাকিন চিঠিটির বিশেষ প্রশংসা করেন। কবি নিশ্চয় সব সময়েই পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে নানারকম অনুরোধে-আবেদনে ভরা চিঠি পান— সেই তুলনায় নাজ়ারোভের

এই চিঠি অত্যন্ত মার্জিত এবং ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাহীন, বুবাকিনকে এটা স্পর্শ করে। এর পর নাজারোভের কাজ হল কবির কাছ থেকে উত্তরের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করা এবং বার বার (২৪-১১-১৯২৯ ও ২২-৯-১৯৩০) বুবাকিনকে চিঠি লেখা। উত্তরে বুবাকিন প্রথমে জানান যে তাঁর চিঠি তিনি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং পরে লিখছেন, উত্তরের অপেক্ষা না করাই ভালো, কারণ অনুবাদ ব্যয়বহুল এবং কবি আদৌ কোনো অনুবাদক পাবেন কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। তা ছাড়া চিঠিটি এতবেশি দর্শনতত্ত্বসমৃদ্ধ, অনুবাদ করাও বেশ শক্ত আর সময়সাপেক্ষ। নাজারোভের ঠিকানা অবশ্য কবিকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং উত্তর তাঁর ঠিকানাতেও আসতে পারে। এর পর আবার বুবাকিন তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে শেষ পর্যন্ত না-ও পৌঁছোতে পারে উত্তর।

কিন্তু এতদিন পরে দেখা গেল যে নাজারোভের চিঠিটি আদৌ পৌঁছোয় নি রবীন্দ্রনাথের কাছে। সযত্নে সেটি সংরক্ষিত আছে মস্কোর রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি বিভাগে। সময়টা ছিল ১৯২৮ সাল, যখন সোভিয়েত সরকার সবরকম চিঠির আদানপ্রদানকে সরকারি খবরদারির আওতায় এনে ফেলেছেন। ফলে, আধ্যাত্মিক দর্শনতত্ত্বে সমৃদ্ধ এ-চিঠি কবির কাছে যাওয়ার পথেই হয়তো সরকারি দপ্তরে ধরা পড়ে যায়। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, বুবাকিন তো ছিলেন লুসেন শহরে, সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথকে এ-চিঠি পাঠাতে অসুবিধে হবে কেন। তারও কারণ ছিল। বুবাকিনের সবরকম আচরণ, চিঠিপত্র আর মতামতপ্রকাশের ব্যাপারে সোভিয়েত সরকার কড়া নজর রেখেছিলেন, লুসেন থেকে প্রেরিত তাঁর চিঠিপত্রও যেত সোভিয়েত দূতাবাসের ডাকযোগে।

রুশ কৃষকটি অধীর আগ্রহে যে-চিঠিটির উত্তরের অপেক্ষা করেছিলেন সেই চিঠি আজ এতদিনে এখানে নিয়ে আসা গেল। চিঠির লেখক আজ জীবিত নেই, প্রাপকেরও হাতে আর পৌঁছোল না সেটা, চিঠিটি রয়ে গেল কেবল উত্তরকালের জন্য। মস্কোতে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি-বিভাগ থেকে সংগৃহীত এই চিঠিটি (তহবিল ৩৫৮/তালিকা ২৫৬ ও ১৭৯/সংরক্ষণ ৫৩ ও ৪০) অনুবাদ করে এখানে ছাপা হল। —পূরবী রায়

রাশিয়া ৩১শে মার্চ ১৯২৮

ভারতের ঋষি কবিবর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনীষী সমীপেষু, আপনি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমি লিখছি সুদূর এক হিমেল দেশ থেকে, যেখানে এখনও শীতের প্রকোপ, শ্বেত শুভ্র তুষারে আচ্ছাদিত ধরণী, তুষারঝড় চারি দিকে জড়ো করেছে তুষারস্তূপ, অচ্ছদ গাছগুলি ক্লান্ত হয়ে বসন্তের আবির্ভাবের অপেক্ষায়। বিষণ্ণ দৈত্যের মতো ফারগাছগুলি ঋতুরাজের আশীর্বাদের প্রত্যাশায় ধ্যানমগ্ন ; প্রভাতের শৈত্য প্রবাহের আচ্ছাদনে আমার ঘরের জানলাগুলি জমাট বেঁধে গেছে— আর জানলাগুলির ধারে ধারে জমে থাকা স্ফটিকস্বচ্ছ তুষারখণ্ড এক অপূর্ব রহস্যময় দৃশ্যের অবতারণা করেছে। মনে হচ্ছে কোনো এক অজানা চিত্রকর বরফজমা জানলার কাঁচের উপর ফুল ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানা ধরনের গাছ-গাছালির ছবি এঁকেছেন— এসবই আমাদের শীতের আবহাওয়ার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রকৃতির শিল্প, এ বস্তুবাদ বা বিজ্ঞানবিশ্লেষণের অনেক উর্ধ্বে।

এমন এক প্রকৃতির চারপাশে গদ্যের মতো শুষ্ক রুক্ষ দরিদ্র জনগণ, এই দারিদ্র্য বিশেষত তাঁদের মনের। এমনই এক বেদনাময় প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে উত্তর রাশিয়ার এক গ্রাম্য জীবনের এই ছবি, আধ্যাত্মিকতা অথবা বস্তুবাদ কোনো কিছুই অনুভব করার সুযোগ এ পায় নি।

আমি কিন্তু এই মুহূর্তে এই রুক্ষ কঠিন পরিবেশ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছি। আপাতত বসে আছি একটা কাঠের আঁচে গরম হওয়া ঘরে, রুশ সামোভারে জল ফুটছে আর তার পাশেই কেতলিতে ভেজানো আছে ভারতীয় চা, যা আমার শরীরকে এমন শীতল পরিবেশেও গরম করছে। টেবিলের উপরে রাখা ভারতের

ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের বইগুলি আমার শীতল হৃদয়কে উষ্ণ করছে। আজ তাই সুদূরের আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু মনীষীকে হৃদয়পাত্র উজাড় করে কৃতজ্ঞতা সহকারে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, কারণ তিনিই সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যিনি জ্ঞানের পরিচায়ক ও পথপ্রদর্শক। তাই ভেবেছি এখানে যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ও অনুভব সহ প্রীতিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করব। হতাম যদি ভাষার কারিগর, অথবা আরও একটু ভালোভাবে বললে, হতাম যদি কবি, তা হলে এসবই বেঁধে দিতাম এক পরমানন্দ ছন্দের সুরে। কিন্তু এই চিঠির লেখক এক অতি সাধারণ ব্যক্তি, পাঠশালার প্রথম চৌকাঠও যে পার হতে পারে নি। সুদূর উত্তরের এক অজপাড়াগাঁয়ে বাস করি, জীবিকা আমার চাষবাস আর মধুসংগ্রহ, অবিবাহিত, বয়স সাতান্ন বছর।

নিঃসঙ্গ এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধ্যাত্মিক উন্মেষের সর্বতোভাবে পরিপন্থী অবস্থার মধ্যে বাস করছি, যেখানে বই বলতে গেলে দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাফল্যের পথ এমনিতেই বেশ কাঁটায় ভরা। তবু এরই মধ্যে আপনার কিছু রচনা সংগ্রহ করতে পেরেছি— *Gitanjali, Malini, Chitra, The King of the Dark Chamber, The Post Office, One Hundred Poems of Kabir, The Crescent Moon, Sadhana*। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, শেষ বইটি আমার খুবই ভালো লেগেছে, খুবই মন দিয়ে পড়েছি। বইটি বহু মূল্যবান আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রতীক এবং সেই কারণে আমি নিবিষ্টভাবে অচ্ছেদ্যভাবে এই চিন্তার সুরে নিজেকে বেঁধে ফেলেছি। *Sadhana*, আমার মতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যভরা কোনো এক নিভৃত পবিত্র স্থান।

এমন এক দৈনন্দিন কষ্টদায়ক জীবনসংগ্রামের মধ্যেও ভারতীয় দর্শন ও অন্যান্য কিছু বই আমার সংগ্রহের তালিকায় আছে— 'ভগবৎগীতা' 'উপনিষদ' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর কিছু অংশ, 'স্বামী বিবেকানন্দের রচনা-সংগ্রহ', অভেদানন্দের কিছু রচনা, 'রামচরকার যোগের সমগ্র রচনা' 'নৈঃশব্দ্যের আর্তনাদ' [theosophical text], কৃষ্ণমূর্তির কিছু রচনা ইত্যাদি।

বহুদিন ধরেই হিন্দু সনাতন ধর্ম ও দর্শন আমাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে, হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে এক আত্মিক সুসংগতি। এই দর্শন গভীরভাবে হৃদয়গ্রাহী, কারণ ইয়োরোপীয় পশ্চিমি দর্শনতত্ত্ব মনে হয় বড়োই শুষ্ক, হিসেবি এক শীতল জ্ঞানের প্রকাশ।

আমি Neoplatonism তত্ত্ব চর্চা করার চেষ্টা করেছিলাম এবং Alexandrian Schoolএর বিশেষত Pyrrho of Elis, Plotinus এবং Proclus পড়ার চেষ্টা করেছি।

পরবর্তীকাল খ্রিস্টাব্দের প্রথম যুগ। Gnosticism বা জ্ঞেয়বাদ সম্পর্কেও পড়াশোনা করি। এইসকল বিষয় সম্পর্কে সামান্য, অস্পষ্ট, গোলমেলে রচনা আমাদের দেশে পাওয়া যায়। উল্লিখিত রচনা সম্পর্কে রুশভাষায় শুধু আংশিক সংবাদ পাওয়া যায়, সমগ্র রচনা দুষ্প্রাপ্য।

আমি অনুভব করতে পারি যে আমার সহজাত জিজ্ঞাসু মন ভারতীয় দর্শনের মূল স্রোতের প্রতি আকৃষ্ট, অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে কোনো এক নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্কে জন্মজন্মান্তরের সূত্রে গাঁথা। এইজন্যই বোধহয় বলা হয়, মানুষ জন্মসূত্রে ইয়োরোপীয় হলেও মানসিকতায় তাঁরা ভারতীয়। যেদিন প্রথম আমি আপনার ছবি দেখি, দেখে মনে হয়েছিল আপনি আমাদের সাধারণ মানুষদের একজন ; আপনার রচিত 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'... আমার বড়ো প্রিয় প্রার্থনাসংগীত।

দুটি সংস্কৃতির পারস্পরিক আদানপ্রদান আর দুটি জাতির পারস্পরিক সহানুভূতির মধ্য দিয়ে রুশ ও ভারতের জনগণকে এক আন্তরিক ঐকতানে সংঘবদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথ খুলে দিতে এখন সাহায্য করছে কিছু উন্মীলিত চিন্তাভাবনা। এই দুই জাতিকে পরস্পরের সান্নিধ্যে এনেছে কোনো এক মহান শক্তির আশীর্বাদ। হয়তো এই ঐক্য থেকে এক নব আধ্যাত্মিক ও বস্তুবাদী সংস্কৃতির জাগরণ হবে, আর তার থেকে মানবজীবন এক নতুন উচ্চমার্গের জীবনদর্শন উপলব্ধি ক'রে এক উন্নতমানের বিশিষ্ট পথে উৎকর্ষ লাভ করবে। আমরা আজ সেই উন্নত অভিজাত জীবন-মানের পথ খুঁজে ফিরছি। আর যখনই এই নব জীবনদর্শনের উন্মোচন অথবা নবায়ন হবে, তখনই পূর্বতন অন্তরালবর্তী সব-কিছুকে নতুন আলোয় পথ দেখিয়ে তা জীবনের বিশিষ্ট

মর্যাদামণ্ডিত সৃষ্টি আর শক্তির লক্ষ্যে উদ্‌ভাবিত করে তুলবে। কেবল তখনই সেই সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে পারা যাবে।

বর্তমানে আমি পাহাড়ি ককেশাস অঞ্চলের কৃষ্ণসাগরের তীরে একটি আশ্রম সংগঠনের পরিকল্পনা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছি। এ-রকম দার্শনিক মরীচিকা সৃষ্টি করার পিছনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য। তা হল এই যে এই ককেশাসে অর্থাৎ ইয়োরোপ ও এশীয় মহাদেশের সংযোগসীমান্তে যদি প্রাচ্যের প্রজ্ঞা ও পশ্চিমের বিজ্ঞানের কোনো সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হয়।

এইভাবে পরিকল্পিত অনুকূল বুনিয়াদের উপর হয়তো আগামীদিনে আধ্যাত্মিক ও বস্তুবাদী যুগ্ম সংস্কৃতির বিকাশ হতে পারে।

আমাদের উদ্দেশ্য অতি সাধারণ, গণতান্ত্রিক, স্বাধীনচেতা ভ্রাতৃত্বের ঐক্যবোধ গড়ে তোলা। ইউটোপিয়ার স্বপ্ন না দেখে, কোনো এক বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা, যেখানে কোনোরকম বেচাকেনার আড়ম্বর থাকবে না, যেখানে আপাতত কম্যুন গড়তে হবে না, থাকবে শুধু কল্যাণময় পারস্পরিক সহায়তার উন্মুক্ত এক আশ্রম।

আমাদের পূর্বসূরীদের জীবনযাত্রা ছিল এক কঠোর যদৃচ্ছ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসনভারে জর্জরিত। তাই জীবনচর্যা ঢাকা পড়ে যায় আবরণে। পৃথিবীর যেখানেই বসবাস হোক-না কেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করে চলেছে চারুকলার সৌকুমার্য আর সাধারণ জীবনদর্শনে ভালোবাসার ঐকতান।

জীবনের কারিগর ও চিত্রকর হিসেবে মানবজাতির প্রধান কর্মসূচি হল ক্লান্ত শ্রান্ত পরিবেশ আর বিচ্ছিন্নতাকে দূর করা। এমন প্রয়োজনীয় কর্মসূচি আমাদের তৈরি করতে হবে যা আধ্যাত্মিক মন্দির গড়তে সাহায্য করে— যে মন্দিরে অধিষ্ঠিত হতে পারে সারা পৃথিবীর সর্বময় বিজ্ঞানের সমতান।

গ্রাম্য জীবনে একসময়ে এ পথ অবলম্বন করার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা ছিল, যেমন পিথাগরীয় সম্প্রদায় চেয়েছিল তাঁদের মতবাদ অবলম্বনে দর্শননগর গড়তে। পরবর্তীকালে আমরা দেখি যে খ্রিস্টান চার্চের অন্ধ গোঁড়ামির ভয়াবহ সন্ত্রাস এইসব দর্শন-আদর্শের এবং নানাধরনের স্বাধীন ভাবনাচিন্তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল।

পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠল যখন খ্রিস্ট-অনুগামী ধর্ম-যাজকেরা গড়ে তুললেন তাঁদের ভয়াবহ বিচারসভা।

কবিবর, আপনি মানবতার বন্ধু, আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ভরসা করি যে আমাদের প্রীতি ও সৌহার্দ্য আরও নিবিড় হয়ে উঠবে। আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাদানে আপনি বিরত হবেন না। আপনার যে-কোনো শুভ উপদেশ গ্রহণের অপেক্ষায়

আলেক্‌সেয়ই পাভ্‌লোভিচ্‌ নাজারোভ
গ্রাম সিচেভা
জেলা চেরেপাভেৎস্‌

অনুবাদ : পূরবী রায়

পূর্বস্মৃতি

বনবিহারী ঘোষ

১. গুরুদেবের আড়ালে

সেই মনভুলানো গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ ধরে, গোয়ালপাড়ার সেই লাল রাস্তা ধরে, ভোর ভোর তিন বন্ধুতে বেরিয়ে পড়লাম। পথটি ঠিক উত্তরায়ণের সামনে দিয়ে, উত্তর দিকে সোজা গ্রামে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাল-খেজুরের সবুজের মধ্যে, দিগন্তপ্রসারিত আকাশে।

আমাদের উদ্দেশ্য শীতশেষের খেজুর রসের আড্ডায় গিয়ে কিছু রস আস্বাদ করা। সূর্যোদয় এখনো হয় নি, মাঠে-ঘাটে শীতের পাতলা চাদর এখনো কোথাও কোথাও নজরে পড়ে। আমরা যাব এবং এসে কলাভবনে আমাদের দৈনন্দিন ক্লাস করব, যথারীতি। নিশিকান্ত, রামকিঙ্কর, আর আমাকে নিয়ে এই ত্রয়ী। শীতে আমরা ইতিপূর্বে বারকয়েক রসের আড্ডায় গিয়েছি। ওই অঞ্চলে আমরা প্রায় মুখচেনা, 'আশ্রমের বাবুমশাইরা' বলে পরিচিত।

গোয়ালপাড়া অতিক্রম করে একটু হয়তো বেশি ভেতরে প্রবেশ করে ফেলেছি। এই সকালে স্নিগ্ধকোমল চার ধার। গভীর নিস্তব্ধ। ভারি উপভোগ্য পরিবেশ। তাড়াতাড়ি নেই, ধীরেসুস্থে রসের আড্ডায় তখনি সব গাছের থেকে রসের হাঁড়ি এনে গাছতলায় জমায়েত করা হয়েছে, বেলা হলেই গুড় জ্বাল দেওয়ার কাজ আরম্ভ হবে। আমরা তিনজনেই রস খাওয়া শেষ করেছি, এবার একটু কোপাইয়ের কিনারা দিয়ে আশ্রমে ফিরব। ইতিমধ্যে খুব ঘটা করে পুব দিকে সূর্যোদয়ে বন আলোয় ভরে দিলে।

নিশিকান্তের দূরে নজর পড়েছে, আমাদের ডেকে বললে, 'দেখো দেখো চেয়ে দেখো, কিঙ্কর, বনবিহারী।' আমরা অবাক হয়ে দেখি— তাই তো, দূরে একটি ছোটো পলাশগাছে ডালভর্তি ফুলের ভারে একটি ডগা নিচুমুখে ঝুলে পড়েছে, প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে। এ সুযোগ ছাড়ে কে ? নিশিকান্ত এগিয়ে গিয়ে অতি সন্তর্পণে ডালটি কৌশলে ভেঙে ফেললে। আজ এই বছরের প্রথম পলাশ দর্শন, এটি সমস্ত আশ্রমের একটি খবর আর প্রথম আমরাই নিজস্ব খবরদাতা, কম কথা কি ?

তিনজনেই অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে ফিরে আসছি। ঠিক যখন উত্তরায়ণের সামনে বরাবর এসেছি, নিশিকান্তর চলার গতি থেমে আসছে, 'শোনো, চলো আমরা এটা গুরুদেবকে দিয়ে প্রণাম করে আসি। দেখবে কী খুশি হবেন, গুরুদেব।' কথাটি অবশ্য খুবই সত্য। কেমন করে 'না' করি ? তবে কিঙ্করের সমস্যা আছে, ইচ্ছে থাকলেও সে খুবই কুণ্ঠা নিয়ে বললে, 'ভাই, আমাকে তোমাদের মাপ করতে হবে, আমি তোমাদের সঙ্গী হতে পারছি না ব'লে। আমার মাটির মূর্তিতে ভিজে কাপড়ের ঢাকা বদলে না ভেজালে শুকিয়ে ফাটবে। আমাকে চড়া রোদ্দুর হবার আগেই স্টুডিয়োতে সোজা যেতে হবে— তোমরা যাও, পরে দেখা হলে বোলো গুরুদেব কী বললেন।' সে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

আমরা দুজনে উত্তরায়ণের দিকে এগোলুম। আমি ও নিশিকান্ত। আমরা উত্তরায়ণের দোতলায় গিয়ে গুরুদেবের পূর্বমুখী ঘরে উপস্থিত হয়ে পলাশের ডালটি তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলাম। পলাশ ফুলগুলি চোখে পড়তেই, খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে বললেন উনি, 'ভারী সুন্দর তো, এমন তাজা ফুল কোথা থেকে পেলি ? শিগগির যা, চানের ঘর থেকে বালতি করে জল নিয়ে এখুনি এটা ডুবিয়ে দে, পরে ভালো করে সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা হবে, রোদ্দুরের তাপ বাড়ছে।' নিশিকান্ত বালতি জল সব এনে ফেললে, গুরুদেব বললেন,

'এবারে এই প্রথম পলাশের আগমন এ ঘরে ; কিন্তু তোদের কি দয়ামায়া নেই ? পরের গাছ থেকে ছিঁড়তে তোদের কি একটুও খারাপ লাগল না ?' এই ভর্ৎসনাটুকু আমরা মাথা পেতে নিলুম। তিনি যে ভীষণ খুশি হয়েছেন তা তাঁর মুখে যেন লেখা রয়েছে। প্রকাণ্ড টেবিলে উনি ছবি আঁকছিলেন আমাদের ঢোকবার আগে। এখন আবার তাঁর ছবিতে মন দিলেন। নিশিকান্তর কিন্তু নড়বার কোনো লক্ষণই নেই। গুরুদেব অগত্যা প্রশ্ন করলেন, 'কী রে ? কিছু বলবি নাকি, নিশি ?' এবারে নিশিকান্ত আস্তে আস্তে তার বক্তব্য প্রকাশ করল, সেটার জন্য আমি অন্তত প্রস্তুত ছিলাম না—'গুরুদেব, আপনার ব্যবহার করা, ফেলে দেওয়া, দু-চারটি ব্রাশ, যদি আমাদের দেন তো—' বলে আবার চুপ। অতএব, গুরুদেবের এবার কিছু একটা করতে হয়। 'দেখ নিশি, ওই পুরোনো তুলিগুলো আমার বড়ো কাজে লাগে। ওগুলো তো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। আমি তুলি যথেচ্ছ ঘসে ঘসে টেক্সচর বার করি। দেখিস নি আমার ছবি কোথাও কোথাও ফুটো হয়ে যায় ? তা যখন বললি, দেখি কিছু খুঁজেপেতে, তোদের দেবার মতো কিছু পাই কিনা।' তিনি খুঁজে খুঁজে, দশ-পনেরোটা ব্রাশের হ্যান্ডল খুঁজে বার করে বললেন, 'দেখ, এগুলোতে রঙ লেগে আছে, রঙ লেগে বড়ো বিশ্রী হয়ে আছে, দেবার অযোগ্য, দাঁড়া তোরা।' বলেই, সোজা উঠে, স্নানের ঘরে হাত ধোবার বেসিনে নিজে ধুতে শুরু করলেন, আমাদের দিকে পেছন করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিশিকান্ত, চট্‌পট্ ক্ষিপ্রগতিতে, টেবিলের উপর থেকে দুহাতের কাছে যা পেল, রঙ এবং ছোটো ছোটো শিশি দুপকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে, বিকারশূন্য মুখে। ঠিক যেমনটি জলের ধারে বক জল থেকে জ্যান্ত মাছ ছোঁ মেরে থাকে ! গুরুদেব ব্রাশগুলি ধুয়ে মুছে, যখন আমাদের সেগুলি দিলেন, তখন নিশিকান্তর নিজের কাজ সারা হয়ে গেছে। এবার আমাদের ঘরের বাইরে আসার পালা। গুরুদেব নিজের অসম্পূর্ণ ছবিতে মনোযোগ দিলেন, আমরা ওপর থেকে নীচে নেমে এলাম। এর পর তাকে যখন বললুম, 'নিশিকান্ত, এটা তুমি কী করলে বলো তো ? এটা কি তোমার উচিত কাজ হল ?' তার সোজা উত্তর, 'দেখো বনবিহারী, গুরুদেবকে তুলি রঙ কাগজ কিছুই কিনতে হয় না, সব জিনিস প্রচুর পরিমাণে উপহার পেয়ে থাকেন। আমি ছাত্র, হাতে পয়সা থাকে না, রঙের দাম কম নয়, তা আমি যদি দুটো-চারটে রঙ পকেটস্থ করি তো কী হয়েছে ? তোমার যদি নীতিজ্ঞানে বাধে তো তুমি নিয়ো না।' ব্যস, চুকে গেল। এসময়, আমাকে একটু নরম হতে হয়, অস্বীকার করছি না, রঙগুলো সব বিলিতি এবং উচ্চমানের, এবং আপস করতেই হয়, অন্তত রঙগুলোর জন্য ! তুলিগুলোর অবশ্য গুরুদেবের ব্যবহারের পর আর কিছু চুল অবশিষ্ট থাকে না, খালি বাঁটগুলিই সার। আমার কাছে দু-একটি স্মরণচিহ্নস্বরূপ ছিল বহুবৎসর। এমন একটা মায়া পড়েছিল যে বৎসরের পর বৎসর সেগুলি ফেলে দিতে পারি নি, যদিও অব্যবহার্য।

সেদিনের আমাদের পলাশ-অভিযানের তৃতীয় সঙ্গী, রামকিঙ্কর, যখন সবটা শুনল, সে সমর্থন করল নিশিকান্তকেই !

২. একটি অবিস্মরণীয় বসন্তোৎসব

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে আমি শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র। সেই সুবাদে দিনুদার (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) রবীন্দ্রসংগীত ক্লাসেও আমার যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। নিজের বাসভবন 'সুরপুরী'র বৈঠকখানা ঘরে গানের ক্লাস নিতেন তিনি। তিনি ছিলেন বিরাটবপু সদানন্দ পুরুষ, সর্বদাই হাসিখুশি ; ছাত্রছাত্রীদের সহজেই আপন করে নিতেন। আশ্রমের ছোটোবড়ো সকলের কাছেই তিনি 'দিনুদা' বলে পরিচিত ছিলেন। অতি সুমধুর ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। তিন সপ্তকে তাঁর কণ্ঠের যাতায়াত মাখনের মধ্যে ছুরি চালানোর মতোই সহজ ছিল। গুরুদেব বলতেন, '[দিনু] আমার সকল গানের ভাণ্ডারী'।

শান্তিনিকেতনে আমার প্রথম বসন্ত-উৎসব ও দোল-উৎসব এসে পড়ল। সেবারের প্রধান আকর্ষণ : গুরুদেব আশ্রমেই উপস্থিত এবং এই উৎসবের জন্য একটি বিশেষ গান রচনা করেছেন। দু-এক দিন পরেই এই গানটি দিনুদার কাছে আসে এবং আমাদের গানের দল কয়েক দিনের মধ্যেই উৎসবে বৈতালিক গাইবার জন্য রিহার্সাল শুরু করে দেয়। কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের গানের দল প্রস্তুত। আগামীকাল অতি প্রত্যূষে, আশ্রমকেন্দ্র ঘণ্টাতলা বেদীর কাছে সকলের সমবেত হবার কথা। আমাদের গানের দলে আট-দশ জন ছাত্রছাত্রী। তখনও অন্ধকার কাটে নি। সবে ভোর হচ্ছে। ঘুমন্ত আশ্রম নিস্তব্ধ। আমরা এসে সমবেত হলাম। তার পর শুরু হল আশ্রম-পরিক্রমা। বৈতালিকের গানের দল প্রথমেই উত্তরায়ণের পথ ধরে প্রবেশ-পথ অতিক্রম করে উত্তরায়ণের পিছনের রাস্তা দিয়ে, উত্তরায়ণ প্রদক্ষিণ করে, সামনের বিরাট চত্বরের পাশ দিয়ে যেতেই, দূরে প্রশস্ত চত্বরের ঠিক মাঝখানে চেয়ারে বসা মূর্তিটি লক্ষ করল। দেখলুম, গুরুদেব। তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে স্থির সমাহিত ; কোলের উপর হাত দুখানি ন্যস্ত ; ধ্যানস্থ। প্রতিদিনই তিনি অতি প্রত্যূষে এসে এই স্থানে সূর্যোদয় অবধি বসে থাকেন। আমরা বৈতালিক দল তাঁর সদ্য-রচিত গানটি গাইতে গাইতে ধীর গতিতে তাঁর ঠিক সমুখ দিয়ে মার্চপাস্ট করে বেরিয়ে আশ্রমের অপর দিকে গুরুপল্লী ও ছাত্রছাত্রীদের আবাস-গৃহ ঘুরে আবার ঘণ্টাতলায় এসে সকালের বৈতালিক শেষ করলুম। কারণ জলখাবার খাওয়া শেষ হলেই আমাদের গানের দলকে সকাল ন'টার সময় আশ্রমের শালবীথির বেদীতে উপস্থিত হবার নির্দেশ দিনুদা আগেই দিয়েছিলেন। ওখানে আমাদের গানের দলের বৈঠক হবে, দিনুদাও আসবেন। আমাকে ও শান্তিদেবকে এস্রাজ নিয়ে আসার কথাও বলেছেন তিনি।

ঠিক সময়ে আমরা উপস্থিত হলাম। বেদীতে গানের দলের জন্য ফরাস পাতা। আমরা দিনুদার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তিনি আসতেই গানের দল বেদীতে উঠে পড়ল। দিনুদা মধ্যমণি। তাঁকে ঘিরে গানের দল। আমি আর শান্তিদেব দুপাশে দুখানি এস্রাজ নিয়ে প্রস্তুত। সমস্ত স্থানটিকে ঘিরে চার ধারে উঁচু শাল গাছের সারি। বেদীটি ছায়াচ্ছন্ন। ভারি স্নিগ্ধ পরিবেশ। বেদীকে ঘিরে আশ্রমবাসী শ্রোতার দল সব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বসন্তের গান দিয়ে দিনুদার নির্বাচিত সমবেত সংগীত শুরু হল, যা তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন। একের পর এক গান চলছে। আকাশ-বাতাস সুরঝংকারে মথিত। গান পুরোদমে জমে উঠেছে। সকলেই গানের সুরে নিমজ্জিত-প্রায়। এই সময় একটু বৈচিত্র্য শুরু হল। একটু দূরে দিনুদার ঠিক পিছনে নন্দলালবাবুকে দেখা গেল। নন্দলাল আর দিনেন্দ্রনাথ হরিহর আত্মা, দুজনের খুব ভাব। আর দুজনের মাথায় সবসময় নতুন নতুন উদ্ভাবনা সৃষ্টি হয়। একটা কিছু নতুন জিনিসের সংযোজনায় মনটি সর্বদাই তৎপর। দেখলুম, দিনুদার ইঙ্গিতে গানের দল বেদীর একেবারে কিনারায় চলে গেল। সামনের বেশ-খানিকটা জায়গা খালি করা হল। নন্দলালবাবু আমাকে আর শান্তিদেবকে এস্রাজ নামিয়ে রেখে এক ধারে ঝোপের আড়ালে নিয়ে এলেন। সেখানে একজন তৈরি ছিল দুখানি চাদর ও দুখানি প্রমাণ সাইজের লাঠি নিয়ে। নন্দলালবাবু আমাদের দুজনকে দুখানি কোমরবন্ধ, মাথায় দুখানি পট্টি— একটি নীল, অন্যটি সবুজ— পরিয়ে, কানের দুপাশে রক্তজবা এবং দুজনের হাতে দুটি লাঠি দিয়ে সেই বেদীর খালি জায়গায় উঠতে সাহায্য করলেন। আর বলে দিলেন— 'কেঁদুলীতে বাউল-নাচ দেখেছ। সেইসব স্মরণ করে দাঁড়ালেই দেখবে পায়ে নাচ এসে গেছে।' গুরুর কথা মিথ্যা হবার নয়। দু জনের হাতে লাঠি আর বাউলের বেশ আর প্রাণে গানের নেশা। ওদিকে দিনুদার গলা, সকলকে ছাপিয়ে শুরু করল, 'ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে।' আমরা দুজনে তখন হেলেদুলে, গানের তালে তালে নানা ভঙ্গি করে যথাসাধ্য চেষ্টা করে বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছি। এর পর শেষ গান— ক্লাইম্যাক্স— 'যা ছিল কালো-ধলো তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।' দিনুদা উঠে দাঁড়ান এবং পরে আর সকলেই। তার পর দিনুদা দুপকেট থেকে আবির নিয়ে সামনে যাকে পাচ্ছেন মাথায় মুখে মাখাচ্ছেন, দু হাতে উপরে ছড়াচ্ছেন। সেদিনের সেই দৃশ্য এখনও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। এখানেই সেদিনের মতো বা সে বছরের মতো বসন্ত-উৎসবে বৈতালিক পর্ব শেষ। সকলেই প্রফুল্লচিত্তে ঘরে ফিরলুম।

গানের সভা যখন শেষ হল তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ। নিজের ঘরে ফিরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘরের বাইরের খোলা বারান্দায় চৌকিতে শুয়ে বিশ্রাম করছি। গাছের ফাঁক দিয়ে যে রাঙা মাটির রাস্তা, ছায়াময় পথ, আশ্রমের মধ্যে চলে গেছে, সেটা দেখতে দেখতে চোখ দুটি আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। এরই মধ্যে একটি লোক বারান্দার কাছে একেবারে আমার সামনে এসে অতি মৃদুস্বরে গলা-খাঁকরি দিয়ে আমাকে সজাগ করে, অতি বিনয় সহকারে বলতে শুরু করল, 'বাবুমশাইকে গুরুদেব ডেকেছেন।' চেয়ে দেখি, গুরুদেবের খাস ভৃত্য বনমালী। বেশ স্বাস্থ্যবান। কুচকুচে শ্যামবর্ণ। পরনে ধবধবে সাদা ধুতি, গায়ে হাতকাটা সাদা মেরজাই। সে আরও বললে, 'দিনুদা মশাইও ওখানে এসেছেন।' বললুম, 'তুমি যাও, আমি তৈরি হয়েই যাচ্ছি।' বনমালী এ কথাও জানালে, তাকে শান্তিদেবকেও ডাকতে হবে ওখানে যাবার জন্য।

উত্তরায়ণের রাঙা মাটির রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মনের মধ্যে ভয় ও বিভিন্ন প্রশ্ন জাগছে। এই অসময়ে গুরুদেবের আমাকে ডাকবার কী কারণ হতে পারে ? উত্তরায়ণে উপরে ওঠবার সিঁড়ির বাইরে আমার অপেক্ষায় বনমালীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সিঁড়ির দিকে হাত দেখিয়ে আমাকে বললে, 'উপরে যান।' আমি উপরে গেলুম। দরজা খোলা। প্রশস্ত হলঘর। দুপাশেই সারিবদ্ধ খোলা জানালা ; বাইরে দিগন্তবিস্তৃত খোলা আকাশ ; তাল গাছের সারি ; লাল খোয়াই ; দূরে সাঁওতালি গ্রাম। প্রত্যেক জানালার ফ্রেমে-আঁটা এক-একটি সুন্দর ছবির দৃশ্য। ঘরজোড়া ফরাস পাতা। প্রশস্ত ঘরের শেষ প্রান্তে গুরুদেব বেতের চেয়ারে সমাসীন। পাশেই ফরাসের উপর বসে আছেন দিনুদা। আস্তে আস্তে এগিয়ে আমি গুরুদেবকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের বেশ কাছেই বসে পড়লাম। মাথা নিচু, গুরুদেবের শ্রীচরণে দৃষ্টি আবদ্ধ। গুরুদেবের গলার স্বর কানে এল। তিনি বলছেন, 'হ্যাঁরে, দিনুর কাছে শুনলুম, তোরা নাকি আজ সকালে শালবীথির বেদীতে, দোলের উৎসবের সঙ্গে নাচ গান করে সকলকে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছিলি। সকলেই খুব উপভোগ করেছে শুনে আমার খুব ভালো লাগল। শুনেছিস্ তো আমি মেয়েদের দিয়ে একটা নৃত্যাভিনয়ের রিহার্সাল দিচ্ছি, কিন্তু একের পর এক খালি মেয়েদের নৃত্য, তা সে যতই ললিতভঙ্গি লাস্যময় হোক, কেমন যেন ক্লান্তিকর একঘেয়েমি লাগছে। মনে হচ্ছে, এর মধ্যে যদি তোদের পুরুষালি উদ্দাম নৃত্যের অংশ সংযোজন করা যায় তো নাচের একটু মোড় ঘুরে যায়। সেই আলোচনাই দিনুর সঙ্গে হচ্ছিল। আর সেই প্রসঙ্গে তোদের ডেকে পাঠিয়েছি। শান্তিও বিকেলের দিকে আসবে।' এতক্ষণ আমি মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছি। একটু একটু ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছি ; কিন্তু ঠিক পরিষ্কার নয়। এর পরই গুরুদেবের সেই অমোঘ আদেশ, 'আজ সকালে তোরা যে নাচের স্টেপ ব্যবহার করেছিলি, তার সামান্য দু-একটা স্টেপ-এর নমুনা দেখাতে পারিস তো আমি বুঝে যাই।' অর্থাৎ, আমাকে দাঁড়াতে হবে ওঁর সামনে। মাথাটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করে এল। বড়ো অসহায় বোধ করছি সেই মুহূর্তে। আমি একেবারে নীরব। চুপ করে আছি মাথা নিচু করে। আমার বাধাটা কোথায় গুরুদেব যেন বুঝতে পারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দিনুদার উদ্দেশে বলতে শুনলাম— 'দিনু তুমি যদি ওকে একটু সুর ও তালের জোগান দাও তো ওর সুবিধে হয়।' দিনুদা তৎক্ষণাৎ একটা বাউল গানের সুর ধরলেন, 'এ বেলা ডাক পড়েছে, কোন্‌খানে।' আমার চেনা গান, তার সঙ্গে নিজের হাঁটুতে জোরে জোরে শব্দ করে তাল ঠুকতে শুরু করেছেন তিনি। আমার তখন প্রায় কোণঠাসা অবস্থা। ভিতরটা ছটফট্ করছে। একটা কিছু না করে যেন আর উপায় নেই। একদিকে দিনুদার গানের সুর আর জোরে জোরে তাল দেবার শব্দ আর অন্য দিকে গুরুদেবের সাগ্রহে আমার অ্যাকশন-এর প্রতীক্ষা। আমার মনে মনে কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে। একটা কিছু করতেই হয়। এক...দুই...তিন...আমার সামনে একটা প্রতীকী ইমেজ তৈরি হল— একটি সাপুড়ে এবং তার সামনে একটি ঝাঁপি, সাপুড়ে বাজিয়ে চলেছে— দিনুদার গানের সুর একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলেছে আমার কানে। হঠাৎ, ঝাঁপির ডালাটি উন্মোচিত, উপরে নীল আকাশ, সাপটি তার ফণা ধ'রে হেলেদুলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল। কাউন্ট ডাউন শেষ। সঙ্গে সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে উঠেছি, আমার স্থানকালপাত্র জ্ঞান লুপ্তপ্রায় ; সামনে গুরুদেবও ঝাপসা। আমি একপা একপা করে সুরে ও ছন্দে পা ফেলে চলেছি, কতক্ষণ হল জানি না— হঠাৎ গুরুদেবের স্বর কানে এল—

'এতেই আমার কাজ চলবে দিনু।' সংবিৎ ফিরে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। আমার হাঁফ ছাড়ার পালা, আস্তে আস্তে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লুম। এর পর আমাকে মেয়েদের নাচের মহড়া দেখার এবং মণিপুরী নাচের মাস্টারমশাই নবকুমার সিং-এর কাছে একটু তালিম নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে তারও আভাস দিলেন। আমি গুরুদেবকে প্রণাম করে নীচে চলে এলুম। তখন সূর্য অস্তপ্রায় ; পশ্চিম আকাশ এমন ভাবে রাঙিয়ে উঠেছে যেন সকালের সমস্ত আবির নিয়ে এখন সেখানে খেলা চলছে। এইসব দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরছি, তখন মনটা এমন অনাবিল আনন্দময় হয়ে উঠল, যেন আমার সমস্ত সংকট কেটে গেল।

পরদিন থেকে আমাদের দুজনের নাচের পালিশের কাজ শুরু হল, মণিপুরী নাচের মাস্টারমশাই নবকুমার সিংজীর কাছে। উত্তরায়ণে মেয়েদের নৃত্যগীতের মহড়ায় যেতে হয়। গুরুদেব খবর নিয়ে চলেছেন আমাদের অগ্রগতির। নবকুমারজীর কাছে ইতিমধ্যে কিছু নতুন মুখও দেখছি। একটি হাঙ্গেরীয় ষোড়শী, কলাভবনের ছাত্রী, সেও মেয়েদের গ্রুপে যোগ দিয়েছে। প্রায় প্রতিদিন বিকালে শান্তিদেব ও আমাকে হাজির হতে হয়। একদিন গুরুদেবের ইচ্ছা হল উত্তরায়ণের পিছনে, বেদীতে, যেখানে অনুষ্ঠানের ড্রেস রিহার্সাল হয়ে থাকে, সেখানে তিনি পূর্ণাঙ্গ মহড়া দেখবেন। গুরুদেবের একজন অতিথি আসছেন, তিনিও উপস্থিত থাকবেন। এই প্রধান অতিথি হচ্ছেন বীরভূমের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট গুরুসদয় দত্ত। তিনি সেই সময়ে রায়বেঁশে নাচ নিয়ে খুবই উৎসাহী। সেইজন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ নিয়ে গুরুদেবের নৃত্য সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখার জন্য উদগ্রীব।

গুরুসদয়বাবু এসে সেই রাত্রে আমাদের ছেলেমেয়েদের নাচ দেখে খুবই খুশি। তাঁর আগ্রহ হল ছেলেদের তিনি রায়বেঁশে নাচে তালিম দেবেন। সেজন্য তিনি আমাদের সাঁইথিয়ায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন ; কিন্তু সেখানে যাবার আমাদের ইচ্ছা না থাকায় গুরুসদয়বাবু তাঁর নাচের দলকে আশ্রমের বাইরে তাঁবু ফেলে আমাদের তালিমের বিশেষ ব্যবস্থা করেই ছাড়লেন। মধ্যে একদিন আমাকে ও শান্তিদেবকে সাঁইথিয়ায় তাঁর বাংলোতে রায়বেঁশে নাচের ডিমনস্ট্রেশন দেখালেন এবং একটি ভূরিভোজেরও ব্যবস্থা করলেন। এর প্রায় মাসখানেক পর বসন্তদিনের শেষে আমাদের দলের কলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুতির পালা। কলকাতা যাবার প্রাক্‌কালে শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদের দেখাবার জন্য একটি গ্র্যান্ড রিহার্সালের ব্যবস্থাও হয়। ওই সপ্তাহেই আমরা সকলে নাচগানের দল জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে উঠি ১০ দিনের জন্য। অভিনয় হয় তখনকার প্রখ্যাত ও একমাত্র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ নিউ এম্পায়ারে। সাতদিন অভিনয় হয়। সবদিনই উপচে পড়া ভিড়। দর্শক কলকাতার বিদগ্ধজন।

কলকাতায় ওই অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ যখন করেছিলেন তখন তার দুটি কারণ নিহিত ছিল। মুখ্য বা প্রধান কারণ : কবির নিজ সংস্থান বিশ্বভারতী-চালনায় নিঃশেষিত ; তাই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সহায়তায় অর্থসংগ্রহ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। দ্বিতীয় কারণটি কবির সৃষ্টিশীল মনের নান্দনিক প্রকাশের তাগিদ।

কলকাতার অভিনয় সব দিক থেকেই সার্থকতাময়। ওই কয়েক দিনের টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ ছিল কর্মকর্তাদের আশার অতীত।

৩. আমার মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু

কংগ্রেসের ইতিহাসে ১৯৩৯ সনের ত্রিপুরী অধিবেশন একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্মরণীয় ঘটনা। সভাপতি-নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় সুভাষচন্দ্রের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন পট্টভি সীতারামাইয়া এবং তাতে গান্ধীজীর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা : 'পট্টভির পরাজয় আমার পরাজয়।' তখন আমি ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে আমেদাবাদে। শান্তিনিকেতনে কলাভবনে শিক্ষা শেষ করে আমেদাবাদে চাকরি করছি চার-পাঁচ বছর ধরে। বাংলাভাষা ভুলতে বসেছি।

অতঃপর এই রাজনৈতিক আবহাওয়ায় মনঃকষ্টের অবধি নেই। এই সময় ত্রিপুরী থেকে হঠাৎ একটি টেলিগ্রাম পেলাম, 'বনবিহারী, অজন্তা ইলোরা যাচ্ছি। জলগাঁও স্টেশনে সাক্ষাৎ করো।' প্রেরক নন্দলাল বসু।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে নন্দলাল আমার মাস্টারমশাই ছিলেন। গান্ধীজীর অনুরোধে তিনি ত্রিপুরী এসেছিলেন কংগ্রেস নগর ও মণ্ডপ অলংকরণের কাজে।* সঙ্গে এনেছিলেন ওঁর জনাতিনেক ছাত্রকে। কাজ শেষ হলে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়ার পথে অজন্তা ইলোরা দেখে যাবেন। টেলিগ্রাম পেয়ে এত খুশি হলাম বলবার নয়; বুঝলাম, আমার মতন নগণ্য শিষ্যও মাস্টারমশাইয়ের কাছে তুচ্ছ নয়। সেটাই মাস্টারমশাইয়ের প্রচণ্ড এক গুণ— কোনো মানুষই ওঁর কাছে তুচ্ছ নয়, কোনো ব্যক্তিই ওঁর চোখে সামান্য নয়। এই যে সকলের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ, এটাই নন্দলাল বসুকে ভারতের অন্যতম মহৎ শিল্পী হয়ে উঠতে নির্ঘাতভাবে সাহায্য করেছিল। আমার আজকের এই স্মৃতিমন্থন মাস্টারমশাইয়ের সেই মিষ্টি মানবতাবোধ সম্পর্কেই। আমি তো লেখক নই, রঙ-তুলি-ক্যানভাসের কারবার আমার, ওতেই আমি অন্তরের ভাষা খুঁজে পাই। তবু আজকের স্মৃতিকথা গুটিকয়েক শব্দের সাহায্যে করছি। মাস্টারমশাইয়ের টেলিগ্রাম পেয়ে তড়িঘড়ি আমি রওনা হলাম— এবং তার পর তাঁর সাহচর্যে অজন্তা ইলোরা— কিন্তু তার আগে?

আমেদাবাদ স্টেশন থেকে রাত্রে ট্রেন ধরলাম। বেশ লম্বা পথ। সুরাটে ট্রেন বদল করে পরদিন বিকেল সাড়ে-তিনটে নাগাদ আমার বড়ো সাধের অজানা অচেনা জলগাঁও স্টেশনে পৌঁছে দেখি ভোঁ ভাঁ।

মাস্টারমশাই কই?

না, তিনি কোথাও নেই। প্ল্যাটফর্মে হাজার মানুষ। তিনি নেই। ট্রেন চলে গেল। খালি প্ল্যাটফর্মেও তিনি নেই। পোঁটলাপুঁটলি হাতে আমি ভ্যাবাচাকাভাবে স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। নন্দলাল বসুকে খুঁজে পেলাম না কোথাও। প্রায় সাঁইত্রিশ বছর পূর্বকার সেই অসহায়তার কথা মনে পড়লে আজ এখন এই এত বয়সে আমি কিন্তু খুব মজা পাই। মনে মনে তখন কি আর মাস্টারমশাইয়ের রসিকতায় ক্ষুণ্ণ হচ্ছিলাম না? হচ্ছিলাম; তবে কিনা উনি আমার সমস্ত ক্ষুণ্ণতা পুষিয়ে দিয়েছিলেন ওঁর অবাধ স্নেহ-মমতা দিয়ে।

জলগাঁওয়ে সেদিনটা অস্থিরভাবে কেটেছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম পরদিন সকাল সাতটায় এখান থেকে অজন্তা যাওয়ার বাস ছাড়বে। রিটার্ন টিকিট কিনতে বাধ্য হলাম। কারণ, বাসটি অজন্তার যাত্রী নিয়ে আবার রাত্রেই ফিরে আসবে। তাল ঠুকে বেরিয়ে তো পড়ি, ভাগ্যে যা-ই থাক্। ওই তাল ঠোকাঠুকির মধ্যেই জলগাঁও-এর সঙ্গে কিঞ্চিৎ জনসংযোগ করে ফেললুম। রাস্তার লোকজন সব মহারাষ্ট্রীয়। মেয়েপুরুষদের গায়ের রঙ প্রায় বাঙালিদেরই শামিল। ওদেরই একজনের বাসায় এক রাত্তিরের আতিথ্যটুকু পর্যন্ত জুটে গেল। একেই বোধহয় বলে, রাখে গুরু মারে কে? তখন আর আমাকে পায় কে? মনে মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল, মাস্টারমশাই অজন্তায় আমার অপেক্ষা করছেন। যথাসময়ে হয়তো আমাকে এখানে পান নি। তা ছাড়া মাস্টারমশাইয়ের টেলিগ্রামের কোথাও তো ঘুণাক্ষরেও লেখা ছিল না, জলগাঁও-এ কবে কখন দেখা করব! একেই বলে, সাস্‌পেন্স!

সাস্‌পেন্সের সুতোয় ঝোলাঝুলি বন্ধ হল রাত্তিরের আস্তানাটুকু পেয়ে। আহা— সেই আস্তানাটুকুর ছবি আমার চোখে আজও ভেসে ওঠে। বিশেষ করে সুখী-সুখী নীড়ের স্বচ্ছ সুন্দর সরল পরিবেশটি। আর সেই ছোট্ট মেয়েটি যে কচি কচি আঙুল দিয়ে তার হারমনিয়াম বাজিয়ে-বাজিয়ে আমাকে খানদুই ভারি মিঠে ভজন গান শুনিয়েছিল।

---

*এখানে তারিখ নিয়ে একটা সংশয় দেখা দিচ্ছে। বনবিহারী নিজেই লিখছেন, ইলোরায় নন্দলাল তাঁকে একটি স্কেচ উপহার দেন। সেই স্কেচের যে ফোটোকপি বনবিহারী অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তাতে দেখছি, নন্দলালের স্বাক্ষরের নীচে তারিখ দেওয়া আছে : ৩ জানুয়ারি ১৯৩৭। তা হলে, হয়তো ত্রিপুরী নয়, ফৈজপুর কংগ্রেস থেকে নন্দলাল যখন ফিরছিলেন সেই সময়ে অজন্তায় বনবিহারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ফৈজপুর মহারাষ্ট্রেরই একটি গ্রাম; সেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯৩৬ সালের ২৭-২৮ ডিসেম্বর। —সম্পাদক

ওসব কি জীবনে এত সহজেই ভোলা যায় ?

পরদিন যথাসময়ে বাস ছাড়ল। এখান থেকে অজন্তার দূরত্ব কমবেশি ষাট-সত্তর মাইল হবে বোধকরি। সারা রাস্তা বাসে কেমন একটি আবেশের মধ্যে চলেছি। এক-একবার মাস্টারমশাইয়ের অদর্শনের জন্য কষ্ট হচ্ছে। অন্য দিকে বহুদিনের স্বপ্নের অজন্তা। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি দেখতে পাব বাস্তব পাথরের গায়ে রঙে ও রেখায়। তার জন্য ব্যাকুলতা।

অজন্তা প্রায় বাল্যকাল থেকেই আমার কাছে একটি স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের সঙ্গে মোলাকাত করতে যাচ্ছি। কলাভবনের লাইব্রেরিতে অজন্তা সম্পর্কে কতই না ইয়া তাগড়া-তাগড়া বই দেখেছি। বাঘা-বাঘা ফোটোগ্রাফারদের তোলা ছবির পোর্টফোলিও দেখেছি। ওসব ছবি কপি করে করে হাত পাকিয়েছি। সেইসব মৃত্যুহীন ছবি এখন চোখে ভাসছে চলন্ত বাসে বসে। মাস্টারমশাইয়ের টেলিগ্রাম। আমার মতন তুচ্ছ শিল্পীকে এই আহ্বান— এ সমস্তই যে আমার হিসেবের বাইরে। মনটি আমার পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে শ্রুত-অশ্রুত এক বিশেষ ভাবমণ্ডলে।

অজন্তা গুহা উঠবার সিঁড়ির বেশ-কিছু দূরে এসে আমাদের বাস থামল। এটাই বাস-আড্ডা। আকুলিবিকুলি চোখে মাস্টারমশাইকে খুঁজলাম। নাঃ, কেউ কোথাও নেই।

পোঁটলাপুঁটলি বাসের মাথায় পড়ে রইল। আমি পড়ি-কি-মরি করে ধাপে ধাপে পাথরে-কোঁদা সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে একটার পর একটা গুহায় ঢুকছি বেরুচ্ছি। বিশ্বের সেরা শিল্পসামগ্রীতে তখন যত-না আমার আগ্রহ তার চেয়ে বেশি উন্মুখ আমি আমার গুরুদর্শনে। অজন্তার গুহায়-গুহায় কী মহাসম্পদ দেখছি তার বর্ণনা দেবার তাগিদে আমার এই অক্ষম রচনা নয়। যা দেবতার ভোগের সামগ্রী, যা শিল্প-আদর্শের চরম পরিকল্পনা, যার শিল্পরহস্য একটি বিরাট প্রহেলিকা, তার বর্ণনা দেবার সাধ্যও আমার নেই। আমি শুধু আমার প্রিয় মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর কথাই লিখব। আমার মনে তিনিই জাগিয়েছিলেন পরম সুন্দরের প্রতি টান। শিল্পী তার অপূর্ণ জীবন নিয়ে কী করে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের দিকে ধাবমান হয়, এই শিক্ষা আমি মাস্টারমশাইয়ের কাছেই পেয়েছিলাম। আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ গুরু।

কিন্তু মাস্টারমশাই কোথায় ? জাম্বুবানের মতন শত লাফালাফি করেও অজন্তার কোনো গুহাতেই তাঁর দর্শন মিলল না। তখন গুহার বাইরে এসে ভগ্নহৃদয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে একটু মনোযোগ দেবার একটা প্রবল চেষ্টা করছি। শেষগুহার শেষপ্রান্তের অপর দিকে বেশ-খানিকটা ঝোপঝাড় ও গাছগাছালির ছায়াময় অসমতল পাথুরে জায়গা দেখা যায়। স্থানটি বিশ্রামের যোগ্য স্থান বটে। কিঞ্চিৎ কসরত করে উঁচু পাথরের পাঁচিলটি অতিক্রম করে খোলামেলা জায়গায় একটা ঢালুতে নেমে পড়লুম। যা পাথরের আড়ালে ছিল, এতক্ষণে তা উন্মুক্ত দৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠল— আমার মাস্টারমশাই অদূরে বসে রয়েছেন পিঠ ফিরে। কয়েকজন তাঁকে গোল হয়ে ঘিরে বসে নিবিষ্টমনে। সকলেরই মুখমণ্ডল অন্য দিকে। আমি শিকারীর মতো অতি সন্তর্পণে সেই নিবিষ্টতার দিকে গুটিগুটি এগিয়ে গেলাম। প্রথমেই ওই গোলাকার চক্রের চক্রবর্তীর দৃষ্টিভূত হলাম। মাস্টারমশাই সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'দেখো, আমি ঠিকই জানতুম বনবিহারী এখানে আসবেই আসবে— এসো এসো বনবিহারী। খাওয়াদাওয়া হয় নি তো ? নাও বসে পড়ো।'

ওঁরা তখন সবে আহার শেষ করে একটু বিশ্রাম করেছিলেন। আমার প্রাক্তন সহপাঠী বন্ধুরা তখন কেউ হাসছে, আর কেউ বা সহানুভূতির প্রলেপ-বাক্য ছড়িয়ে যাচ্ছে। তখন আমি হাসব না কাঁদব ঠিকমতো বুঝতে না পেরে. কী আর করি, কুলকুল করে হেসেই ফেললুম। শিল্পের মহাতীর্থ। সামনে বসে এক মহান শিল্পী। সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারে আমরা ! আমি বলতে গেলে তখন একেবারে বিস্ময়ে নির্বাক হতভম্ব হয়ে গেছি। মুহূর্তে কী একটা অবিশ্বাস্য ওলট-পালট হয়ে গেল। ভেবেছিলাম গুরুদর্শন হল না। হয়ে গেল। আমার সংবিৎ ফিরে আসতে যেন সময় লাগছে। আমাকে টেলিগ্রাম করা হল জলগাঁও-এ সাক্ষাৎ করো, অথচ সেখানে কোনো চিহ্নই এঁদের পাই নি। ভেতর ভেতর যা অভিমানের রেশ চলছে !

'বুঝলে বনবিহারী', মাস্টারমশাই হাসিমুখে বললেন, 'বুঝলে কী হল— তোমাকে টেলিগ্রাম ক'রে আমরা

তৈরি হচ্ছি, শেষ মুহূর্তে কংগ্রেস কমিটির কর্তারা আমাদের জন্য একটা মোটর গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল— মায় সখারাম ড্রাইভার পর্যন্ত। আমাদের তো সুবিধেই হল। মনটা কিন্তু বড়োই উতলা ছিল তোমার জন্য। তা যাকগে, তুমিও এসেই পড়েছ। জানতুম তুমি এখানে আসবেই আসবে।'

মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে আমি চেয়ে রয়েছি। উনি বললেন, 'ওঠো, ওঠো, এখন আর দেরি কোরো না তো। তোমার জিনিসপত্তর নীচে থেকে নিয়ে এসো তো— দ্যাখো দ্যাখো— এখান থেকে নীচেটা কী সুন্দর দেখায়! আর ওই দেখছ? ওখানে কোথায় যেন একটা ঝরনা আছে।'

আমার মনের অভিমান ইত্যাদি সমস্ত কিছুর গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল মাস্টারমশাইয়ের স্নেহাতুর কণ্ঠস্বরে।

দুই বন্ধুতে মিলে আমার জিনিসপত্র বাস থেকে নামিয়ে মোটর গাড়িতে তুলে রেখে এবার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে একটার পর একটা গুহা ভালো করে দেখা শুরু করলাম। এবার দেখি একটা গুহায় এক ট্যুরিস্ট দল। সঙ্গে গাইড ও বিজলিবাতি। গাইডের অনর্গল বক্তৃতা আমার কাছে একেবারেই অবাস্তব মনে হচ্ছিল।

আমাদের সত্যিই খারাপ লাগছে। আমাদের অসহিষ্ণুতা যখন চরমে উঠেছে তখন দেখছি মাস্টারমশাই গাইডের প্রতিটি উক্তি মন দিয়ে শুনছেন। যেন তিনি, নন্দলাল বসু, যিনি অজন্তার রন্ধ্র-রন্ধ্রের সঙ্গে পরিচিত, তিনিই সামান্য একজন গাইডের কাছে জেনে নিতে চাইছেন অজন্তারহস্য! যেন অজন্তার কথা তিনি এই প্রথম শুনছেন! এও বিশ্বাস হয় না যে নন্দলাল না জানার বিন্দুমাত্র ভান করছেন। জানি সেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

অনেক পরে একান্তে তাঁকে শুধোলাম, 'আচ্ছা ওই গাইডের কথাগুলো অত মন দিয়ে কী শুনছিলেন? ও কি সব ঠিক বলছিল?' মাস্টারমশাই বললেন, 'না, সব ঠিক নয়। তবে খাঁটি বস্তুর ভেজালও ভালো।' এই বলে বিষয়টার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। যেন নিজের মনে স্বগতোক্তি করলেন, 'মূল খোঁজো, দেখবে মূলে সেই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা। তথাগত বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর মহাপ্রয়াণের কয়েক শতাব্দী পরে এসেছিলেন এই শ্রমণ ভিক্ষুরা। কী সুগভীর শ্রদ্ধা নিয়ে এই বিশাল বিরাট শিল্পসৃষ্টির কাজ করে গেছেন এবং সেই শ্রদ্ধার টানেই তো হাজার হাজার লোক, হাজার মাইল দূর থেকে এখানে দেখতে আসছে, কত দেশ-দেশান্তর থেকে আসছে, এবং আরও কত হাজার বছর ধরে আসবে ও দেখবে— আমরা তার কী জানি। এটা কি কম কথা? গাইড বা পণ্ডিতরা কী বলছে না বলছে সেটা আমার কাছে গৌণ। মুখ্য হল বিষয়বস্তু ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর দিব্যজীবন কাহিনী। সামনে দেখছি রঙে রেখায় শ্রদ্ধা-নিবেদন।'

মাস্টারমশাইয়ের স্নিগ্ধকণ্ঠের কথা শুনছি আর মনে পড়ছে, আদিমকাল থেকেই আদিমমানুষ গুহার দেওয়ালে ছবি এঁকেছে, ভাষার তখনও আবিষ্কার হয় নি। যুগ-যুগান্তর পরে এই অজন্তাচিত্র ভাবজগৎকে আমূল নাড়া দেয়— সেই মহাশিল্পের গুহায় আজ আমি নন্দলালের সঙ্গে ঘুরছি। পরম সৌভাগ্য না হলে এই পরম মুহূর্তটি ক'জনের ভাগ্যেই বা আসে!

কথার মোড় পাক খেল। মাস্টারমশাই এবার তাঁর বিষয়টিকে একেবারে মাটিতে এনেছেন। 'ভেবে দেখো, ওই লোকটির কথা। বুঝলে কিনা, গাইডের কথা বলছি। ওর পেশাই হল ওই। গাইডগিরি বা পাণ্ডাগিরি। যা-ই বলো কতই বা মাইনে পায়? রোজ, নিত্যি নিত্যি কি আর লোক জোটে? ছাপোষা মানুষ। ঘরে হয়তো খাবার লোক কিলবিল করছে। ভালো শ্রোতা পেলে ও উৎসাহ পায়। নিজের ওপর ওর কনফিডেন্স বাড়ে; শ্রদ্ধা বাড়ে। নয় কি?'

আমরা অসহিষ্ণু হয়েছিলুম তার কারণটা অবিশ্যি অন্য ধরনের। আমরা সেদিন মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে অজন্তার বিষয় অনেক গল্প শুনেছিলুম। তিনি বলে যাচ্ছিলেন, তাঁর আপন অভিজ্ঞতা, ওই সময়ে গাইডের পাল্লায় পড়ে ওঁকে— নন্দলালকে— থামতে হল। শুনতে হল শ্রীমান গাইডের বক্তৃতা। তার আগেই মাস্টারমশাই আমাদের বলছিলেন, ১৯০৯ সালে লেডি হ্যারিংহ্যামের উদ্‌যোগে অজন্তার কপি করতে এসে কোথায় এখানে তাঁবু ফেলা হয়েছিল; মাস-দুয়েক ধরে সকাল-সন্ধ্যা সব গুহা ঘুরে ঘুরে কপির কাজ চলত; প্রত্যেক ছবির খুঁটিনাটি নন্দলালের প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কোথায় একটি পলাশ ডালে গুটিকয়েক পিঁপড়ে

সর সর উঠে যাচ্ছে, তার নিপুণ ভঙ্গি— অতি সূক্ষ্ম কাজ— আমাদের দেখিয়ে দিলেন নন্দলাল। বোঝাচ্ছিলেন, এর টেকনিক— ওইসব অন্ধকার ঘরে কেমন করে ম্যুরাল করা সম্ভব হয়েছিল। যারা ছাদের সিলিঙ আঁকত। তাদের খালি চিত হয়ে শুয়ে শুয়েই আঁকা অভ্যাস হয়ে যেত। ফলে, তারা আর বোধ হয় ঋজু দাঁড়িয়ে আঁকতেই সক্ষম হত না। মাস্টারমশাই আমাদের দেখাচ্ছিলেন, গুহার পেছনেই সবুজ পাথরের স্তর—যাকে টেরা ভার্ড বলা হয়। মাস্টারমশাই বলেই চলেছিলেন, আমরা দেখছিলাম গুহার পর আশ্চর্য গুহা। ঠিক সেই সময় গাইডের আবির্ভাব এক ছন্দপতনের শামিল নয় কি ?

তবে মাস্টারমশাই যে সেদিন সামান্য ওই গাইডের পক্ষ নিয়ে আমাদের সঙ্গে বিচার-আলোচনা করছিলেন, তার সরল অর্থটি হল : এই অবোধ শিষ্যদের যদি একটু জ্ঞানচক্ষু খোলে। এমন গুরু দুর্লভ। বিশেষ করে বর্তমান কালে।

সব দেখেটেখে আমরা যখন গুহার নীচে নামলাম তখন বেলা ঢলে পড়েছে। এদিকে সখারাম গাড়ি নিয়ে অপেক্ষমাণ। সূর্যাস্তের রক্তাভায় আকাশ-বাতাসের রঙ পালটাচ্ছে। পাহাড়ি বনস্থলী সোনার মতন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাস্টারমশাই গল্প করছিলেন। বলছিলেন, তিনি যখন এখানে তাঁবুতে থাকতেন সেই সময় রাত্রে বন্য জন্তুরা হানা দিত। সেইজন্য তাঁবুর চার পাশে রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত।

বাস-আড্ডা এখন ফাঁকা।

অজন্তাকে পেছনে রেখে আমরা সোজা ঔরঙ্গাবাদের পথ ধরলাম।

দেখছি, মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ড্রাইভার সখারামের দিব্যি খোশ গল্প জমেছে। উনিই ড্রাইভারের পাশের সীটে বসেছেন। আমরা চার বন্ধু ঘনিষ্ঠভাবে পেছনের সীটে বসে গপ্পগাছা করছি, যে যার। অজন্তা দেখার পর আমার খুশির বাঁধ যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। বুঝতে পারছি, এই পরিভ্রমণের ছবি মাস্টারমশাই মনে মনে নোট করে রাখছেন। সেটা বোঝা গেল পরদিন, ইলোরা গুহা পরিদর্শন শেষে। সেদিন পেনসিলের রেখায় আঁকা একটি ছবি মাস্টারমশাই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। আজও আমার কাছে মহামূল্যবান রত্নস্বরূপ সেই উপহারটি আছে। একখানি পেনসিল স্কেচ। শিবের বিবাহের একটি বীভৎসরসের প্রস্তরমূর্তির অনুলিপি।

ঔরঙ্গাবাদে পৌঁছোতে রাত হল। সখারাম ড্রাইভার আমাদের সকলকে এনে তুলল একটি অতি সাধারণ ধর্মশালায়। টিমটিমে আলোয় সব-কিছু অস্পষ্ট। যেমন নোংরা, তেমনি ব্যবস্থা। মাস্টারমশাই তাতেই যে কী খুশি ! আমরা ওঁর জন্যই ভাবছিলাম। উনি স্বয়ং যখন খুশি তখন আমরা কোথাকার কে ?

আসলে, মাস্টারমশাই স্থানীয় কংগ্রেস-কর্মীদের খপ্পরে পড়তে চান নি। পড়লেই তো সভাসমিতির আমন্ত্রণ। সম্মান জানানোর হিড়িক পড়ে যাবে। এমন সুযোগ কি কংগ্রেসীরা ছাড়ে ? সখারাম ড্রাইভারমশাই মাস্টারমশাইয়ের নির্দেশ অনুসারেই পচাগলা ওই ধর্মশালায় ব্যবস্থা করেছিল।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি, উনি আগেভাগে প্রস্তুত হয়ে আমাদের অপেক্ষা করছেন। অপেক্ষা করছেন আর আপন মনে স্কেচ করছেন। মাস্টারমশাই কোন্ সেই ভোরবেলায় উঠে পড়েছেন। এটি তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাস। তাঁর বিছানাটি পরিপাটি গুটিয়ে রাখা পায়ের দিকে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উনি উঠেছেন। উঠে সেই মুহূর্তের ছবি একমনে স্কেচ করছেন তো করছেনই।

যথাসম্ভব দ্রুত আমরা ঔরঙ্গাবাদ ছাড়লাম। বলা তো যায় না, খবর পেয়ে কংগ্রেসীরা কখন মাস্টারমশাইকে ধরে ফেলে। ইলোরা দূরে নয়। দূর-অদূর ভাবতে ভাবতে ঝট্ করে এসেও পড়লাম ইলোরা। এসে ইলোরা গুহার দিকে চড়াই উঠতে শুরু করলাম। কে বা আর না জানে যে, অজন্তাকে ভারতশিল্প ইতিহাসের মহাভারত বললে ইলোরাকে তার রামায়ণ বলতে হয়।

রামায়ণ-মহাভারতে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে চোখ বুলিয়েছি মাত্র। ওসব বিশ্লেষণের জিনিস নয়, উপলব্ধির জিনিস। ইলোরা পাহাড় থেকে নেমে এবার ভুসাওয়াল শহরের দিকে যাত্রা। ইলোরা দেখে আমরা যখন নীচে নেমেছি তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে। আজ রাত্রে আর কোথাও আশ্রয় নেবার কথা নেই। মাঝ রাত্রে বম্বে

মেল। মাস্টারমশাইকে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে আমি আমেদাবাদের ট্রেন ধরব ; মনে মনে তাই ঠিক আছে। সূর্যাস্তের মুহূর্তে আমরা গাড়ি করে নর্মদা নদীর পুল পার হচ্ছি। নদীর জল আবিরে গোলা স্রোত হয়ে বয়ে যাচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে আমরা নর্মদাতটে একটু নামলুম। খোলামেলা বালিয়াড়িতে। খুললাম টিফিনের ডিবেডাবা। জলযোগ। মাস্টারমশাইয়ের ইচ্ছে, দিনমানে ভুসাওয়ালে প্রবেশ করা সমীচীন হবে না। ওখানেও কংগ্রেস কমিটি আছে, কর্মীরা আছে। সখারামকে মাস্টারমশাই যে কী নির্দেশ দিয়েছেন তাও ঘুণাক্ষরে তখনও আমরা জানি নে।

ভুসাওয়ালের বেশ কাছেই এখন এসে গেছি আমরা। সখারাম ভুসাওয়ালের বাসিন্দা। শহর এসে গেল। বিস্তর দালান আর রাস্তাঘাট পেরিয়ে ঘন বস্তির একটা এঁদো গলিতে আমাদের গাড়ি ঢুকল। আঁকাবাঁকা ঘোরালো পথ। টিনে ছাওয়া ঘর। গোরু ছাগল মুর্গী নেড়ি কুত্তা আর বাচ্চা ছেলেরা এখানে-ওখানে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে। এই ঘোরাঘুরিই খুব সম্ভব এদের একমাত্র সান্ধ্য এনটারটেনমেন্ট। একটা কুচো গলির মোড়ে আমাদের গাড়ি অবশেষে থামল। এটি একটি তথাকথিত হরিজনপল্লী। সখারাম হরিজন। নিজের জাতব্যাবসা অন্যদের গু-মুত পরিষ্কার করা ছেড়ে ড্রাইভারিবিদ্যা শিখে কংগ্রেস-কর্মীদের সেবায় নিযুক্ত।

দেড়-কামরার একটা কুটিরে আমরা ঢুকলাম। এটি সখারামের প্রাসাদ। পৈত্রিক বসবাস। ঘরে ন্যাতা-জাবড়া ঠাসা। সখারামের স্থাবর সম্পত্তি। খাটে বিছানা নামধারী কী যেন বস্তু। খাটের তলায় হাঁড়িকুঁড়ি। সরিক বাড়ি। সখারামের বুড়ি মা, স্ত্রী, বাচ্চারা সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বসবার জায়গা করে দিল সাদরে। মাস্টারমশাই ওদের সকলের সঙ্গে হাসিমুখে গল্প জুড়ে দিলেন। সখারামের ভাবখানা সে যেন পৃথিবী জয় করেছে। সে মেতে উঠেছে আমাদের সকলের আহার-পর্বের ব্যবস্থায়।

টিমটিমে কেরোসিনের পিদিমে ঘরটা আলোছায়ায় মেশানো অদ্ভুত লাগছে। মাস্টারমশাই শান্তভাবে এর-ওর সকলের সঙ্গে কথা বলছেন, যেন এইরকম পরিবেশেই উনি বরাবর থেকে আসছেন। একজন বুড়োলোক দরজার কাছে এসে মাথাটা মাটিতে ছুঁইয়ে উবু হয়ে একটু বসে উঠে চলে গেল।

কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, আমি স্নব নই। নাকউঁচু ইন্‌টেলেকচুয়াল প্রফেসর নই। আমি ল্যাজ-মোটা কোনো ব্যুরোক্র্যাটও নই। তবু অকপটে বলব, সেই সন্ধ্যায় গা-ঘিন-ঘিন-করা অমন আশ্রয়ে আমার গা গুলিয়ে উঠছিল। অথচ আমার অতি প্রিয় মাস্টারমশাই, শিল্পজগতে যিনি স্বয়ং একটি বিস্ময়কর প্রতিভা, হাসিমুখে তিনি সবই আপন করে নিয়েছিলেন। তাই ভাবছি— সত্যিকারের শিল্পী হতে গেলে আগে বোধহয় মানুষ হতে হয়। অহংকারহীন মানুষ। সেখানে সব মানুষই সমান। কই, এ কথা তো আমাদের পাঠ্যপুস্তকের কোথাও নেই।

খাওয়াদাওয়া চুকতে দেরি হল। রাত দশটায় মোটঘাট সমেত আমরা ভুসাওয়াল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এলাম। বম্বে মেল বারোটার পর। হাতে আড়াই ঘণ্টা সময়। যাত্রীরা প্রায় সকলেই যে যার মুড়িসুড়ি দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঘুমোচ্ছে।

চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি বালক জুতো পালিশের বাক্স নিয়ে মাস্টারমশাই যে বেঞ্চিটাতে বসেছিলেন সেখানে ওঁর পায়ের কাছে এসে বসল। বসে মাস্টারমশাইয়ের জুতো জোড়া খুলে নিয়ে পালিশ করতে লেগে গেল। মাস্টারমশাই বালকটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। আমাদের ডেকে বললেন, 'ওহে, তোমরাও সকলে জুতো পালিশ করিয়ে নাও।'

এত রাত্তিরে একসঙ্গে চারজোড়া জুতো পেয়ে ছেলেটার উৎসাহ আর ধরে না। টিঙটিঙে রোগা-পাতলা চেহারা। ময়লা রঙ গায়ের। একমাথা ঝাঁকড়া কালো চুল। গায়ে উলিঝুলি জামা। হাঁটু পর্যন্ত ধুলো মাখা। চোখ দুটো এত বড়ো বড়ো যেন ঠিকরে বেরোবে এখুনি। সত্যি, কী টলটলে মুখশ্রী! মাস্টারমশাই ওর সঙ্গে রাজ্যের গল্প জুড়ে দিয়েছেন। ছেলেটা পালিশ করছে তো করছেই একটার পর একটা জুতো। ওর বাসা স্টেশনের কাছেই। বাড়িতে বাবা আছে। না, মা তো নেই। দুটি ভাই আছে। বড়োটি কাজ করে। বোনেরা বাড়ির কাজ

করে। বড়োই টানাটানির সংসার। এইসব কথা হচ্ছে আমাদের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে। মনে হচ্ছে, মাস্টারমশাই ছেলেটিকে পছন্দ করে ফেলেছেন। ছেলেটিকে উনি বললেন, 'এই শোন্, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে? যাবি? কলকাতায়? তোকে চাকরি দেব আমাদের ইস্কুলে। খাওয়া পরা থাকা সব পাবি। বুঝলি? হাতের কাজ শিখবি। তোর অনেক রোজগার হবে। মাঝে মাঝে এখানে বাবার কাছে আসবি। সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। চ, চ-রে আমাদের সঙ্গে।'

বালকটি হাঁ করে মাস্টারমশাইয়ের কথাগুলো যেন গিলল। হয়তো মনে মনে এক ঝলক অন্য জীবনের স্বপ্ন দেখে নিল, স্বচ্ছ জীবন সচ্ছল জীবন। মাস্টারমশাই বললেন, 'কী রে? তোর বাবা তোকে যেতে দেবেন তো?'

'বাবা নিশ্চয়ই রাজি হবেন,' ছেলেটি অভিভূতভাবে বললে।

'তবে যা শিগ্‌গিরি জিগ্যেস করে আয়। যা— ওঠ্ তা হলে। তুই এলে আবার টিকিট-ফিকিট কাটব তো।'

ছেলেটিকে আমরা একটু বেশি করেই বকশিশ দিলুম। সে এক ছুটে চলে গেল ওর বাবার কাছে মত আনতে।

'লক্ষ করছি ছেলেটির মুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। ওকে শেখালে শিখবে,' মাস্টারমশাই বললেন। 'প্রথমে কলাভবনের ফাইফরমাসের কাজ করুক। তার পর ওর ধাত বুঝে ওকে একটা লাইনে ফিট্ করে দেব। কিছুদিন মাটির ঘরে রামকিঙ্করের কাছে লাগানো যাবে। মাটি তৈরি শিখবে। মাটি শিখতেই কত সময় লাগে একেকজনের। তার পর মাটি সিমেন্ট কংক্রীট, ছাঁচ তোলা, তার খুঁটিনাটি। একে একেবারে হাতেনাতে তালিম দিতে হবে রে। তার পর নিজের কর্মজীবন ও নিজেই পাবে। এইরকম একেবারে অশিক্ষিতদের তালিম দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার খুব ইচ্ছে করে এক্সপেরিমেন্ট করতে। কিন্তু এমন ছাত্র পাই কই?'

এইসব বলতে বলতে গান্ধীজীর শিক্ষাপদ্ধতি, রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন, নিরক্ষর গ্রামবাসীর শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুণের কথায় কথায় প্রায় দুই ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে দেখতে দেখতে কেটে গেল! কিন্তু ছেলেটা কই? তার তো আর দেখা পাচ্ছি নে?

মাস্টারমশাই স্পষ্টতই অধৈর্য হয়ে পড়লেন। বললেন, 'কী হে, ও যে এখনো এল না!'

ট্রেনের সময় যতই এগিয়ে আসে উনি, শিল্পী নন্দলাল বসু, ততই উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। ছেলেটার বাবা হয়তো ছেলেকে ওদিকে বোঝাচ্ছে, ওরা তোকে কলকাতায় ধরে নিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসতে দেবে না।

এদিকে ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়ল। মাস্টারমশাই বালকটির চলে যাওয়ার রাস্তার দিকে কেবলই দৃষ্টিক্ষেপ করেন। সখারামের মুখে কথা নেই। সে এক মাস ধরে ত্রিপুরী থেকে সমানে তাঁর সেবা করে মাস্টারমশাইয়ের একান্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। ওর চোখ ছলছল করছে। মাস্টারমশাই বললেন, 'কই, ছেলেটা বলে গেল আসবে— কই, এখনো এল না তো!'

জুতো-পালিশ এই ছেলেটির আবির্ভাবের পর আমাদের আর অন্য কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন উঠতে পারছিল না। আমাদের কথাবার্তায় ধামা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কোনো ফাঁকই ছিল না আর কোনো বিষয় আলোচনার। বম্বে মেল ছেড়ে যাবার ঘণ্টাদুই পর আমার আমেদাবাদ গাড়ি অন্য প্ল্যাটফর্মে। মাস্টারমশাইয়ের শেষ অনুরোধ আমাকে, আমি যেন এই জায়গায় এই বেঞ্চিতে অন্তত আরও দেড় ঘণ্টা ঠায় অপেক্ষা করি। এবং ছেলেটি যদি আসে, তাকে আমার সঙ্গে যেন অবশ্য-অবশ্য আমেদাবাদে নিয়ে যাই। সেখান থেকে কোনো বিশ্বাসী লোকের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে যেন তাকে পৌঁছে দিই।

ট্রেন এসে গেল তুমুল শব্দ করে। ঘুমন্ত প্ল্যাটফর্ম কখন যে নানা রঙে কিলবিল করে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সেদিকে আমাদের কারো আর খেয়ালই ছিল না এতক্ষণ। পুরোনো সহপাঠীদের কাছে বিদায় নিলাম। আমার মাস্টারমশাইয়ের কাছেও। কিন্তু তিনি এতই অন্যমনস্ক যে বুঝতে পারলাম, এই আসছি বলে চলে-যাওয়া মাতৃহীন ছেলেটিকে উনি কিছুতেই আর ভুলতে পারছেন না!

লাস মেনিনাস

মিশেল ফুকো

শিল্পী আছেন ক্যানভাস থেকে ঈষৎ দূরে। তিনি মডেলকে এক ঝলক দেখে নিচ্ছেন ; হয়তো বা শেষ টানটা দেওয়া বাকি, আবার এমনও হতে পারে যে প্রথম আঁচড়টি এখনও কাটা হয় নি। তুলিধরা হাতটি বাঁ পাশে রঙের পাত্রের দিকে ভাঁজ করা অবস্থায় রয়েছে ; তা মুহূর্তের জন্য ক্যানভাস আর রঙের মাঝখানে নিশ্চল। সেই রূপদক্ষ হাতখানি দৃষ্টির নির্দেশের জন্য শূন্যে অপেক্ষমাণ, আর অপরপক্ষে দৃষ্টিও ওই থেমে-যাওয়া মুদ্রার জন্য প্রতীক্ষারত। তুলির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ও ইস্পাত-দৃষ্টির মাঝে দৃশ্য তার আয়তন উন্মোচন করতে উদ্যত।

কিন্তু এক সূক্ষ্ম কৌশল বাদ দিয়ে নয়। যে-ছবিখানি শিল্পী আঁকছেন, তারই এক-পাশে, ঈষৎ দূরত্ব বজায় রেখে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অর্থাৎ যে-দর্শক এই মুহূর্তে তাঁকে দেখছেন, তাঁর কাছে তিনি তাঁর ক্যানভাসের ডান দিকে অবস্থিত ; ক্যানভাসটি সম্পূর্ণ বাঁ দিক জুড়ে রয়েছে। সেই দর্শকের সামনে রয়েছে ক্যানভাসটির পিছন দিক ; দর্শক শুধু তার উলটো দিক এবং তাকে ধরে রাখার বিশাল ফ্রেমটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। অন্য দিকে শিল্পীকে তাঁর পূর্ণ দেহাবয়বে নিখুঁতভাবে দেখা যাচ্ছে ; অন্তত পক্ষে সেই উঁচু ক্যানভাস তাঁকে আড়াল করে নেই, যা হয়তো একটু পরেই যখন তিনি এক পা এগিয়ে আবার কাজ আরম্ভ করবেন, তখন তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। নিঃসন্দেহে ঠিক এই মুহূর্তেই দর্শকটির চোখের সামনে তিনি আবির্ভূত হলেন— যেন এইমাত্র বেরিয়ে এলেন এক মস্ত খাঁচা থেকে, যাকে তাঁর অঙ্ক্যমান ছবির উপরিতল পিছন দিকে ঠেলে দিয়েছে। এখন তাঁকে দেখা যায় মুহূর্তের স্তব্ধতায়, সেই দোলনের নিরপেক্ষ কেন্দ্রে। তাঁর অন্ধকারে ঢাকা দেহ ও উজ্জ্বল মুখ রয়েছে দৃশ্য আর অদৃশ্যের মাঝখানে : সেই যে ক্যানভাস, যা আমাদের চোখের আড়ালে থাকছে, তার থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আমাদের চোখের সামনে হাজির হয়েছেন ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ওঁর ডান দিকে এক পা সরে যাবেন তখন তিনি ওই ক্যানভাসের একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াবেন। তিনি আবার সেই অঞ্চলে প্রবেশ করবেন যেখানে তাঁর মুহূর্তের-জন্য-পরিত্যক্ত ছবিটি কোনো আড়াল না-রেখে বা অব্যক্ত না-থেকে তাঁর কাছে আবার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। যেন একই সঙ্গে, যে-ছবিতে উপস্থাপিত হচ্ছেন সেখানে লক্ষিত হতে এবং যার উপর কিছু উপস্থাপন করছেন [*representer* রপ্রেজন্তে] তা লক্ষ করতে পারেন না শিল্পী। তিনি বিরাজ করছেন এই দুই বিরোধী দৃশ্যমানতার দেহলীতে।

শিল্পী সামান্য মুখ ঘুরিয়ে, কাঁধের দিকে মাথা হেলিয়ে তাকিয়ে আছেন। কোনো অদৃশ্য বিন্দুতে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ, কিন্তু আমরা দর্শকরা সহজেই সেই স্থানিক বিন্দুটিকে নির্দেশ করতে পারি, কারণ সেই বিন্দু, সে তো আমরাই : আমাদের শরীর, আমাদের মুখ, আমাদের চোখ। অতএব যে-দৃশ্য তিনি লক্ষ করছেন তা দুভাবে অপ্রত্যক্ষ: [প্রথমত] যেহেতু তা ছবির পরিসরে উপস্থাপিত হয় নি। এবং [দ্বিতীয়ত] যেহেতু তা ঠিক সেই অন্ধ বিন্দুতে অবস্থিত, সেই অপরিহার্য গোপন স্থানে, যেখানে আমাদের দৃষ্টি আমাদের কাছ থেকে ঠিক দেখার মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিন্তু আবার আমরা কীভাবে ওই ওখানে আমাদের চোখের সামনে সেই অপ্রত্যক্ষতাকে প্রত্যক্ষ না-করে থাকব, কারণ তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিরূপ ও তার মুদ্রাঙ্কিত প্রতিকৃতি যে ছবিতেই উপস্থিত রয়েছে ? শিল্পী কী আঁকছেন আমাদের পক্ষে তা অনুমান করা সম্ভব হত যদি যে-ক্যানভাস তিনি আঁকছেন তা একবার আমরা দেখে ফেলতে পারতাম ; কিন্তু এই ক্যানভাসের বুনট, আড়েদিঘে বিন্যস্ত স্ট্রেচারের কাঠের পটি আর ইজেলের তেরছা পায়া ছাড়া আর তো কিছুই দেখা যায় না। একটি বৈচিত্র্যহীন

লাস্ মেনিনাস। রাজকন্যার সহচরীরা

ভেলাস্কেথ
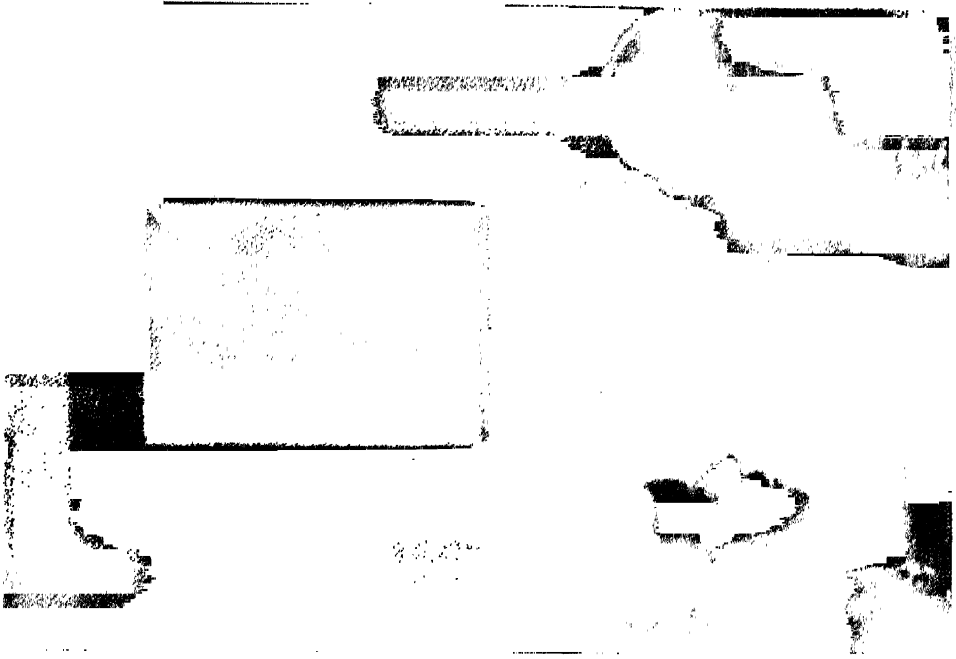
রাজকন্যার সহচরীরা—ভেলাসকেথ (ডিটেল)
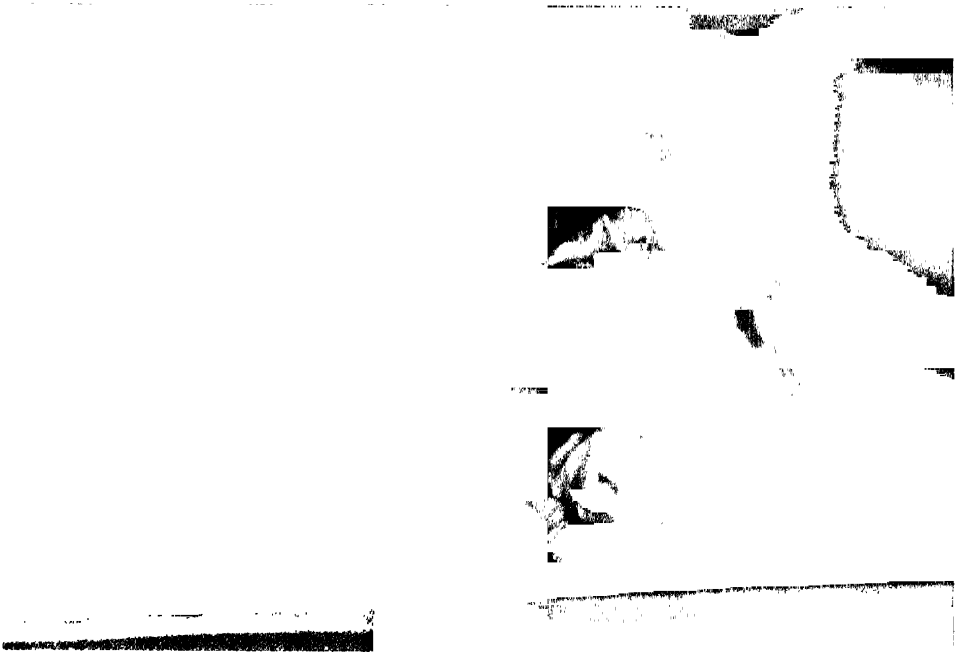
উঁচু আয়তক্ষেত্র আসল ছবির গোটা বাঁ দিক জুড়ে রয়েছে আর এই আয়তক্ষেত্রটি উপস্থাপিত ক্যানভাসের উলটো পিঠকে দেখাচ্ছে। যে গূঢ় অদৃশ্যমানতাকে শিল্পী দেখছেন, তাকে উপরিতলের আকারে এই আয়তক্ষেত্রটি পুনর্গঠন করছে। ছবির সেই দেশে [*espace* এস্‌পাস] আমরা আছি এবং আমরাই আবার সেই দেশ। শিল্পীর চোখ থেকে আরম্ভ করে তিনি যা দেখছেন, সেই পর্যন্ত একটি দৃপ্ত রেখা উৎকীর্ণ হয়ে যায় ; যা, আমরা যারা দেখছি তারা এড়াতে পারি না : সেই রেখাটি আসল ছবিকে আড়াআড়ি পেরিয়ে তার উপরিতলের সামনেকার সেই স্থানটিকে পুনর্যুক্ত করে যেখান থেকে আমরা দেখি সেই শিল্পীকে যিনি আমাদের দেখছেন ; সেই রেখায়িত বিন্দুমালা [*pointillé* পোয়াঁতিয়ে] অনিবার্যভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং ছবির উপস্থাপনার [*représentation* রপ্রেজ়ন্তাসিয়ঁ] সঙ্গে আমাদের যুক্ত করে।

আপাতদৃষ্টিতে সেই স্থানটি জটিলতাহীন ; এখানে শুধুই পারস্পরিকতার প্রশ্ন : আমরা একটি ছবি দেখছি, আবার সেই ছবির ভিতর থেকে একজন শিল্পী আমাদের দেখছেন। শুধু মুখোমুখি হওয়া, চোখে চোখ পড়ে যাওয়া, সরাসরি চোখাচোখি হওয়া ; এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু তবু এই দৃশ্যমানতার সূক্ষ্ম রেখার তলায় রয়েছে অনিশ্চয়তা, বিনিময় ও কৌশলের এক জটিল বিন্যাস। শিল্পী আমাদের দিকে ততটাই দৃষ্টি দেন যতটা আমরা তাঁর বিষয়বস্তুর আওতায় পড়ি। আমরা, দর্শকরাও, তো আছি। সেই দৃষ্টি আমাদের অভ্যর্থনাও জানায়, আবার প্রত্যাখ্যানও করে এবং আমাদের আগে সেখানে সর্বক্ষণ যা ছিল-- অর্থাৎ মডেল-- আমাদের স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু উলটোভাবে বলা যায়, ছবির বাইরে যে-শূন্যতা বিদ্যমান, তার দিকে ওঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ; আর শিল্পীর চোখের সামনে যতজন দর্শক আসেন, ওঁর দৃষ্টি ততজনকেই গ্রহণ করে মডেল হিসেবে। সেই নির্দিষ্ট কিন্তু নিরপেক্ষ স্থানে দ্রষ্টা এবং দৃষ্টের মধ্যে নিরন্তর বিনিময় চলে। কোনো দৃষ্টিই স্থায়ী নয়, বরং বলা যেতে পারে সমকোণে ক্যানভাসকে ভেদ-করা ওই দৃষ্টির নির্লিপ্ত পথে বিষয় আর বিষয়ীর, দর্শক আর মডেলের, ভূমিকা নিরবধি পালটাপালটি হতে থাকে। এবং এখানে ছবির বাঁদিকের শেষপ্রান্তে সেই বিশাল ক্যানভাসটি নিরন্তর অদৃশ্য থেকে তার দ্বিতীয় ভূমিকা সম্পাদন করে : দৃষ্টিগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক যেন কখনও আবিষ্কৃত বা চিরনির্দিষ্টভাবে স্থাপিত না হয় সেই চেষ্টা সে ক'রে যায়। ওই বড়ো ক্যানভাসটি ছবির এক দিকে যে অনচ্ছ নির্দিষ্টতা কায়েম করে, তা কেন্দ্রে দর্শক আর মডেলের এই রূপান্তরের খেলাকে গরকায়েম করে দেয়। যেহেতু আমরা ক্যানভাসের সেই উলটো পিঠ ছাড়া কিছুই দেখি না, তাই আমরা কে, বা কী করছি তাও আমরা জানি না। আমরা কি দৃষ্ট না দ্রষ্টা ? বর্তমানে শিল্পী এক বিশেষ স্থানকে দেখছেন যা মুহূর্তে মুহূর্তে তার অন্তর্বিষয়, আকার, মুখাবয়ব, আত্মপরিচয় অবিরত পালটাচ্ছে। কিন্তু তাঁর দুটি চোখের একাগ্র নিশ্চলতা আমাদের দৃষ্টিকে অন্য একটি দিকে চালিত করে যেদিকে তারা আগেও প্রায়ই গেছে এবং সন্দেহ নেই যেখানে তারা অচিরেই আবার যাবে : অর্থাৎ সেই স্থির ক্যানভাসের দিকে যেখানে একটি প্রতিকৃতি হয়তো দীর্ঘকাল ধরে, চিরদিনের জন্য আঁকা হচ্ছে, যা আর কোনোদিন কখনোই মুছে যাবে না। শিল্পীর সার্বভৌম দৃষ্টির নির্দেশে একটি ত্রিকোণের আদল গড়ে ওঠে যার সঞ্চারপথ নিরূপিত করে দেয় ওই ছবির ছবিটিকে : শীর্ষে, একমাত্র দৃশ্যবিন্দু হচ্ছে শিল্পীর চোখ ; নীচে, এক কোণে মডেলের অদৃশ্য অবস্থিতি ; অন্য কোণে, পিঠ-ফিরিয়ে-থাকা ক্যানভাসের উপর হয়তো রয়েছে প্রতিকৃতির স্কেচ।

দর্শককে দৃষ্টিক্ষেত্রে পাওয়ামাত্রই শিল্পীর চোখ তাঁকে বন্দী করে, ছবির মধ্যে ঢুকতে বাধ্য করে, তাঁকে একই সঙ্গে একটি বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট স্থান দেয়। তাঁর উপর তার প্রত্যক্ষ এবং উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য আরোপ ক'রে ঘুরিয়ে-রাখা ওই ক্যানভাসটির অগম্য উপরিতলে তা ফুটিয়ে তোলে। দর্শক তাঁর অদৃশ্যতাকে শিল্পীর কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে আর তাঁর নিজের কাছে চির-অদৃশ্য এক প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখেন। একটা সামান্য কৌশল তাঁর বিস্ময়কে যেমন বহুগুণ বাড়িয়েও দেয়, তেমন আরও অনিবার্য করে তোলে। একেবারে ডান প্রান্তে, খুব ছোটো পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা একটি জানলা থেকে ছবিতে আলো আসে ; সেই জানলার খাঁজ ছাড়া আর কিছুই প্রায় দেখা যায় না। এই জানলা দিয়ে আলোর ধারা এসে সমান দাক্ষিণ্যে ধুয়ে দেয় ছবির

দুই সন্নিহিত দেশকে : [১] ছবির উপরিতলকে এবং তৎসহ তার উপস্থাপিত আয়তনকে (অর্থাৎ শিল্পীর স্টুডিয়ো বা যে-ঘরে তিনি ইজেল রেখেছেন) ; [২] ছবির উপরিতলের সম্মুখবর্তী প্রকৃত আয়তনকে, যেখানে দর্শক রয়েছেন (অর্থাৎ যে-অপ্রকৃত স্থানে রয়েছেন মডেল)। ঘরের ডান থেকে বাঁ দিকে পরিব্যাপ্ত এই প্রশস্ত সোনালি আলো একই সঙ্গে দর্শককে ছবির দিকে এবং মডেলকে ক্যানভাসের দিকে টেনে আনে। এবং এই আলোই আবার যতটা শিল্পীকে আলোকিত ক'রে দর্শকের কাছে প্রত্যক্ষ ক'রে তোলে ততটাই মডেলের চোখে সেই প্রহেলিকাময় ক্যানভাসের ফ্রেমকে সোনালি রেখায় উজ্জ্বল ক'রে দেয়। এই ক্যানভাসের মধ্যে মডেলের প্রতিকৃতি পরিবাহিত হওয়া মাত্রই সেখানে বাঁধা পড়ে থাকবে। সেই প্রান্তবর্তী, একফালি, প্রায়-অপ্রত্যক্ষ জানলা একরাশ মিশ্রিত দিনের আলো ঢেলে দেয় ; এই আলোর ধারা হয়ে উঠছে গোটা উপস্থাপনার যৌথ অবস্থান-ক্ষেত্র। ছবির অন্য পাশে যে-অদৃশ্য ক্যানভাসটি রয়েছে, তার ভারসাম্য বজায় রাখে এই জানলা। ক্যানভাসটি দর্শকের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে সেই ছবিরই মধ্যে, যে-ছবি তাকে উপস্থাপন করছে। ক্যানভাসটি তার উলটো পিঠ— তার দৃশ্যগোচর দিক— ছবির উপর সমারোপ ক'রে আকার দেয় আমাদের পক্ষে অনধিগম্য এক ক্ষেত্রকে, যেখানে ঝিকমিক করে ওঠে ওই মহীয়ান প্রতিকৃতি। এই ক্যানভাসটি যে-দেশকে আকার দেয় সেটা যত প্রচ্ছন্ন, নিখাদ আলোকরন্ধ্র এই জানলাখানি আকার দেয় যে-দেশকে সেই অন্য দেশটি ততই প্রকাশ্য। একটি দেশ বহুজনের— শিল্পীর, পাত্রপাত্রীর, মডেলদের, দর্শকদের— যৌথ অবস্থানভূমি ; অন্য দেশটি নির্জন (কারণ সেই দেশকে দেখছে না কেউই, এমন-কি শিল্পীও নয়)। ডান দিকে, এই অদৃশ্য জানলা দিয়ে স্বচ্ছ আলোর ধারা ছড়িয়ে প'ড়ে সম্পূর্ণ উপস্থাপনাকেই দৃষ্টিগ্রাহ্য করে ; বাঁ দিকে— ছবির অতিপ্রকাশ্য বুনটের বিপরীত দিকে— ছড়িয়ে পড়ছে সেই উপরিতল, যা ছবির উপস্থাপনাকে প্রচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। সেই আলো দৃশ্যটিকে (আমি বোঝাতে চাইছি : ঘরটাকেও, ক্যানভাসটাকেও ; ক্যানভাসে উপস্থাপিত ঘরটাকে আর যে-ঘরে ক্যানভাসটা রয়েছে সেই ঘরটাকে) প্লাবিত ক'রে পাত্রপাত্রী আর দর্শকদের ঘিরে ফেলে তাদের টেনে নিয়ে যায় শিল্পীর ছবির সামনে দিয়ে, সেই স্থানে যেখানে শিল্পীর তুলি তাঁদের উপস্থাপন করতে যাচ্ছে। কিন্তু সেই স্থান তো রয়েছে আমাদের চোখের আড়ালে। আমরা শিল্পীর চোখে নিজেদের অবলোকিত হতে দেখি এবং যে-আলোয় আমরা তাঁকে দেখি সেই আলোতেই আমরা তাঁর কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য হই। আর যে-মুহূর্তে আমরা টের পাই শিল্পীর হাত আমাদের প্রতিরূপ যেন একটি আয়নায় ধরে রাখছে, সেই মুহূর্তে আমরা প্রত্যক্ষ করি তার শুধু সেই অংশটুকুকে যা [ওর] ম্লান উলটো পিঠ। একটি মনের অন্য দিক।

এই স্রষ্টা [*auteur* ওতেঅর] দর্শকদের— অর্থাৎ আমাদের— ঠিক মুখোমুখি, ঘরের একেবারে শেষপ্রান্তের দেওয়ালে এক সার ছবি উপস্থাপন করেছেন ; আর আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওই-যে টাঙানো ক্যানভাসগুলি রয়েছে, ওদের মধ্যে একটি ক্যানভাস অনন্য ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান। অন্য ফ্রেমগুলির তুলনায় এর ফ্রেমটা আরও চওড়াও বটে, কালোও বটে। তবে ওর ভিতরের চার দিক ঘিরে রয়েছে একটি সরু সাদা রেখা। এই ছবিখানির উপরিতলে ওই রেখাটি যে চাপা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার উৎস সঠিক জানা যায় না ; কারণ ওই আলো— যদি-না কোনো অভ্যন্তরীণ দেশ থেকে এসে থাকে— তা হলে সে আলো আসছে এক অনির্দেশ্য দেশ থেকে। সেই অদ্ভুত আলোয় দুটি সিলুয়েট দেখা যায় যাদের উপরে— পিছনের দিকে— নীলাভ-লাল রঙের একটি ভারী পর্দা ঝুলছে। অন্য ছবিগুলিতে আবছা রাত্রির চেয়েও বেশি পাণ্ডুর, কয়েকটি রঙের পোঁচ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। অন্য পক্ষে এটা খুলে যাচ্ছে, ক্রমাগত সরে-সরে-যাওয়া এক দেশের দিকে যেখানে শনাক্তযোগ্য সমস্ত রূপ বিন্যস্ত হয়ে যায় সেই আলোয়, যার উৎস সেই দেশ। যে-সব উপাদান উপস্থাপিত হওয়া অভিপ্রেত ছিল সেগুলি কিন্তু অবস্থানগত অথবা দূরত্বগত কারণে উপস্থাপনাকে বাধা দেয়, আড়াল করে, লুকিয়ে রাখে ; শুধু এইটেই— দূরত্ব সত্ত্বেও, চতুর্দিকে ছায়ার বেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও—বিশ্বস্তভাবে তার কাজ সম্পন্ন করে : তার যা দেখাবার তা দেখায়। কিন্তু এটি তো ছবি নয়, এটি আয়না। এই আয়না অবশেষে সেই দ্বৈতের কুহক জোগাল, যা দূরের ওই ছবিগুলিও দেয় নি, যা পুরোভূমির ওই আলো আর ওই আইরনির

ব্যঞ্জনাবাহী ক্যানভাসও দেয় নি।

যত উপস্থাপনা এ ছবিতে উপস্থাপিত, তাদের মধ্যে শুধু এই আয়নাটিই দেখতে পাওয়া যায় ; কিন্তু কেউই এর দিকে তাকায় না। ক্যানভাসের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে শিল্পী তো ওঁর অখণ্ড মনোযোগ দিচ্ছেন মডেলের দিকে ; তিনি তাঁর পিছনের ওই মৃদু-উজ্জ্বল আয়না দেখতে পান না। ছবির বেশির ভাগ পাত্রপাত্রীর মুখ ঘোরানো রয়েছে সামনে যা ঘটছে তার দিকে— ক্যানভাসের প্রান্তবর্তী ওই উজ্জ্বল অদৃশ্যমানের দিকে। তাঁদের মুখ ঘোরানো ওই আলোর অলিন্দের দিকে ; ওঁরা তাকিয়ে আছেন তাঁদেরই দিকে ; যাঁরা ওঁদের দেখছেন। তাঁরা ওই ছায়াচ্ছন্ন গহ্বরের দিকে তাকিয়ে নেই, যেখানে তাঁদের উপস্থাপন করা হচ্ছে। অবশ্য বেশ-কয়েকটি মুখের পার্শ্বচিত্র ধরা আছে। কিন্তু কোনো মুখই ততটা ঘুরে নেই, যতটা ঘুরে থাকলে ঘরের শেষ প্রান্তের সেই নিঃসঙ্গীকৃত আয়নাটিকে, সেই ছোটো ঝিলমিলে আয়তক্ষেত্রটিকে— যা নিছক দৃশ্যমানতা বৈ আর-কিছু নয়— দেখতে পাবে। এমন কোনো দৃষ্টিই নেই, যা তাকে আয়ত্তে আনতে, তাকে প্রকৃত ক'রে তুলতে পারে ; যা আস্বাদন করতে পারে ওই দৃশ্যের চকিতে পরিপক্ব-হয়ে-ওঠা ফলটিকে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে সেই নিঃস্পৃহতা একমাত্র আয়নার নিঃস্পৃহতার সঙ্গে তুলনীয়। বস্তুত ওই একই জায়গায় আর যা-কিছু রয়েছে, তার কোনো কিছুকেই এই আয়না প্রতিফলিত করছে না : শিল্পী, যিনি আয়নার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছেন, তাঁকেও না ; ঘরের মাঝখানে আর যাঁরা রয়েছেন, তাঁদেরও না। যা দৃশ্যমান, তাকে এই উজ্জ্বল গহ্বরে ঝুলন্ত আয়নাটি দেখাচ্ছে না। পরম্পরাগত ডাচ চিত্রকলায় আয়নার অনুলিপিকরণের একটা ভূমিকা ছিল : ছবিতে যা প্রথমে একবার দেখানো হয়েছে, তাকেই আয়নায় আরেকবার দেখানো হত। তবে দেখানো হত এমন এক দেশের অভ্যন্তরে, যে-দেশ অপ্রকৃত, ঈষৎ রূপান্তরিত, সংকুচিত ও বক্রীকৃত। ছবিতে যা প্রথমে দেখানো হয়েছে, তাকেই ভেঙে আবার নতুন নিয়মে পুনর্রচনা করে দেখানো হত আয়নার মধ্যে। কিন্তু এখানে এই আয়না এমন কিছুই বলছে না, যা আগে বলা হয়ে গেছে। তবু তার অবস্থান প্রায় কেন্দ্রীয় : তার উপরের প্রান্ত ঠিক সেই রেখার উপর অবস্থিত যেটি ছবিটির উচ্চতাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করছে। আয়নাটি টাঙানো রয়েছে দূরবর্তী দেওয়ালের (অন্তত্পক্ষে তার দৃশ্যগোচর অংশের) মাঝখানে। তা হলে ছবিরই পরিপ্রেক্ষিত-রেখা অবশ্যত আয়নার উপর দিয়েও আড়াআড়ি চলে যাবে। এমন হতেই পারত, একই স্টুডিয়ো, একই শিল্পী, একই ক্যানভাস, ওই আয়নার মধ্যে যেন এক অভিন্ন দেশে বিন্যস্ত হয়ে যাবে। [ছবিতে যা দেখানো হয়ে গেছে তার] এক নিখুঁত অনুলিপি হতে পারত এই আয়নাটি।

আসলে ছবি নিজে যা-কিছু উপস্থাপন করছে তার কিছুই আয়নাটি আমাদের দেখায় না। আয়নাটির স্থির দৃষ্টি চলে যায় ছবির বাইরে। ছবির সম্মুখবর্তী স্থানটিতে যে-পাত্রপাত্রী সন্নিবিষ্ট, সেই স্থির দৃষ্টি তাঁদের উপরে নিবদ্ধ। আর ওই স্থানটি তো ছবির বহির্মুখ এবং অবশ্যতই অদৃশ্য। যত দৃশ্যবস্তু রয়েছে তাদের এই দর্পণ প্রদক্ষিণ করে না। উপস্থাপন-ক্ষেত্রের যা-কিছু [প্রতিবিম্বে] ধরে রাখা সম্ভবপর, তা উপেক্ষা ক'রে— ওই গোটা ক্ষেত্রটিকে পেরিয়ে গিয়ে— এই আয়না তাকেই দৃষ্টিগোচর করে তোলে, যা সমস্ত দৃষ্টির বাইরে। কিন্তু যে অদৃশ্যমানতাকে সে পরাভূত করে তা কোনো প্রচ্ছন্ন অদৃশ্যমানতা নয় : সে কোনো বাধা পাশ কাটিয়ে যায় না, সে কোনো পরিপ্রেক্ষিতের ব্যত্যয় ঘটায় না। ছবির কাঠামোর কারণে যা অদৃশ্য, আর এই ছবিখানি ছবি হওয়ার কারণেই যা অদৃশ্য, তাকেই ধারণ করতে নিজেকে নিয়োগ করছে এই আয়না। ছবির পাত্রপাত্রী সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে যা দেখতে নিবিষ্ট, তাকেই তো এই আয়নাটি প্রতিবিম্বিত করছে। অর্থাৎ ছবিটা যদি সামনের দিকে ক্রমপ্রসারিত হয়ে— আরও নীচে নেমে এসে— যে-পাত্রপাত্রী শিল্পীর মডেল, তাঁদেরও ছবির পরিসরের মধ্যে নিয়ে আসত, তা হলে দর্শক যা দেখতে পেত, সেই দৃশ্যটিরই, প্রতিবিম্ব পড়ছে এই আয়নায়। যে হিসেবে এইটে শুধুই ছবি— অর্থাৎ রেখা আর রঙের এক আয়তখণ্ড, যার কাজ : সম্ভাব্য দর্শকের চোখের সামনে কিছু উপস্থাপন করা— সে হিসেবে, যা ছবির বাইরে তারই তো প্রতিচ্ছায়া পড়ছে এই দর্পণে ; কারণ ক্যানভাস তো শুধু শিল্পীকে আর ওঁর স্টুডিয়োকে দেখিয়েই থেমে যাচ্ছে। শিল্পী (উপস্থাপিত শিল্পী অর্থাৎ

বাস্তবের শিল্পী, যে-শিল্পী ছবিখানি আঁকছেন) যে-পাত্রপাত্রীকে দেখছেন, তাঁরা ঝিকমিক করে উঠছেন ঘরের শেষ প্রান্তের, সকলের উপেক্ষিত, ওই আয়নায় ; আর যে-পাত্রপাত্রী শিল্পীকে (যে-শিল্পী শিল্পমাধ্যমগত অর্থে বাস্তব, যিনি রেখায় আর রঙে ক্যানভাসে বিন্যস্ত) দেখছেন, একইভাবে, তাঁদেরও প্রতিচ্ছায়া ওই আয়নায় পড়ছে। এই-যে দ্বিবিধ পাত্রপাত্রী, এঁরা উভয়েই অনধিগম্য, তবে ভিন্ন ভিন্নভাবে অনধিগম্য : প্রথমে উল্লিখিত পাত্রপাত্রী অনধিগম্য রয়ে যান, এই ছবিখানিরই বিশেষ ধরনের কম্পোজিশনের গুণে ; নির্বিশেষে সমস্ত ছবির অস্তিত্ব যে-নিয়মে বিধৃত, তারই দ্বারা অনধিগম্য রয়ে যান ওই দ্বিতীয়বার উল্লিখিত পাত্রপাত্রী। এখানে, এক অস্থিত সমারোপের মারফত, এই দুই ধরনের অদৃশ্যমানতাকে একটির জায়গায় অন্যটিকে নিয়ে আসাই উপস্থাপনার খেলা। আর সেই খেলার আরেক দিক হচ্ছে ওই দুই ধরনের অদৃশ্যমানতাকে, একই সঙ্গে, চিত্রায়িত করা ছবির একেবারে অন্য প্রান্তে— যে-মেরুতে উপস্থাপনার সর্বোচ্চ শিখর : উপস্থাপনার এই খেলা ছবির অন্তর্দেশের গভীরতায় নিয়ে আসছে প্রতিবিম্বের গভীরতাকে। আয়নাটি দৃশ্যমানতার যে-বিপর্যাস নিশ্চিত ঘটিয়ে তোলে, তার দ্বারা ছবিতে উপস্থাপিত দেশও যেমন আক্রান্ত, সে দেশের উপস্থাপনার স্বরূপও তেমন আক্রান্ত। যা দুবার ছবি থেকে অবশ্যত অদৃশ্য হয়ে যায়, তাকে এই আয়না ক্যানভাসের কেন্দ্রে দৃশ্যগোচর করে তোলে।

কথিত আছে, তাঁর ছাত্র [ভেলাস্‌কেথ] যখন ওঁর স্টুডিয়োতে কাজ শিখতেন, সেই সময়ে বৃদ্ধ পাচেরো এই উপদেশ দেন : 'প্রতিকৃতি বেরিয়ে আসবে ফ্রেম থেকে।' সেই উপদেশের এ যেন এক বিচিত্র আক্ষরিক প্রয়োগ— তবে উলটো দিকে।

২.

যে প্রতিকৃতি আয়নার ওপর জেগে উঠছে আর যাকে ছবির সামনে শিল্পী নিরীক্ষণ করছেন, তার নাম দেবার এইবার হয়তো সময় হয়েছে। যে-সব পাত্রপাত্রী এখানে রয়েছেন বা চিত্রিত হয়েছেন, তাঁদের পরিচয় এবার নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়াই হয়তো ভালো ; তা হলে 'শিল্পী', 'চরিত্ররা', 'মডেলরা', 'দর্শকরা', 'প্রতিকৃতিনিচয়'— এইসমস্ত শিথিল, অংশত বিমূর্ত, দ্ব্যর্থময় ও পুনরুক্তিবহুল অভিধা নিরন্তর জড়িয়ে মড়িয়ে একাকার হয়ে যাবে না। যা দৃষ্টিগ্রাহ্য, তাকে প্রকাশ করতে যে-ভাষা সম্পূর্ণ অক্ষম তা অনবরত ব্যবহার না ক'রে, এটুকু বলাই যথেষ্ট : ভেলাস্‌কেথ একটি ছবি এঁকেছেন ; সেই ছবিতে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেছেন তাঁর স্টুডিয়োতে বা রাজপ্রাসাদ [*Escurial* এস্‌কুরিয়াল]-এর একটি ঘরে, দুজন পাত্রপাত্রীর ছবি আঁকবার সময়ে ; ওই পাত্রপাত্রীকে নিরীক্ষণ করছেন কনিষ্ঠা রাজকন্যা মার্গারিতা আর ওঁকে ঘিরে রয়েছেন শিক্ষিকা-অভিভাবিকারা, সহচরীরা, সভাসদেরা আর বামনেরা। এই দলে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের নাম সঠিক বলা যায় : ঐতিহ্য বলে দিচ্ছে, এইখানে রয়েছেন মারিয়া অগুস্তিনা সার্‌মিয়েন্‌তে, ওই দিকে নিএতো, পুরোভূমিতে ইতালীয় ভাঁড় নিকোলাসো পের্তুসাতো। এটুকু যোগ করাই যথেষ্ট : এখানে শিল্পীর কাছে মডেল হিসেবে যে-দুজন রয়েছেন তাঁদের অন্তত সোজাসুজি দেখা যাচ্ছে না ; কিন্তু একটা আয়নার মধ্যে তাঁদের দেখা যাচ্ছে ; নিঃসন্দেহে, তাঁরা হচ্ছেন রাজা চতুর্থ ফিলিপ ও তাঁর স্ত্রী মারিয়ানা।

এইসব নামবাচক বিশেষ্য কাজে লাগবে পরিচয়-চিহ্ন হিসেবে, এগুলো প্রয়োগ ক'রে অস্পষ্ট পদবি-ব্যবহারও এড়ানো যাবে। শিল্পীই বা কী দেখছেন, আর ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে ছবির বেশিরভাগ পাত্রপাত্রীই বা কী দেখছেন, অন্তত সেটা তো আমাদের জানিয়ে দেবে ওইসব নামশব্দ। কিন্তু ভাষার সঙ্গে ছবির সম্পর্ক তো এক অনন্ত সম্পর্ক। এমন নয় যে শব্দেই ন্যূনতা আছে। এও নয় যে যা দৃষ্টিগ্রাহ্য তার মোকাবিলায় শব্দের এমনই খামতি আছে, যা বহু চেষ্টাতেও সে পূরণ করতে অক্ষম। ভাষা আর ছবি তো একে অন্যতে রূপান্তরযোগ্য নয়। যা দেখছি, তা বলার চেষ্টা যতই করি, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য, তা কখনোই ভাষায় ধরা পড়ে না। যা বলছি, তা দৃষ্টিগম্য করে তোলার জন্য যতই প্রতিমা উৎপ্রেক্ষা উপমা প্রয়োগ করি-না কেন, যে-ক্ষেত্রকে তারা আলোকিত

করে, সে-ক্ষেত্র তো চোখের আলোয় উদ্‌ভাসিত নয়— সে যে পদবিন্যাসের ক্রমের দ্বারা নিরূপিত। এই খেলায় নামশব্দ তা হলে নিছক করণকৌশল : এর দ্বারা আঙুল দিয়ে দেখানোর কাজটা চালানো যায় ; অর্থাৎ, অলক্ষ্যে চলে যাওয়া যায়, ভাষার দেশ থেকে দৃষ্টির দেশে। যেন ওরা তুল্যমূল্য : একটার উপর আরেকটাকে বসিয়ে দেওয়া যায়, সহজেই। আমরা যদি এই বচনীয় আর দর্শনীয়ের সম্পর্ক খোলা রাখতে চাই, এই দুই ক্ষেত্রকে ছুঁয়ে থাকার উদ্দেশ্যে ওদের বৈপরীত্যের কথা না তুলে, ওদের বৈষম্য থেকেই আলোচনা শুরু করি, তা হলে নামবাচক বিশেষ্যগুলিকে মুছে ফেলে, এ-কাজের অন্তহীনতায় নিজেদের নিবিষ্ট তো করতেই হবে। হয়তো ওই ধূসর, নামহীন ভাষার মাধ্যমেই— যে-ভাষা হয়তো অতিব্যাপ্তির দরুন পুনরুক্তিময়, খুঁতখুঁতে— ছবিখানি অল্পে অল্পে ওর ভাস্বরতা অপাবৃত করে দেবে।

অতএব, আয়নার মধ্যে কার প্রতিবিম্ব পড়ছে, তা না-জানার ভান ক'রে ওই প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব বিষয়ে মূলগত প্রশ্ন তুলতে হবে আমাদের।

প্রথমত, প্রতিবিম্বটি বাঁ দিকে উপস্থাপিত ওই বিরাট ক্যানভাসের উলটো দিক। উলটো না, বরং সোজা দিক ; কারণ ক্যানভাসটি ওইভাবে থাকার জন্য যা আমাদের কাছে লুকিয়ে রাখে, প্রতিবিম্বটি তা সামনাসামনি দেখিয়ে দেয়। উপরন্তু ওই প্রতিবিম্বটি আয়নাটির প্রতিকূলও বটে, অনুকূলও বটে। জানলার মতোই তা [আয়নাটি] ছবির এবং ছবির বাইরে যা-কিছু তাদের যৌথ অবস্থানভূমি। কিন্তু জানলাটিকে ক্রিয়াশীল রাখে এক বিরতিহীন বিকিরণের গতিময়তা। যা, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে বাহিত হয়ে নিরীক্ষণরত পাত্রপাত্রীদের, শিল্পীকে আর ক্যানভাসটিকে যুক্ত করে দেয় সেই দৃশ্যের সঙ্গে যে-দৃশ্য তাঁরা দেখছেন। অন্য পক্ষে, আয়নাটি তার হামলে-পড়া, তাৎক্ষণিক, অতর্কিত গতি নিয়ে চলে যায় ছবির সামনে ; তাঁদের ধারণ করতে চায় যাঁরা লক্ষিত অথচ অ-দৃশ্য। আয়নাটি ছবির কল্পিত গহনতায় তাঁদের দৃশ্যমান করে তোলে ; অথচ প্রত্যেকের দৃষ্টিকে রেখে দেয় তাঁদের প্রতি নিঃস্পৃহ, উদাসীন। প্রতিবিম্ব আর প্রতিবিম্বিতের মধ্যে উৎকীর্ণ সেই দৃপ্ত রেখায়িত বিন্দুমালা [পোয়াঁতিয়ে] পার্শ্ববর্তী আলোর ধারাকে সমকোণে ছেদ করে। শেষত— আর এটাই হচ্ছে আয়নাটির তৃতীয় ভূমিকা— আয়নাটি দেওয়ালের শেষ প্রান্তে ওই দরজাটির সংলগ্ন হয়ে যায়। ওই দ্বারপথের মতোই এই আয়নাও দেওয়ালের মধ্যে এক খোলা পরিসর তৈরি করে দেয়। এই দ্বারপথ যে স্পষ্ট আয়তক্ষেত্র গড়ে তোলে তার মৃদু আলো ঘরের ভিতরে বিচ্ছুরিত হয় না। কারুকার্যখচিত একটা পাল্লা, একটা পর্দার বাঁকানো ভাঁজ, আর খানকয়েক সিঁড়ির ছায়া টের পাইয়ে দিচ্ছে এটা বাইরের দিকে খোলা ; নয়তো ওই দরজাটাকে মনে হত, ওইটে শুধুই একটা সোনালি প্যানেল। সিঁড়িগুলির পর একটা করিডরের শুরু। যেটা প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে হারিয়ে যায় না ; ক্ষীণ হতে হতে মিলে যায় এক হলুদ উদ্‌ভাসে, যেখানে আলো ভিতরে ঢোকে না, বরং নিজেরই চার পাশে এক আবর্তের সৃষ্টি ক'রে বিশ্রান্ত থাকে। সেই প্রান্তে, একই সঙ্গে কাছে এবং অপার দূরত্বে, একটি মানুষের দীর্ঘ সিলুয়েট স্পষ্ট হয়ে ওঠে ; তাঁকে পাশ থেকে দেখা যায় ; এক হাত দিয়ে তিনি পর্দার ভার ধরে আছেন ; তাঁর পা দুটি দুই ভিন্ন সিঁড়ির উপর ; তাঁর হাঁটু ভাঁজ করা। হয়তো তিনি ঘরে ঢোকার উপক্রম করছেন ; হয়তো বা তিনি শুধুই ভিতরে যা হচ্ছে তা একাগ্রমনে দেখছেন ; দেখছেন যেন আবিষ্কারের বিস্ময়ে অথচ সবার অলক্ষ্যে। আয়নার দিকে সকলে যতটা নজর দিচ্ছে, ওঁর দিকে তার চেয়ে বেশি নজর কেউ দিচ্ছে না। তিনি কোথা থেকে আসছেন তা কেউ জানে না ; মনে হতে পারে, তিনি অনেক অচেনা করিডর দিয়ে হেঁটে ওই ঘরটিকে প্রদক্ষিণ করেছেন, যে-ঘরে পাত্রপাত্রীরাও জড়ো হয়েছেন, শিল্পীও কাজ করছেন। হয়তো একটু আগেই তিনি দৃশ্যের সামনে সেই অলক্ষ্য জায়গাটিতেই ছিলেন, যার ওপর এখন ছবির সব ক'টি চোখ নিবদ্ধ। যাঁদের প্রতিকৃতি আয়নার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি, হয়তো তাঁদেরই মতন ইনিও সেই প্রত্যক্ষ অথচ প্রচ্ছন্ন দেশের দূত। তবুও একটা তফাত আছে : তিনি ওখানে সশরীরে উপস্থিত ; তিনি বাইরে থেকে হঠাৎ হাজির হয়েছেন উপস্থাপিত ক্ষেত্রের দেহলীতে। তিনি সংশয়াতীত— প্রতিবিম্ব নন, নিশ্চিত তাঁর আবির্ভাব। ছবির সামনে, এমন-কি স্টুডিয়োর দেওয়ালের বাইরেও, যা ঘটছে, তা তো দেখিয়ে দিচ্ছে ওই আয়নাটি ;

আর এইটে দেখাতে গিয়ে এ আয়না অন্দর আর বাহিরের মধ্যে সৃষ্টি করছে পেন্ডুলামের দোলন। ওঁর এক পা সিঁড়ির ওপরে রাখা। শরীরটা সম্পূর্ণ পাশ ফেরানো। এই দুর্বোধ আগন্তুক একই সঙ্গে ভিতরে ঢুকছেন আর বাইরে যাচ্ছেন, যেন এই দু দিকে ভিন্নমুখী গতির ভারসাম্যে সংস্থির। প্রতিকৃতি দুটো তো এক ঝলকে ঘরটা পেরিয়ে আয়নার মধ্যে ঢুকে তার ওপর প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তোলে ; আবার তা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে দৃশ্যগোচর, নতুন, প্রজাতি-রূপ নিয়ে। এই আগন্তুক একই জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ওঁর স্বল্পালোকিত শরীরের বাস্তবতায় তাদের সেই তাৎক্ষণিক গতির পুনরাবৃত্তি ঘটান। আয়নার ওই ঈষৎ-পাণ্ডুর, ছোটো আয়তনের সিলুয়েট-দুটোর প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে দরজার খাঁজে সমুপস্থিত এই দীর্ঘাকৃতি, সুগঠিত মানুষটির শারীরিক উচ্চতা।

কিন্তু আমাদের আবার ছবির দূরপ্রান্ত থেকে দৃশ্যের সামনে নেমে আসতে হবে ; ছেড়ে আসতে হবে সেই পরিধি যার শঙ্খরেখা আমরা এতক্ষণ অনুসরণ করছিলাম। বাঁ দিকে শিল্পীর ওই চোখদুটি যেন ঈষৎ-সরানো কেন্দ্র। সেখান থেকে শুরু করলে প্রথমেই নজরে পড়ে ক্যানভাসের উলটো পিঠ ; তার পর দেওয়ালে ঝোলানো সারি সারি ছবি, যার কেন্দ্রে রয়েছে সেই আয়না ; তার পর ওই খোলা দরজাটা ; তার পর আরও ছবি— তবে পরিপ্রেক্ষিতের তীক্ষ্নতার দরুন ওই ছবিগুলোর পুরু ফ্রেম ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না : আর সবশেষে, একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে, রয়েছে সেই জানলা বা দেওয়ালের সেই রন্ধ্র, যেখান দিয়ে নামছে আলোর ধারা। এই শঙ্খরেখা উপস্থাপনার সম্পূর্ণ বৃত্তটিকে সামনে নিয়ে আসে : [শিল্পীর] দৃষ্টি, রঙের পাত্র আর তুলি, চিহ্নবিহীন ক্যানভাস (এগুলি উপস্থাপনার বস্তুগত উপকরণ), সারি সারি ছবি, প্রতিবিম্বগুলি, বাস্তবের ওই মানুষটি (নিষ্পন্ন উপস্থাপনা, তবে এ উপস্থাপনা যেন ওরই প্রতিন্যাসে রাখা সেই অলীক বা সত্য বিষয়বস্তু থেকে মুক্ত) ; তার পর এই উপস্থাপনা ঘটায় নিজের মুক্তি : দেখা যায় শুধু ফ্রেমগুলো, আর দেখা যায় সেই আলো যা বাইরে থেকে ছবিগুলোকে ধুইয়ে দেয় ; তবে ওইসব ছবি সেই আলো-কে নিজেদের মতো ক'রে এমনভাবে পুনর্গঠন করে যেন তা অন্য কোথা থেকে এসে ওদের কালো কাঠের ফ্রেম ভেদ করে যায়। বস্তুত দেখলে মনে হয়, সেই আলো যেন ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে ঠিকরে পড়ছে ছবির উপর। আর ফ্রেমের সেই ফাঁক থেকে বেরিয়ে, সে আলো শিল্পীর কপাল, গালের হাড়, ওঁর দুই চোখ, চোখের দৃষ্টিকে ছুঁয়ে থাকে। শিল্পী তো এক হাতে ধরে আছেন রঙের পাত্র আর অন্য হাতে সূক্ষ্ম তুলি...। আর এভাবেই নিরুদ্ধ হয়ে যায় সেই শঙ্খরেখা, বরঞ্চ বলতে পারি, ওই আলোর আনুকূল্য পেয়ে খুলেই দেয় সে নিজেকে।

এই যে খোলা-জায়গাটা, এটা পিছনের ওই খোলা-দরজাটার মতো একেবারেই নয় ; এটা ছবিরই ওসার ; যাঁদের দৃষ্টি এটার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তা কোনো দূরের আগন্তুকের নয়। যে আলেখ্যের সারি ছবির পুরোভূমি আর মধ্যভূমি জুড়ে রয়েছে তা মোট আটটি (শিল্পী সহ) চরিত্রকে উপস্থাপন করছে। ওঁদের মধ্যে পাঁচজনই— মাথা কম-বেশি হেলিয়ে, ঘুরিয়ে বা ঝুঁকিয়ে— ছবি থেকে সামনের দিকে সোজাসুজি দেখছেন। সেই দলের কেন্দ্রে রয়েছেন ছোটো রাজকন্যা। গোলাপি আর ছাই রঙের ঘের-দেওয়া জামা পরে রয়েছেন তিনি। ছবির ডান দিকে তিনি মাথাটা ঘুরিয়ে রয়েছেন ; অথচ ওঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ আর জামার বিশাল ঘের ঈষৎ বাঁ দিকে সরে আছে ; কিন্তু ওঁর দৃষ্টি ছবির সামনে দাঁড়ানো দর্শকটির দিকে সোজাসুজি নিবদ্ধ। এই গোটা ক্যানভাসটিকে একটি মধ্যরেখা দিয়ে সমান দুই পাল্লায় ভাগ করলে, সেটা এই শিশুটির দু চোখের মাঝখান দিয়ে যাবে। ছবিখানির এক-তৃতীয়াংশের সমান উচ্চতায় রয়েছে এই শিশুর মুখ। নিঃসন্দেহে এখানেই রয়েছে কম্পোজিশনের মূল থিম ; ছবির বিষয়ও রয়েছে এখানেই। যেন সেই কথাটাই প্রতিপন্ন করতে, আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে, স্রষ্টা [*auteur* ওতেঅর] একটি পরম্পরাগত চরিত্রের সাহায্য নেন : কেন্দ্রীয় চরিত্রের পাশেই তিনি আর-একটি চরিত্রকে রাখেন, যিনি নতজানু হয়ে তাঁকে দেখছেন। প্রার্থনারত দাতার মতন, কুমারী মেরীকে অভিবাদনরত দেবদূতের মতন, এক সহচরী রাজকন্যার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর মুখের পার্শ্বচিত্র নিখুঁত ফুটে উঠেছে। তাঁর মুখ আর রাজকন্যার মুখ একই উচ্চতায় আঁকা। তিনি রাজকন্যাকে ছাড়া আর

কাউকেই দেখছেন না। আর-একটু ডানদিকে আরেকজন সহচরী। রাজকন্যার দিকে ফিরে, ওঁর দিকে সামান্য ঝুঁকে রয়েছেন তিনি ; কিন্তু তাঁর দৃষ্টি স্পষ্টতই সামনের দিকে, যেদিকে শিল্পীও তাকিয়ে আছেন, রাজকন্যাও তাকিয়ে আছেন। শেষত রয়েছে, দুজন-দুজন করে নিয়ে আরও দুটো জুটি : একটা জুটি রয়েছে ঈষৎ দূরে ; আর-একটি জুটি দুই বামনকে নিয়ে ; তাঁরা ছবির একেবারে পুরোভূমিতে। প্রতি জুটিতেই একটি চরিত্র তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে, আর অপরজন তাকিয়ে আছেন ডান দিকে বা বাঁ দিকে। অবস্থানগত এবং আকারগত কারণে এই দুই জুটি গড়ে তোলে এক অভিন্ন যুগলমূর্তির আদল। পিছন দিকে, সভাসদরা (বাঁ দিকের মহিলাটি ডান দিকে তাকিয়ে আছেন) ; সামনের দিকে, দুই বামন (ডান প্রান্তের ছেলেটি তাকিয়ে রয়েছেন ছবির ভিতর দিকে)। ওই দুটি জুটি এই বিভঙ্গে বিন্যস্ত হয়ে রচনা করছে দুটি ভিন্ন-ভিন্ন জ্যামিতিক আকার— কীভাবে ছবিটা দেখা হচ্ছে আর প্রসঙ্গকেন্দ্র হিসেবে কাকে বেছে নেওয়া হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করছে এই আকারগত ভিন্নতা। প্রথম আকারটি হবে একটি বিশাল ×, যার বাঁ দিকের শীর্ষবিন্দুতে থাকবে শিল্পীর দু চোখ ; ডান দিকের শীর্ষে থাকবে সভাসদের চোখ ; নীচের বাঁ দিকের বিন্দুতে থাকবে ক্যানভাসের কোণা (আরও যথার্থ হয় যদি বলি, ইজ়েলের পায়া), যেটাকে উপস্থাপন করা হয়েছে পিছন দিক থেকে ; [ওই ×-এর] নীচের ডান দিকের বিন্দুতে থাকবে একজন বামন (সে জুতোশুদ্ধ পা রেখেছে কুকুরের পিঠের উপর) ; যেখানে এই দুটি রেখার ছেদবিন্দু, সেখানে, × -এর কেন্দ্রে, থাকবে রাজকন্যার চোখ। অন্য জ্যামিতিক আকারটি দেখতে হবে বিরাট এক বক্ররেখার মতো ; বাঁ দিকে শিল্পী আর ডান দিকে সভাসদ সে রেখার দু দিকের দুই প্রান্ত নিরূপণ ক'রে দেবে— আর এই দুই প্রান্তই ছবির উপরের দিকেও বটে, আবার ভিতরের দিকেও বটে। ওই বক্ররেখার মাঝখানের অবতল অংশটি আমাদের আরও কাছাকাছি ; সেখানে রাজকন্যার মুখ প্রায় মিলে যাবে ওঁরই দিকে চেয়ে-থাকা সহচরীর মুখের সঙ্গে। নমনীয় এই বক্ররেখা যে-অবতল রচনা করে, তা ছবিতে আয়নার অবস্থানকে, একই সঙ্গে, ধারণও করে আবার ফুটিয়েও তোলে।

তা হলে, দুটো কেন্দ্র আছে, যেখান থেকে এই ছবিটাকে সংগঠিত করা সম্ভবপর। আর কোন্‌টা সেই কেন্দ্র তা নির্ভর করছে, দর্শক ওঁর প্রজাপতির মতন চঞ্চল, বিচরণশীল দৃষ্টিকে কোথায় স্থিরত রাখছেন। রাজকন্যা দাঁড়িয়ে আছেন এক সেন্ট অ্যান্ড্রুর ক্রুশের মাঝখানে। ওই ক্রুশটি তাঁর চার পাশে ঘুরছে, আর তার সঙ্গে পাক খাচ্ছে সভাসদ, সহচরী, জন্তু ও ভাঁড়দের এক ঘূর্ণি। কিন্তু এই ঘূর্ণি এখন নিশ্চল। তাকে নিশ্চল করে দিয়েছে একটি দৃশ্য। এই দৃশ্যটি একেবারেই অদৃশ্য থাকত যদি ওই পাত্রপাত্রী (যাঁরা এখন হঠাৎ-গতিশূন্য) যা দেখছেন তারই অদৃষ্টপূর্ব প্রতিরূপ আয়নার ভিতরে— যেন এক বড়ো পানপাত্রের গর্ভের মধ্যে— দেখানোর সুযোগ ক'রে না দিতেন। বেধের দিক দিয়ে দেখলে বলব, রাজকন্যাকে আয়নার উপর সমারোপ করা হয়েছে ; উচ্চতার দিক দিয়ে দেখলে বলব, প্রতিবিম্বকে সমারোপ করা হয়েছে [রাজকন্যার] মুখের উপর। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত এই দুইটিকে একে অপরের খুব কাছাকাছি এনে দেয়। উপরন্তু, ওদের প্রত্যেকের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসে একটি অপ্রতিরোধ্য রেখা ; আয়না থেকে বেরিয়ে-আসা রেখাটি উপস্থাপনার সম্পূর্ণ বেধকে (তার চেয়েও বেশি : কারণ এই আয়না পিছনের দেওয়ালে এক গহ্বর তৈরি ক'রে ওর পিছনে আরেকটি দেশের আবির্ভাব ঘটায়) অতিক্রম করে। অন্য রেখাটি আরও ছোটো ; সেটি ওই শিশুর চোখ থেকে বেরিয়ে এসে শুধু পুরোভূমিটুকুই অতিক্রম করে। একই তলের শরিক এই রেখাদুটি এসে মিলে যায় এক সুতীক্ষ্ণ কোণে। আর তাদের এই মিলনবিন্দুটি ক্যানভাস থেকে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে এসে ছবির সামনে স্থিত হয়ে যায় প্রায় সেই জায়গাতেই যেখান থেকে আমরা ছবিটাকে দেখছি। এই বিন্দুটি সংশয়িত ; কারণ একে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তবে, এ বিন্দুটি অবারণীয়ও বটে, নিখুঁতভাবে নিরূপিতও বটে। কারণ, [এ ছবিতে] যে-দুটি আকার সবচেয়ে গরিমা পেয়েছে তারাই তো নিরূপণ করে দিচ্ছে ওই বিন্দুর স্থিতি। ওর স্থিতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ওর সমীপবর্তী সেই রেখায়িত বিন্দুমালা যারা এ ছবিতে জন্মে এর থেকে— একইভাবে— বাইরে বেরিয়ে আসছে।

ওই যে জায়গাটি, যা ছবির বাইরে ব'লে অনধিগম্য, অথচ যা কম্পোজ়িশনের প্রত্যেকটি রেখার দ্বারা

নির্দেশিত, সেখানে, তা হলে, কী আছে? কী সেই দৃশ্য, কাদেরই বা সেই মুখ, যা প্রথমে রাজকুমারীর, তার পর সভাসদদের ও শিল্পীর চোখের মণির গভীরে এবং সবশেষে আয়নার ওই দূরায়ত দীপ্তিতে প্রতিফলিত? কিন্তু এই প্রশ্নটি অচিরেই একজোড়া প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়; যে মুখ আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে, সে-মুখ একই সঙ্গে— তাকে নিরীক্ষণও করছে; ছবির সব ক'জন পাত্রপাত্রী যাঁদের দেখছেন, তাঁরা দুজন আবার সেই পাত্রপাত্রী, যাঁদের চোখে ওঁরাও হয়ে উঠছেন এক নিরীক্ষণীয় দৃশ্য। সমগ্রত এ ছবি দেখছে একটি দৃশ্যকে, আবার সেই দৃশ্যেরই কাছে ওই ছবিটাও হয়ে উঠছে এক দৃশ্য বস্তু। নিরীক্ষমাণ ও নিরীক্ষিত এই আয়নাটির মধ্যে প্রকাশ ঘটছে বিশুদ্ধ পারস্পরিকতার, যার দুটি মুহূর্ত ছবির দুই কোণে উন্মোচিত: বাঁ দিকে ওই পিছন-ফেরা ক্যানভাস, যার দ্বারা সেই বাইরের বিন্দুটি হয়ে ওঠে বিশুদ্ধ দৃশ্য; ডান দিকে ওই শুয়ে-থাকা কুকুরটি তো এ ছবির একমাত্র উপাদান যে তাকায়ও না, নড়েও না— [আকৃতির] তীক্ষ্ণ উচ্চাবচতা নিয়ে আর রেশমি রোমে খেলতে-থাকা ওই আলো নিয়ে, সে যে তৈরিই হয়েছে শুধু এক দৃশ্যবিষয় হিসেবে নিরীক্ষিত হবার জন্যেই।

প্রথমবার ছবিটির দিকে চোখ পড়তেই আমরা বুঝতে পারি, এই নিরীক্ষণের জন্য দৃশ্যটি কাদের নিয়ে রচিত। রাজা আর রানীকে নিয়ে। তাঁদের উপস্থিতি অনুমান করা যায়, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি থেকে, রাজকন্যা আর বামনদের বিস্ময় থেকে। ছবির পিছনের প্রান্তে আয়নায় প্রতিবিম্বিত দুটো ছোটো সিলুয়েটে চেনা যাচ্ছে ওঁদের। একাগ্রমনা যত মুখ আর সুসজ্জিত যত শরীর ওখানে রয়েছে, তার মধ্যে ওঁদের এই প্রতিকৃতিই সবচেয়ে পাণ্ডুর, সবচেয়ে অপ্রকৃত, সবচেয়ে বিলীয়মান: সামান্য আন্দোলন, একটুখানি আলো ওঁদের মুছে-দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যত পাত্রপাত্রী এ ছবিতে উপস্থাপিত তাঁদের মধ্যে ওঁরা দুজনেই সবচেয়ে উপেক্ষিত, কারণ কেউ-ই তো সবার পিছনে সরে-যাওয়া, আর-এক অভাবনীয় জায়গায় নিঃশব্দে জেগে-ওঠা ওই প্রতিচ্ছায়ার দিকে নজর দিচ্ছেন না। যতটুকু ওঁরা দৃশ্যগোচর, ততটুকুর মধ্যেও, ওঁরাই যে সবরকম বাস্তবতার ভঙ্গুরতম, সুদূরতম রূপ। অন্য পক্ষে, ওঁরা তো আবার রয়েছেন ছবির বাইরে; সুতরাং ওঁরা ছবি থেকে সরে থাকছেন এক আবশ্যিক অপ্রত্যক্ষতায়। সেই অপ্রত্যক্ষতায় থেকে ওঁরা নিজেদের ঘিরে এক বিন্যাসে বাঁধছেন এই গোটা উপস্থাপনটিকে। তাঁদেরই দিকে সকলের মুখ, সকলেই ঘুরে আছেন ওঁদের দিকে। তাঁদেরই সামনে রাজকন্যাকে উৎসবের সাজপোশাকে হাজির করা হচ্ছে। উলটো-করে-রাখা ওই ক্যানভাস থেকে শুরু ক'রে রাজকন্যা পর্যন্ত, আবার রাজকন্যা থেকে আরম্ভ ক'রে ডান প্রান্তের ওই ক্রীড়ারত বামন অবধি, ছড়িয়ে আছে একটি বাঁকা রেখা (অথবা সেই x-এর নীচের অংশ)। এই বাঁকা রেখাটি ছবির গোটা বিন্যাসকে সংবদ্ধ ক'রে নিয়ে আসছে ওঁদের [রাজারানীর] দৃষ্টির সামনে।— আর এভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, কোথায় কম্পোজিশন-এর সেই কেন্দ্র, যার অধিকারে রয়েছে রাজকন্যার চোখ আর আয়নার প্রতিবিম্ব।

প্রচলিত গল্প অনুযায়ী, ওই কেন্দ্রটি প্রতীকী অর্থে সার্বভৌম; কারণ এই কেন্দ্রে বিরাজ করছেন রাজা চতুর্থ ফিলিপ এবং ওঁর রানী। কিন্তু এই কেন্দ্রটি সার্বভৌমত্বে সমাসীন বিশেষত এ-কারণে যে এই ছবির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনটি ভূমিকা সম্পাদন করে ওই কেন্দ্র। কারণ ওর উপর মডেলের দৃষ্টি সমারোপিত হচ্ছে ছবি-আঁকার মুহূর্তে; ছবি-দেখার মুহূর্তে সমারোপিত হচ্ছে দর্শকের দৃষ্টি; আর, শিল্পীর দৃষ্টি সমারোপিত হচ্ছে ছবি-কম্পোজিশনের মুহূর্তে (উপস্থাপিত ছবি নয়; সেই ছবি, যা রয়েছে আমাদের সামনে এবং যার বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি)। এই তিনটি 'দৃষ্টি'-র ভূমিকা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ছবির এক বহির্বিন্দুতে। যা উপস্থাপিত, তার সঙ্গে সম্পর্কের দিক দিয়ে ওই বিন্দুটিকে আদর্শ বিন্দু বলা যায়; আবার এ তো একটা সম্পূর্ণ বাস্তব বিন্দুও বটে, কারণ এই বিন্দু থেকে শুরু করেই উপস্থাপনা সম্ভব হয়। সেই বাস্তবতার মধ্যে সেটি অদৃশ্য না থেকে পারে না। তবু ওই বাস্তবতার অভিক্ষেপ ঘটছে ছবির ভিতরে। এই বাস্তবতা তিনটি প্রতিকৃতিতে অভিক্ষিপ্ত এবং পৃথককৃত। ওই তিন প্রতিকৃতির সঙ্গে সেই আদর্শ ও বাস্তব বিন্দুর ভূমিকাত্রয়ের প্রতিষঙ্গ আছে। সেই তিন প্রতিকৃতি হল: বাঁ দিকে রঙের পাত্র হাতে শিল্পী (স্রষ্টার আত্মপ্রতিকৃতি)। ডান দিকে, সেই আগন্তুক, সিঁড়ির উপর ডান পা রেখে যিনি ঘরে ঢুকতে উদ্যত; তিনি

পুরো দৃশ্যটির পিছন দিক দেখছেন কিন্তু রাজদম্পতিকে দেখছেন সামনে থেকে ; আর ওঁরাই তো দৃশ্য। এবং, শেষত, কেন্দ্রে রয়েছে রাজারানীর প্রতিবিম্ব। সুসজ্জিত, স্থির, ধৈর্যশীল মডেলের ভঙ্গিতে রয়েছেন তাঁরা।

পুরোভূমিতে সকলেই যা দেখছেন, প্রতিবিম্ব তা-ই খুব সরলভাবে আধো-অন্ধকারে তুলে ধরে। যা কিছু প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অনুপস্থিত, তাকে এক কুহকের মায়ামন্ত্রে, পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেয় এই প্রতিবিম্ব : শিল্পীর ক্ষেত্রে তা হচ্ছে ওই মডেল, যাকে তাঁর উপস্থাপিত প্রতিকৃতি পুনরঙ্কিত করছে। রাজার ক্ষেত্রে তা হল ওঁর আলেখ্য, যা ক্যানভাসের সেই পিঠে আঁকা হচ্ছে, যে-পিঠ তিনি ওঁর অবস্থানবিন্দু থেকে দেখতে পাচ্ছেন না। আর দর্শকের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে দৃশ্যের প্রকৃত কেন্দ্র, যেখানে তিনি [দর্শক] নিজেকে কায়েম করেছেন জবরদস্তি। কিন্তু হয়তো আয়নার এই ঔদার্যও একটা ছল ; হয়তো সে যতটা দেখাচ্ছে, ততটাই, অথবা তার চেয়েও বেশি লুকিয়ে রাখছে। যে-স্থানে রাজারানী বিরাজমান, সে তো আবার শিল্পীর আর দর্শকের অবস্থানক্ষেত্রও বটে : আয়নার ভিতরে ওই অনামিক পথিকের আর ভেলাসকেথের মুখও প্রতিফলিত হতে পারত— হওয়া উচিত ছিল। কারণ ওই প্রতিবিম্বের কাজই হল যা-কিছু ওই ছবির একান্ত বহির্বর্তী, তাকে ছবির ভিতরে টেনে নিয়ে আসা : ছবির ভিতরে টেনে নিয়ে আসা সেই দৃষ্টিকে যা এই ছবিকে সংগঠিত করল, আবার ছবির ভিতরে নিয়ে আসা সেই দৃষ্টিকেও যে-দৃষ্টির সামনে এ ছবিকে মেলে ধরা হল। কিন্তু যেহেতু শিল্পী আর আগন্তুক ছবির ডান দিক আর বাঁ দিক জুড়ে রয়েছেন, তাই তাঁদের আয়নায় স্থান দেওয়া তো সম্ভব নয় : ঠিক যেমন রাজা ছবির মধ্যেকার কেউ নন বলেই তিনি চলে আসেন আয়নার ভিতরে।

শিল্পীর দৃষ্টি, তাঁর স্তব্ধ হাত আর রঙের পাত্র থেকে আরম্ভ ক'রে সমাপ্ত ছবিগুলো পর্যন্ত ওই স্টুডিয়োর পরিসীমা ঘিরে যে বিশাল শঙ্খরেখাটি পরিক্রমণ করে, তারই মধ্যে এই উপস্থাপনা জন্ম নেয়, সম্পূর্ণতা পায় আর সম্পূর্ণতা পাবার জন্যেই আবার আলোয় মিলিয়ে যায় ; এই যে চক্র এটা সম্পূর্ণ। অন্য পক্ষে, যে রেখাগুলি ছবিখানির অন্তস্তল পরিক্রমণ ক'রে আসে, তারা অসম্পূর্ণ ; তাদের প্রত্যেকটির পথরেখার একাংশ নেই। এই শূন্যতা তৈরি হয়েছে রাজার অনুপস্থিতির জন্য— এই অনুপস্থিতিও শিল্পীর এক করণকৌশল। কিন্তু এই করণকৌশল আর-এক শূন্যতাকে লুকিয়েও রাখে আবার দেখিয়েও দেয়, যে-শূন্যতা প্রত্যক্ষ : অঙ্কনরত শিল্পী আর নিরীক্ষণরত দর্শকের অনুপস্থিতিজনিত শূন্যতা। এটা হতে পারে যে, যাবতীয় উপস্থাপনায় যেমন এই ছবিতেও তেমন— আর এ-ছবিখানি যেন সমস্ত উপস্থাপনারই প্রত্যক্ষ সারাৎসার— যা দেখা যাচ্ছে তার গূঢ় অদৃশ্যতা, যে-ব্যক্তি দেখছেন তাঁর অদৃশ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোত— যতই আয়না, প্রতিবিম্ব, অনুকৃতি, প্রতিকৃতি থাকুক-না কেন, তৎসত্ত্বেও, কথাটা সত্যি। দৃশ্যটি ঘিরে উপস্থাপনার বহুতর চিহ্ন [*signe* সীন] বিন্যস্ত, তার বহুতর রূপও অবিচ্ছেদ পারম্পর্যে বিন্যস্ত ; কিন্তু মডেলের সঙ্গে, রাজার সঙ্গে, স্রষ্টার সঙ্গে, আর যাঁকে এ ছবিখানি নিবেদন করা হচ্ছে তাঁর সঙ্গে, এই উপস্থাপনার দ্বৈত-সম্পর্ক অবশ্যতই ছেদবিঘ্নিত। এ [এই সম্পর্ক] তো কখনোই বেবাক হাজির হতে পারে না— যে উপস্থাপনা নিজেকে এক দৃশ্যরূপে পেশ করছে, এমন-কি সেখানেও না। এক গভীর তল পরিক্রমণ করে এই ছবিখানিকে। ছবিকে তা খুঁড়ে খুঁড়ে এক কল্পিত অন্তস্তলে চলে যায়, আবার নিজের সামনে অভিক্ষেপণও করে। সেই গভীর তলে বিকীর্ণ আলোয় উপস্থাপনশীল মহাশিল্পীকে এবং উপস্থাপিত রাজাকে শুদ্ধ প্রতিকৃতি রূপে— যুগপৎ— তুলে ধরা তো কখনোই সম্ভব নয়।

হয়তো ভেলাসকেথের এ-ছবিখানিতে ক্ল্যাসিকাল উপস্থাপনার উপস্থাপনা বর্তমান। সেই ক্ল্যাসিকাল উপস্থাপনা ছবির যে-দেশ উন্মোচন করে দেয়, হয়তো তার সংজ্ঞাও পেয়ে যাচ্ছি এ-ছবিতে। বস্তুত, এখানে উপস্থাপনা নিজেকে উপস্থাপন করছে তার যাবতীয় উপাদান নিয়ে : প্রতিকৃতিগুলিকে পাচ্ছি ; পাচ্ছি সেইসব দৃষ্টিকে যার সামনে সে নিজেকে মেলে ধরছে ; পাচ্ছি সেই মুখগুলিকে যাদের সে দৃশ্যগোচর করছে ; আর সেইসব মুদ্রাকেও পাচ্ছি যা এই উপস্থাপনার জন্ম দিচ্ছে। এ উপস্থাপনায় ছড়িয়ে দিয়ে আবার গুটিয়ে এনে আমাদের সামনে মেলে ধরার এক প্রক্রিয়া আছে বটে। তবে, তার মধ্যেই চতুর্দিক থেকে অমোঘভাবে ব্যঞ্জিত হচ্ছে এক মৌলিক শূন্যতা : যা এ-উপস্থাপনার বনিয়াদ, তারই ঘটেছে আবশ্যিক অন্তর্ধান— সেই ব্যক্তি যার

সাদৃশ্য রচনা করল এই উপস্থাপনা, এবং সেই ব্যক্তি, যার চোখে এ-উপস্থাপনা শুধু এক সাদৃশ্যবিশেষ, তিনিই যে অন্তর্হিত। এই বিষয়টাই বর্জিত। আর যে-সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছিল, তা থেকে শেষ অবধি মুক্ত হয়ে উপস্থাপনা এখন নিজেকে উপস্থাপনার শুদ্ধ রূপে পেশ করতে পারছে।[১]

টীকা

১. Michel Foucault, 'Les suivantes', *Les mots et les choses,* Gallimard, Paris, 1966, pp. 19-31. গালিমার-এর সৌজন্যে।
এই তরজমার সর্বত্র ফরাসি *image* ইমাজ অর্থে 'প্রতিকৃতি' শব্দটি প্রযুক্ত।
বহুজনের সহযোগিতায় সম্ভব হল এই তরজমার কাজ। কৃতজ্ঞ মনে বিশেষভাবে স্মরণ করছি এঁদের নাম : আশিস রায়চৌধুরী ; প্রফুল্লচন্দ্র পল্ল্যে, সূত্রধর ; সুব্রত ঘোষ, স্থপতি। ইয়োরোপীয় ছবির ইতিহাস ও আঙ্গিক সংক্রান্ত পরিভাষা নির্ণয়ে সহায়তা করেছেন গৌতম চৌধুরী আর সৌমিক নন্দী মজুমদার। সম্পাদক-কর্তৃক পরিমার্জিত না হলে অনূদিত প্রবন্ধটির বর্তমান রূপ সম্ভব হত না। ফুকোর চিন্তার জটিলতা যদি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তার কৃতিত্ব সম্পাদকেরই।

অনুবাদ : শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত

টমসন ও রবীন্দ্রনাথ

বিকাশ চক্রবর্তী

ঈনিডের নায়ক ঈনিয়াসকে দেখে কার্থেজের রূপসী রানী ডিডো প্রশ্ন করেছিলেন, 'Who is this stranger that has come to our dwelling ?' আজ থেকে একশো চল্লিশ বছর আগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলেন তাঁর 'The Anglo-Saxon and the Hindu' নামক নিবন্ধ : '...yet well may she ask— well may this queenly Hindustan— ask in the language of the love-sick Phoenician—"Who is this stranger that has come to our dwelling ?" '[১] রচনাটির প্রকাশকাল ১৮৫৪। প্রায় ছাপ্পান্ন বছর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'ভারততীর্থ' কবিতায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এই বিদেশিদের ; ঘোষণা করলেন তাঁর বিশ্বাস 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে/ যাবে না ফিরে,/ এই ভারতের মহামানবের/ সাগরতীরে'।[২] ইতিহাসের সাক্ষ্য কিন্তু অন্যরকম। অগ্রজের অটল বিশ্বাস টেঁকে নি। উপনিবেশের পটভূমিতে টেঁকা সম্ভবও ছিল না। ব্রিটিশরাজের ইতিহাসে ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক কোনোদিনই নির্দ্বন্দ্ব হয় নি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তো সম্পর্কটি অনেক বেশি জটিল ও বহুস্তর। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের কোনো পর্যায়ে বলেছেন, 'আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূলশক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না।'[৩] আর-এক পর্যায়ে বলেছেন, 'জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আজ আমার বিদায়ের দিনে সেই বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল'।[৪] বর্ণালীর এই দুই প্রান্তের মাঝে রয়েছে আরও অনেক বর্ণচ্ছটা। তাঁর বহুবিদিত 'ছোটো' ইংরেজ ও 'বড়ো' ইংরেজের দ্বান্দ্বিক বৈপরীত্য সত্ত্বেও, কোনো একটি নিশ্চিত সূত্র খুঁজে পাওয়া শক্ত। প্রতিক্রিয়ার উত্থান-পতন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কেও, কখনো কেঁপেছেন 'স্তুতিনিন্দার জ্বরে', কখনো বন্ধুজনের প্ররোচনায়, কখনো রাজনৈতিক সংকটের প্রতিঘাতে। এডওয়ার্ড জন টমসন-এর (১৮৮৬-১৯৪৬) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এই বিচিত্র টানা-পোড়েনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সম্পর্কের এই টানা-পোড়েনের একটি স্মরণীয় ইতিবৃত্ত লিখেছেন এডওয়ার্ড টমসনের পুত্র, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ই. পি. টমসন* (এর পর থেকে প্রথমদুটি আদ্যক্ষর ব্যবহার করব ই. পি. টমসনের ক্ষেত্রে)। একশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠার সুদৃশ্য বইটিতে সংযোজিত হয়েছে 'Tagore Learns of Nobel Prize' শীর্ষক এডওয়ার্ড টমসন-কৃত ১৯১৩-র ১৪-১৫ নভেম্বর তারিখে শান্তিনিকেতনে কবিসান্নিধ্যের একটি বিবরণ। (উক্ত বিবরণের একটি টাইপ-করা প্রতিলিপি ই. পি. ১৯৭৬ সালে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনকে উপহার দিয়েছিলেন।) বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হওয়ার আগেই অবশ্য লেখাটি অন্তত দুবার মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম বার, সংক্ষিপ্তাকারে, *London Review of Books* (২২ মে ১৯৮৬) পত্রিকায় ; দ্বিতীয় বার, *Purabi : A Miscellany in Memory of Rabindranath Tagore : 1941-1991*[৫] নামক বইতে। আরও সংযোজিত হয়েছে এডওয়ার্ড টমসন-পরিকল্পিত *The Oxford Book of Bengali Verse* নামক অপ্রকাশিত সংকলন সম্পর্কিত তথ্যাবলি এবং উমা দাশগুপ্ত-সম্পাদিত টমসনের মূল্যবান *'Notebook of Conversations'*। বইটির মূল আখ্যানভাগে

---

* E.P. Thompson, *Alien Homage : Edward Thompson and Rabindranath Tagore*, Oxford University Press, Delhi, 1993.

ই. পি. উদ্ধৃত করেছেন বহু অপ্রকাশিত চিঠির অংশ, উদ্ধার করেছেন অনেক অপ্রকাশিত তথ্য। বস্তুত, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে *Alien Homage* রবীন্দ্রচর্চায় আগ্রহী যে-কোনো পাঠকের অবশ্যপাঠ্য এবং গবেষকদের কাছে অপরিহার্য। কিন্তু অবশ্যপাঠ্য ও অপরিহার্য বলেই অবাক হতে হয় যখন দেখি এই যত্ন-প্রযোজিত বইতেও রয়ে গেছে তথ্যের অসংগতি, অপূর্ণতা, এমন-কি ভ্রান্তি এবং কিছু অসতর্ক মন্তব্য।

তথ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে ই. পি. অবশ্য খুঁজেছেন টমসন-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র যার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে 'এলিয়েন হোমেজ'-এর নবম পৃষ্ঠায়। রোটেনস্টাইনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে ই. পি. মন্তব্য করেছেন : 'Tagore wrote in the confidence that e 'lite was confiding to e 'lite...' (পৃ. ৯)। পক্ষান্তরে টমসন ছিলেন অন্তেবাসী (এই শব্দটির জন্য আমি অশোক সেন মহাশয়ের কাছে ঋণী)[৬]—'He was a marginal man' (পৃ. ১০)। রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠির কোনো তারিখ দেন নি ই. পি.—পাদটীকাতেও নয়। চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ২০ এপ্রিল ১৯২৭ সালে, রোটেনস্টাইনের ১৫ মার্চ ১৯২৭-এর চিঠির উত্তরে।[৭] প্রসঙ্গটিও মনে রাখা দরকার। টমসনের দ্বিতীয় ও বৃহত্তর রবীন্দ্রচর্চা, *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist*, (Oxford University Press, London, 1926) প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ যে তীব্র এবং বহুলাংশে অন্যায্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, সে কথা আজ সকলেই জানেন। সেই তপ্ত মানসিক আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ যে কটি চিঠি লিখেছিলেন, উদ্ধৃত পত্রাংশটি তার অন্যতম। এই প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসব। আপাতত এইটুকু বলে নিতে চাই যে উক্ত চিঠির অংশবিশেষের উপর নির্ভর করে 'আমরা ও তাহারা'র কোনো নিশ্চিত ভেদরেখা টানা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বোধহয় যুক্তিসংগত হবে না। তা ছাড়া, ১৯২৭-এ টমসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক, অন্তত দু ডজন বইয়ের রচয়িতা, ইংলন্ডের তদানীন্তন রাজকবির (রবার্ট ব্রিজেস) ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চার বছর পর এঁরই অক্সফোর্ড আবাসে রাজনৈতিক মিটিং করেছেন মহাত্মা গান্ধী, যেখানে উপস্থিত ছিলেন গিলবার্ট মারে ও রেজিনাল্ড কাপ্‌ল্যান্ড সহ আরও অনেকে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে তিনবার ভারতে এসেছেন টমসন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার কাজে ; অন্তত একবার, কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আপস-মীমাংসার জন্য।[৮] এঁকে কি আমরা অন্তেবাসী বলব ?

অন্তেবাসী থিমটি ই. পি. প্রথম থেকেই অনুধাবন করেছেন। টমসন উচ্চকুলোদ্ভব ছিলেন না। জন্মেছিলেন দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনাপল্লীতে এক মেথডিস্ট মিশনারির ঘরে। ছ বছর বয়েসে বিলেত চলে যান। সেখানেই জন ওয়েসলি-প্রতিষ্ঠিত কিংসউড স্কুলে (Kingswood School) তাঁর প্রথম শিক্ষা। পিতার মৃত্যুর (১৮৯৪) পর আর্থিক অনটনের চাপে টমসনকে স্কুল ছেড়ে ব্যাঙ্কে কেরানিগিরি করতে হয়েছিল। অবশেষে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাগতের (external) ডিগ্রি অর্জন ক'রে ও রিচমন্ড কলেজে ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে তিনি বাঁকুড়ায় আসেন ১৯১০ সালের নভেম্বর মাসে মেথডিস্ট মিশনারি রূপে। সেই থেকে ১৯২২-এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত (অন্তর্বর্তী চারটি বছর— ১৯১৬-১৯২০— টমসন অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন) টমসন অধ্যাপক রূপে তদানীন্তন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশনারি স্কুল ও কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাঁকুড়ায় থাকতে ১৯১৩ সালে টমসন প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। সেই পরিচয় নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও কবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯২৩ সালে টমসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। ১৯৩৪ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর বাকি জীবনটা কাটিয়েছেন অক্সফোর্ডের অরিএল (Oriel) কলেজে ভারতীয় ইতিহাসের ফেলো রূপে। অক্সফোর্ডে যাওয়ার পর তিনবার তিনি ভারতে এসেছেন— যথাক্রমে ১৯৩১-৩২, ১৯৩৬ ও ১৯৩৯ সালে। লিখেছেন প্রচুর। শুধু ভারত-সম্পর্কিত বইয়ের সংখ্যাই তাঁর প্রায় তিরিশ। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে রচিত টমসনের সাতটি উপন্যাসের পটভূমি হল ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, মহাত্মা গান্ধী, তেজবাহাদুর সপ্রু, মহম্মদ ইকবাল, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও জওহরলাল নেহরুর বন্ধু এডওয়ার্ড টমসনের মৃত্যু হয় ১৯৪৬ সালে।

'এলিয়েন হোমেজ' শুরু হয়েছে টমসনের শান্তিনিকেতন যাত্রার বর্ণনা দিয়ে। টমসন প্রথম শান্তিনিকেতন আসেন ১৯১৩ সালে। সমস্ত পথটাই সাইকেলে এসেছিলেন কিনা ই. পি.-র বর্ণনা থেকে সেটা স্পষ্ট নয় (পৃ. ১)। ই. পি. লিখেছেন, বাঁকুড়া থেকে শান্তিনিকেতনের দূরত্ব চল্লিশ মাইলের বেশি নয়। একটু ভুল করেছেন। সংক্ষিপ্ততম পথেও এই দূরত্ব ষাট মাইলের কাছাকাছি)। তাঁর মার কাছে লেখা টমসনের যে-চিঠি থেকে ই. পি. স্বল্প উদ্ধৃতি দিয়েছেন (পৃ. ১) তাতে টমসন লিখেছেন যে অনেক নদীনালা ডিঙিয়ে, দামোদরের বিস্তীর্ণ বালুচর পেরিয়ে, তিরিশ মাইলেরও বেশি সাইকেল চালিয়ে ছিলেন। মনে হয়, এই বর্ণনাটাই ঠিক। খুব সম্ভব টমসন বাঁকুড়া থেকে মেজিয়া ঘাট পেরিয়ে রানীগঞ্জ পর্যন্ত সাইকেলে এসেছিলেন, রানীগঞ্জ থেকে বোলপুর রেলগাড়িতে। বাঁকুড়া থেকে রানীগঞ্জের দূরত্ব প্রায় বত্রিশ মাইল। এটাই ছিল তখনকার দিনের প্রচলিত পথ।

দ্বিতীয় যাত্রার বর্ণনাটি আরও বিশদ ও রোমাঞ্চকর। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গম বিপদসংকুল দীর্ঘ পথ সাইকেলে পেরিয়ে রাতের অন্ধকারে টমসন যখন বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছোলেন, তখন বোলপুর যাবার শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে। লক্ষণীয় টমসনের যে-চিঠির অংশবিশেষ ই. পি. এক্ষেত্রেও যাত্রা-বিবরণের জন্য ব্যবহার করেছেন সেই উদ্ধৃতাংশে কিন্তু সাইকেলে বাঁকুড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত যাবার কথা নেই (পৃ. ১-২)। বর্ণনার শেষে, এই ঘুরপথে বোলপুর যাবার দুটি কারণ দর্শিয়েছেন ই. পি.। প্রথমত, টমসনের নিসর্গ-প্রীতি ও গ্রামের সাধারণ মানুষজন সম্পর্কে আগ্রহ। দ্বিতীয়ত, '.....to save money and time. He never had much of either ; his duties at Bankura were onerous and ill-paid' (পৃ. ২)। এইখানে একটু খটকা লাগে। অর্থ ও সময়ের অনটনের জন্য টমসন বাঁকুড়া থেকে বর্ধমান—এই দীর্ঘ পথ সাইকেলে পাড়ি দিলেন ১৯২১ সালে ? ১৯২১-এ বাঁকুড়া থেকে বোলপুর যাওয়ার তিনটি ব্যবহৃত পথ ছিল। (কলকাতা হয়ে বোলপুর যাওয়ার কথা এক্ষেত্রে বাদ দিচ্ছি)। প্রথমটি, মেজিয়া ঘাট হয়ে রানীগঞ্জ ও রানীগঞ্জ থেকে রেলগাড়িতে খানা জংশন ঘুরে লুপ লাইনের গাড়িতে বোলপুর। এই পথের উল্লেখ আগেই করেছি। দ্বিতীয়টি, প্রাচীন হাঁটা পথ—কাঁকসা থেকে ইলামবাজার হয়ে বোলপুর। এই পথের দূরত্ব ষাট মাইলের কাছাকাছি। তৃতীয়টি, রেলপথ। ছোটো লাইনের গাড়িতে বাঁকুড়া থেকে সোহরাবাজার পর্যন্ত। সেখান থেকে দামোদর পেরিয়ে হাঁটাপথে বর্ধমান। দূরত্ব মাত্র আট মাইল। এই রেলপথ—বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলওয়ে— বাঁকুড়া থেকে রায়না পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি চালু হয়েছিল ১৯১৬ সালে।

ঘটনাটি সামান্য। কিন্তু এ রকম সামান্য ঘটনার সাহায্যেই ই. পি. অন্তেবাসীর থিমের সূচনা করেছেন। এই পরিচ্ছেদেই (Chapter I : Bankura College) রয়েছে তদানীন্তন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের বর্ণনা। বর্ণনাগুলি (ই. পি. এইসব বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছেন টমসনের বিভিন্ন লেখা ও চিঠিপত্র থেকে) একাধারে করুণ ও হাসি-ঠাট্টায় ভরা। এখানে পাওয়া যাবে স্কুল থেকে কলেজে প্রমোশন-প্রার্থী মধ্যবিত্ত বাঙালি ছাত্র ও অভিভাবকদের সাহেব মাস্টারমশাইদের কাছে কাতর অনুনয়-বিনয়, সংস্কৃত-পণ্ডিতের বেতচালনা ও ক্লাসে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ার বহুশ্রুত কাহিনী এবং বাঙালি ছাত্র ও অভিভাবকদের হাস্যকর ইংরেজির নমুনা, স্কুলে বাঙালি শিক্ষকের বাইবেল পড়াবার অনুকরণ। এইসব পড়তে পড়তে মনে হয়, টমসন যেন মিমিক্রি করছেন ; আর মিমিক্রির সঙ্গে বিদ্রূপের সম্পর্ক খুব দূরের নয়। ই. পি. লিখেছেন, 'Bankura's middle-class was known for its conservative sanskritized traditions. The College's old Sanskrit Pundit, "a rum old bird, very grave and irascible, always chewing betel", had a tradition of his own' (পৃ. ৫)। তার পরেই টমসনের চিঠি থেকে উদ্ধার করেছেন সেই সংস্কৃত পণ্ডিতের ক্লাসে বেত চালানোর এক হাস্যকর বর্ণনা। টমসনের অন্য একটি রচনা[৯] থেকে আমরা জানতে পারি আরেকজন বেতচালনায় বিশ্বাসী অভিভাবকের কথা। অদ্ভুত এক ইংরেজিতে ইনি টমসন সাহেবকে অনুরোধ করছেন তাঁর পুত্রকে বেত দিয়ে পিটোতে কারণ, বেত্রাঘাত ছাড়া ছেলে মানুষ হয় না। পুরোনো সংস্কৃত-পণ্ডিতমশাইদের বেত্রপ্রীতি ও কোনো কোনো অভিভাবকের বেত-চালনায় বিশ্বাসের কথা আমরা জানি। কিন্তু সে প্রীতি ও বিশ্বাস সনাতন

ভারতীয় ঐতিহ্যের আবিষ্কার বা একচেটিয়া অধিকার নয়। রাজনারায়ণ বসু তো মহামতি হেয়ার সাহেব সম্বন্ধে লিখেছেন : 'আমরা ভাগ্যক্রমে কখনও তাঁহার [হেয়ার সাহেবের] নিকট হইতে বেত খাই নাই। কিন্তু আমি তাঁহার বেত্রচালনৈষণা নিবারণ করিবার জন্য বেত খাইয়া একটি ছাত্রের আত্মহত্যার গল্প আমার তখনকার ইংরাজীতে লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার এই গল্প হইতে তিনি উপদেশ লাভ করিবেন। কিন্তু করিলেন না'।[১০]

মোটের উপর, বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের সঙ্গে টমসনের কোনো আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে নি। ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে ছিলেন খ্যাতিমান। বাংলা শিখতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন ; গ্রাম-বাংলার জনজীবন, প্রকৃতি, বাংলা সাহিত্য ও বিশেষ করে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক। তাঁর এক ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথায় '[টমসন সাহেব] ইংরাজী পড়াতেন অসাধারণ। কবিতা যখন পড়াতেন তখন আমরা মোহমুগ্ধ হয়ে যেতাম। বাংলা একটানা অনেক্ষণ বলতে পারতেন না, তবে বাংলা ভালো পড়তে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী" কবিতা তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল।'[১১] তবু কর্মক্ষেত্রে টমসন ছিলেন নিঃসঙ্গ। যুদ্ধ থেকে ফেরার পর (১৯২০) কলেজের ব্রিটিশ সহকর্মীদের সঙ্গেও তাঁর মেলামেশা কমে গিয়েছিল। ই. পি.-র ভাষায়, মেথডিস্ট মিশনারির অভিজ্ঞান, কলেজের স্বল্পবেতন ও রাজধানী থেকে দূরে বাংলার এক অনগ্রসর মফস্বল শহরে দিনগত পাপক্ষয়— এইসব মিলিয়ে টমসন ছিলেন ব্রাত্য : 'something nondescript, perhaps low-caste' (পৃ. ৯)।

ইংরেজ রাজপুরুষ অথবা সি. এফ. অ্যানড্রুজ-এর মতো কেমব্রিজ-ফেরত অ্যাংগ্লিকান সাহেবের তুলনায় বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের এডওয়ার্ড টমসন হয়তো কিছুটা ব্রাত্য ছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতের নেটিভদের মোকাবিলায় তাঁর স্বাজাত্যভিমান বেশ স্পষ্ট। বস্তুত, অন্তেবাসীর সংজ্ঞাটা ঠিক দেশ ও কাল -নিরপেক্ষ নয়। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার সংবাদ যেদিন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছোয়, সেই সন্ধ্যায় টমসন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার একটি বিবরণ টমসন লিখে রেখেছিলেন তাঁর বিলেতি বন্ধুদের জন্য (দ্রষ্টব্য Appendix A, 'Tagore Learns of the Nobel Prize', পৃ. ১০৯-১২২)। 'এলিয়েন হোমেজ'-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে এই বিবরণের একটি চুম্বক দিয়ে। ১৯১৩-এর ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় খবর পাওয়া গেল, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। টমসন লিখেছেন : 'The boys went mad. They didn't know what the Nobel prize was, but they understood that the gurudeb they adored had done something wonderful, as indeed he was always doing.... Then a frenzy of worship seized them and they, one after another, threw themselves down and touched his feet.... I would have done it myself almost, <u>but I am an Englishman and have a stern contempt for the fools who pretend they are easterners.</u>' (নিম্নরেখা আমার। পৃ. ১৪)। উদ্ধৃতির শেষাংশের লক্ষ্য নিঃসন্দেহে অ্যানড্রুজ। অন্যত্রও পা ছুঁয়ে প্রণাম করার ভারতীয় রীতি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন টমসন (পৃ. ৩৩-৩৪)। অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে পুনর্মুদ্রিত টমসনের *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* নামক বইয়ের দীর্ঘ ও সুচিন্তিত ভূমিকায় হরীশ ত্রিবেদী একটি অনুচ্ছেদের নাম দিয়েছেন : 'Racism and Nationalism : "...that he is an Englishman and I a Bengali" '[১২]। জোড়া উদ্ধৃতিচিহ্নযুক্ত অংশটি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৮ এপ্রিল ১৯২৭ তারিখের চিঠির একটি লাইনের হরীশ ত্রিবেদী -কৃত ইংরেজি অনুবাদ। অনায়াসেই হরীশ এই শিরোনামের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারতেন : "But I am an Englishman" ; বৃত্তটি তা হলে সম্পূর্ণ হত।

১৯১৩-তেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টমসনের ঘনিষ্ঠতার শুরু। এই যাত্রাতেই রবীন্দ্রনাথ টমসনকে একগুচ্ছ ইংরেজি অনুবাদ দিয়েছিলেন পরিমার্জনের জন্য। (ই. পি. বলেছেন অনুবাদগুলি ছিল *The Gardener*-এর

পাণ্ডুলিপি [পাদটীকা ৭, পৃ. ২৬]। তিনি খেয়াল করেন নি যে এই ঘটনার আগেই, ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে, *The Gardener* ইংলন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন করেছিলেন ইয়েটস।) মাত্র একদিনের মধ্যেই টমসন রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রায় দেড়শো অনুবাদে তিনশোটি সংশোধন করেছিলেন (পৃ. ১১৫)। সংখ্যার আধিক্য দেখে একটু অবাক লাগে, বিশেষত যদি মনে রাখি যে ১৯১৩ সালের নভেম্বরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার বই ও একটি প্রবন্ধ-সংকলনের ইংরেজি অনুবাদ বিলেতে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩] সব অনুবাদই কবি-কৃত এবং ইয়েটস, স্টার্জ মুর ও আর্নেস্ট রিজ-এর দ্বারা সম্পাদিত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য টমসনের সব সংশোধন গ্রহণ করেন নি। কিন্তু টমসন সে যাত্রায় এই ধারণা নিয়ে বাঁকুড়ায় ফিরেছিলেন যে অনুবাদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সহযোগী হিসেবে পেতে চান।

টমসন যে কোনো অলীক ধারণা নিয়ে ফিরেছিলেন তা নয়, যদিও কার্যক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটে ওঠে নি। ঘটে যে ওঠে নি, তার একটি কারণ নিঃসন্দেহে অ্যান্ড্রুজের মাত্রাধিক রবীন্দ্রপ্রীতি। কিন্তু আর-একটি গুরুতর কারণ : অনুবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ইংরেজি ভাষায় তাঁর অধিকার সম্পর্কে অহেতুক সংকোচ এবং আস্থার অভাব। বস্তুত, তাঁর অনুবাদকর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কখনো মনস্থির করতে পারেন নি। অর্ধমনস্ক অনুবাদ, কবিতা নির্বাচনের বিশৃঙ্খলা ও প্রস্তুতির শৈথিল্য বোধহয় এই অস্থিরতার প্রত্যক্ষ ফল ; এবং এই দ্বিধা ও অস্থিরতার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে ১৯১৪ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনুবাদগুলির সর্বত্র। অত্যন্ত সংক্ষেপে এই পরিস্থিতির একটি নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন ই. পি. : '...thereby initiating a pattern which was to continue for years, of granting permissions or urgently soliciting translations, which he, or C. F. Andrews, or Macmillans were later to repudiate.' (পৃ. ১৫)। ছোটোগল্প অনুবাদ প্রসঙ্গে এই ঘটনাই ঘটেছিল টমসনের ক্ষেত্রে এবং টমসন যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

ইংরেজি গীতাঞ্জলির ৬৭-সংখ্যক কবিতার পাঠান্তরকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও রবার্ট ব্রিজেসের মধ্যে মতান্তরের ইতিবৃত্তটিকে কিন্তু একই কাঠামোয় ফেলা যায় না। হিউ টিনকারের অভিযোগ খণ্ডন করে একটি নাতিদীর্ঘ পাদটীকায় ই. পি. লিখেছেন যে গীতাঞ্জলির উক্ত কবিতার ব্রিজেস-কৃত পাঠে রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। টমসনকে লিখিত ব্রিজেসের একটি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশও উদ্ধার করেছেন ই. পি.। কথাটি আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ নয়। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি থেকে যে-চিত্রটি পাওয়া যায়, সংক্ষেপে সেটি এ-রকম : *The Spirit of Man; An Anthology in English and French from the Philosophers and Poets Made by the Poet Laureate in 1915 and dedicated by gracious permission to His Majesty the King* (London, 1916), সংকলনটির জন্য ব্রিজেস ইংরেজি গীতাঞ্জলি থেকে তিনটি এবং কবীর থেকে নয়টি কবিতা বেছেছিলেন। ইংরেজি গীতাঞ্জলির ৬৭-সংখ্যক কবিতাটি ব্রিজেস পরিমার্জন করে ছাপতে চান। এইখানেই বিরোধের শুরু। ব্রিজেসের প্রস্তাবের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ প্রথমত কপিরাইটের প্রশ্ন তোলেন ; দ্বিতীয়ত জানান, 'with things one has grown to love one does not tolerate any change even for the better'[১৪]। একই কথা আরও স্পষ্টত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন রোটেনস্টাইনকে : '...since I have got my fame as an English writer I feel extreme reluctance in accepting alterations in my poems by any of your writers'[১৫]। ইতিমধ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন অ্যান্ড্রুজ, এবং ব্রিজেসের অনুরোধে, রোটেনস্টাইন ও টমসন। শেষোক্ত দুজনই রবীন্দ্রনাথের অনমনীয়তার জন্য দায়ী করলেন অ্যান্ড্রুজকে। আরও কয়েকটি পত্র-বিনিময়ের পর, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ব্রিজেসকে লিখলেন যে[১৬] ইংরেজি গীতাঞ্জলির পরিমার্জন করেছিলেন ইয়েটস এবং তিনি ব্রিজেস-কৃত পাঠান্তরে ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। ১৯১৫ সালের মে মাসের মাঝামাঝি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে অ্যান্ড্রুজ রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ালেন। ব্রিজেসের বাড়ি থেকে ইয়েটস ৩১ জুলাই ১৯১৫ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন : 'I should be sorry to prevent Robert Bridges from

making the slight changes he wishes. He is at moments a most admirable poet and always the chief scholar in English style now living.'।[১৭] ইয়েটসের অকুণ্ঠ সমর্থনের পর রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ব্রিজেস-কৃত পাঠান্তরে সম্মতি দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইয়েটসের দ্বারা নির্বাচিত *The Oxford Book of Modern Verse* (১৯৩৬) নামক সংকলনে গীতাঞ্জলির এই কবিতাটির ব্রিজেস-কৃত পাঠই গৃহীত হয়েছে।[১৮]

তৃতীয় পরিচ্ছেদের ('The Bubble Reputation') আরম্ভে ই. পি. বলেছেন যে ইংলন্ডে রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতির বিলুপ্তির জন্য টমসনের রবীন্দ্র-সমালোচনাকেই সাধারণত দায়ী করা হয়ে থাকে ; কিন্তু অভিযোগটি ভিত্তিহীন (পৃ. ২৯)। ভিত্তিহীন তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু কারা এই অভিযোগ করেছিলেন ? রাদিচের নাম করেছেন ই. পি.— রাদিচে ছাড়া আর কারোর নয়। এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত টমসনের দ্বিতীয় বইটি প্রকাশের পর তদানীন্তন রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে টমসনের বিরুদ্ধে কিছু ক্ষোভ ও বৈরিতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইংরেজ পাঠকের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বলে শোনা যায় নি। এমন-কি একটু দেরিতে হলেও, টমসনের রবীন্দ্র-সমালোচনার বাঙালি অনুরাগীদের সংখ্যা তিরিশের দশক থেকে কখনোই বিরল হয় নি।[১৯] ইংরেজিভাষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ কবি-খ্যাতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য টমসন যে প্রয়াস করেছিলেন তর্কাতীতভাবে তা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি পথিকৃৎ ছিলেন না। *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* প্রকাশের অন্তত তেরো-চোদ্দ বছর আগে এই চেষ্টা করেছিলেন এজ়রা পাউন্ড তিনটি স্মরণীয় নিবন্ধে।[২০] পাউন্ড অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদে কখনো সচেষ্ট হন নি। বাংলাও তিনি জানতেন না। কিন্তু উক্ত তিনটি নিবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে মিস্‌টিসিজ়ম ও দার্শনিকতার মোহজাল থেকে ছিন্ন করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, পাউন্ডের রবীন্দ্রচর্চার প্রতি আমরা বিশেষ মনোযোগ কখনো দিই নি। আর্নেস্ট রিজ়-এর *Rabindranath Tagore : A Biographical Study* (১৯১৫) অবশ্য বন্ধুকৃত্য। রবীন্দ্রনাথের অনেক অনুরাগী ও বন্ধুজন আশা করেছিলেন, *Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore* (১৯৩৬) প্রকাশের পর পশ্চিমভূখণ্ডে আবার নতুন করে সাড়া জাগবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটে নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলন্ডে রবীন্দ্রনাথের ক্ষীয়মাণ কবিখ্যাতির কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র।

অথচ প্রাক্-মহাযুদ্ধকালীন বিলেতে রবীন্দ্রনাথের বিপুল কবি-খ্যাতি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ই. পি. এই খ্যাতির নাম দিয়েছেন 'The bubble reputation'। তিনি লিখেছেন : 'This [the bubble reputation] was due, to some extent, to his majestic and beautiful presence and the mystery of an impenetrable alien culture, and much more to the astonishing success of *Gitanjali*. ... It had something to do with the euphoric Indian summer of European liberalism, whose motivations were (no doubt) honourable, but which was shortly to wither in the winter of World War I....' (পৃ. ৩০)। কিন্তু শুধু কি তাই ? ফরাসি বিপ্লবের শুরু থেকেই ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে এক নিরন্তর ধারাবাহিকতার চেতনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। মজার কথা এই যে এই মূল্যবোধ ও চেতনা শিল্পবিপ্লবের প্রতি সন্দিগ্ধ হলেও সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলে নি। যে কথাটা আমি বলতে চাইছি সেটা এই : এডমন্ড বার্ক থেকে শুরু করে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত এক প্রতিবিপ্লবী ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্রত্যভিজ্ঞা (ideology), শিল্পবিপ্লব ও তৎপ্রসূত নাগরিক ও ব্যবসায়িক সভ্যতার প্রতি ঘোর অনীহা, নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে ঐশ অভিপ্রায়ের আবিষ্কার— অর্থাৎ, সংক্ষেপে যাকে বলতে পারি, আরনল্‌ডিয়ান হাইকালচার— এইসবেরই সমর্থন শিক্ষিত ইংরেজ-সমাজের একাংশ পেয়েছিলেন ১৯১২-১২ সালে, রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ও অনূদিত কবিতা ও প্রবন্ধাবলীর মধ্যে।

যাঁরা এই সমর্থন খুঁজছিলেন, ১৯১২ সালে লিখিত একটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বলেছেন, 'ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ'।[২১] ডেভিড পার্‌কিনস তাঁর আধুনিক ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে এঁদেরই চিহ্নিত করেছেন 'the school of the Beautiful and the Agreeable' নামে।[২২] বলা বাহুল্য যে ১৯১২-১৩ সালে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এঁরাই যে একমাত্র সংস্কৃতির ধারা ছিলেন তা নয় ; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত এঁদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য অনস্বীকার্য। অন্য আরেকটি ধারা— সেইসব কবি ঔপন্যাসিক ও সমালোচক যাঁরা ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিকীকরণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মহাযুদ্ধের আগে থেকেই— তাঁরা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখান নি গীতাঞ্জলির স্বর্ণযুগে। (ইয়েটস ও পাউন্ড এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই দুজনের সম্পর্কের ইতিবৃত্ত স্বতন্ত্র ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার)। মহাযুদ্ধের পর এই দ্বিতীয় ধারাটি ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজের' যাঁরা বিশেষভাবে রবীন্দ্রানুরাগী হয়ে উঠেছিলেন ইংলণ্ডের তৎকালীন সাংস্কৃতিক জগতে তাঁদের প্রভাবের কথাটা মনে রাখা দরকার। ইয়েটস, রোটেনস্টাইন, এমন-কি র‍্যাটক্লিফ ও অ্যান্ড্রুজের নাম করেছেন ই. পি., অথচ স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক, এ. সি. ব্র্যাডলি, টমাস স্টার্জ মুর, আর্নেস্ট রিজ্, আর. সি. ট্রেভেলিয়ান, লরেন্স বিনিয়ন ও ম্যাসিংহামের নাম করেন নি। নন-কনফরমিস্ট ও উদারপন্থী এই বন্ধুগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখেছিলেন আরনলডীয় হাইকালচারের আদিকল্প— রাজনীতি ও বিপ্লববাদ থেকে বিযুক্ত, আত্মসমাহিত এক মনীষা। ঔপনিবেশিক ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এইভাবে দেখার রাজনৈতিক তাৎপর্যটি লক্ষণীয়। ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদ নামক জটিল ও অসমসত্ত্ব ঘটনার এটাও একটা দিক।

এই বন্ধুগোষ্ঠীর অনেকের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সখ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। আবার অনেকের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুতার উত্তাপ লক্ষণীয়রূপে হ্রাস পায়— বিশেষ করে ১৯১৬-১৭ সালে জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত ন্যাশনালিজ্‌ম-সংক্রান্ত বক্তৃতাবলী[২৩] ও ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বক্তব্যের পর। রবীন্দ্রনাথের বন্ধুগোষ্ঠী এক অ-রাজনৈতিক কবির রাজনৈতিক ভূমিকায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বিলেতে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি হ্রাস পাবার এটা একটা বড়ো কারণ। আরেকটি বড়ো কারণ অবশ্যই যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডে সাহিত্যরুচির পালাবদল। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১৯১৩-র পর থেকে রবীন্দ্রনাথের অযত্নসাধিত অনুবাদ, কবিতা-নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা ও প্রস্তুতির শৈথিল্য।

ই. পি. দাবি করেছেন যে টমসন এইসব ত্রুটির সংশোধন করতে চেয়েছিলেন তাঁর রবীন্দ্রচর্চায়। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কবি বা ধ্যানী নন, তাঁর যে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক সত্তাও রয়েছে, ভারত ও বিলেতবাসী অজ্ঞ ইংরেজদের সে কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন টমসন। এই প্রসঙ্গে ই. পি. যে তথ্যের সাহায্য নিয়েছেন, সেটি কিন্তু একটি হাস্যকর ভ্রান্তি। ১৯১৭ সালের ৬-৭ অক্টোবরের স্টেটস্‌ম্যান কাগজে 'Sir Rabindranath and Politics' শীর্ষক একটি দীর্ঘ পত্র ছাপা হয় সম্পাদকীয় স্তম্ভের পাশে। চিঠিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল A Well-wisher of the Empire ছদ্মনামে। এই চিঠি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন ই. পি. (পৃ. ৩১) এবং প্রাসঙ্গিক পাদটীকায় বলেছেন : ' "Sir Rabindranath and Politics" letter to Calcutta *Statesman,* 6 October, 1917, signed "A Well-wisher of the Empire" but almost certainly EJT' (পাদটীকা ১১, পৃ. ৩৮)। আদপেই তা নয়। চিঠিটি লিখেছিলেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী। প্রসঙ্গসহ চিঠিটির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'র আশ্বিন ১৩৪৮ সংখ্যায়। নলিনীকান্ত লিখেছেন : '১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" এবং উহার ইংরাজী অনুবাদ The Master's Will প্রকাশিত হয়। আমাদের শাসক সম্প্রদায় দেশের সাহিত্য ও অনেক সংবাদই রাখেন না...The Master's Will পড়িয়া তাঁহারা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। যাঁহাকে এতকাল নিছক কবি ভাবিয়াই তাঁহারা এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁহার মুখে আবার এ কেমনধারা কথা শুনা যায়! ইঙ্গভারতীয় কাগজগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ সুরু হইল। "স্টেটসম্যান" বলিলেন, কদলী বৃক্ষ ও ফলের ঠিকানা সম্বন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিত্বপূর্ণ গান

শুনিতে রাজি আছি, কিন্তু রাজনীতি তো কবিত্ব নহে !...আমি নবপর্য্যায় "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক রচনার নমুনাস্বরূপ তাঁহার স্বদেশী আন্দোলনের যুগের একটি চমৎকার লেখা অংশত অনুবাদ করিয়া এবং রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনাড়ি বলিয়া ধরা যে কত বড় মূঢ়তা এই সম্বন্ধে নিজস্ব লম্বা ভূমিকা দিয়া Sir Rabindranath and Politics নাম দিয়া একটা লেখা পত্রের আকারে "স্টেটসম্যানে" প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিলাম। "স্টেটসম্যানের" সম্পাদক উহা মহা সমাদরে সম্পাদকীয় মন্তব্যের সংলগ্ন করিয়া ৭ই অক্টোবর রবিবার ১৯১৭ তারিখের কাগজে প্রায় পূরা দুই কলম ছাপিলেন। ...A wellwisher of Empire ছদ্মনামীয় লেখাটি খবরের কাগজে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল'।[২৪] বিলেতে বসে ই. পি.-র পক্ষে ঘটনাটি জানা সম্ভব হয় নি, কিন্তু তাঁর বাঙালি বন্ধুদের পরামর্শ নিলে ভুলটি এড়াতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত টমসনের দুটি বইই লেখা হয়েছিল ১৯২০ থেকে ১৯২২-এর মধ্যে, যদিও দ্বিতীয় বইটি *Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist* প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত তথ্যাদি টমসন সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে যোগাযোগে এবং অজিতকুমার চক্রবর্তীর বই পড়ে। ই. পি. নিজেই বলেছেন যে টমসন যদিও চেয়েছিলেন বিশ্বসাহিত্যের নিরিখে রবীন্দ্রনাথের পুনর্মূল্যায়ন করতে, কিন্তু তাঁর নিজের সাহিত্যরুচি জর্জিয়ান কাব্যাদর্শের ওপরে উঠতে পারে নি (পৃ. ৪০)। সে যাই হোক, টমসন কিন্তু নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি, জানতে চেয়েছিলেন সাধারণভাবে সমগ্র বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ আমরা লক্ষ করি *Bengali Religious Lyrics, Sakta* (1923) নামক বইতে। বস্তুত, মহাযুদ্ধে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত টমসন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহযোগিতায় রামপ্রসাদ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন অনেক বিশিষ্ট বাঙালির সঙ্গে। যুদ্ধশেষে ১৯২০ সালে টমসন যখন আবার বাঁকুড়ায় ফিরে এলেন, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বড়ো করে কিছু লিখতে প্রস্তুত। গত দশ বছরে তিনি রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ সম্পর্কে অনেক তথ্য ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। টমসন জেনেছেন যে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বাঙালি সংস্কৃতি বহুধাবিভক্ত, ব্রাহ্মসমাজও তাই। অতএব, ইয়েটস যে ইংরেজি গীতাঞ্জলির বহুখ্যাত ভূমিকায় লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এক অঙ্গাঙ্গি অন্বিত সংস্কৃতির ফসল— এই ধারণাটি নিতান্তই ভিত্তিহীন। দীনেশচন্দ্র সেনের কাছ থেকে টমসন শুনেছেন যে বিশশতকের দ্বিতীয় দশকেও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন নি। ১৯২২ সালে লিখিত একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে দীনেশচন্দ্র টমসনকে জানিয়েছিলেন যে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপের অবদান : 'By praising him, the European scholars praise their own gift'। শুধু তাই নয়। সেই চিঠিতেই দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন :' [Tagore was born into] a Europeanized atmosphere in which there was hardly any indigenous element except perhaps a culture of the Upanishads. His mode of thinking is essentially English.... He appeals to his English readers more widely than to Bengalis.' (পৃ. ৫৩)। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যেন দীনেশচন্দ্রের এই মন্তব্যের কথা জানতে না পারেন সে বিষয়ে টমসনকে সাবধান করে দিতেও ভোলেন নি (পৃ. ৫৩-৫৪)। (রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকাশ্যে অথবা ছাপার অক্ষরে দীনেশচন্দ্র কিন্তু এই ধরনের মন্তব্য কোনোদিন করেন নি। ১৯২২ সালেই প্রকাশিত 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' নামক আত্মজীবনীতে দীনেশচন্দ্রের রবীন্দ্রস্মৃতিচারণ তো শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আপ্লুত)।[২৫]

রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত টমসনের প্রথম বই, *Rabindranath Tagore : His Life and Work* (Calcutta, 1921) —যাতে তিনি এইসব কথাই লিখেছিলেন— প্রকাশিত হবার পর বাঙালি পাঠকমহলে কিন্তু কোনো তীব্র ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু কোনো বিরোধিতা করেন নি। ১৯২১-এর অক্টোবরে একটি তারিখহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে

লিখেছিলেন : 'Thompson-এর বইটা পড়ে দেখলুম। অনেক খেটে ও পড়ে শুনে লিখেছেন, অতএব আমার সম্বন্ধে অন্য বইগুলির চেয়ে এটি ভাল হয়েচে। কিন্তু সেটা বেশি কথা নয়। অন্য বইগুলি একেবারেই বর্জনীয়...মোটের উপরে Thompson-এর বইকে অবলম্বন করে আমার দেশের লোক আমাকে বিজাতীয় বলে গাল দেবার খুব সুবিধা পাবে। অথচ সে কথাটা ভিতরের দিক থেকে একেবারেই সত্য নয়...আমি যে পরিবারে যে অবস্থাতেই জন্মেচি তাতে আসল দেশ থেকে আমার চিত্তকে বিযুক্ত করে নি। আমি কোনো পারিবারিক প্রথা বা বিশ্বাসের দ্বারা মনকে জড়িত হতে দিই নি— আমি স্বভাবত স্বতন্ত্র ছিলুম সেই জন্যই আমি মুক্তভাবে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেচি। টমসন আমার বিচ্ছিন্নতাকে বাড়িয়ে দেখিয়েচেন— আমার যোগকে তিনি ধরতেই পারেন নি। সেইজন্যই আমার unpopularity-কেই তিনি বড় করেচেন। আর দেশ যেখানে আমাকে নিজের অগোচরে এমনকি বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও গ্রহণ করেছে সেটা তিনি বুঝতেই পারেন নি। আমার বক্তৃতাসভার ভিড়টা তাঁর দেখা উচিত ছিল'।[২৬] ২৭ অক্টোবর ১৯২১ (১০ কার্তিক ১৩২৮) তারিখে প্রশান্তচন্দ্রকে লেখা আর-একটি চিঠিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'না, তুমি Thompson-এর মতের কোনও প্রতিবাদ কোরো না। সে তার নিজের বুদ্ধি অনুসারে যা বলেচে সে তার নিজেরই জিনিস— তার কাজ হচ্ছে নানা source থেকে তথ্য এবং মতামত সংগ্রহ করে সেগুলোকে তার আপনমনের ছাঁচে ঢালাই করে একটা মূর্তি খাড়া করে তোলা। সেই মূর্তির জবাবদিহি তোমাদের নয়। আমার নিজের কথা যদি বল আমি কিছুমাত্র রাগ করিনি। কারণ আমি দেখেচি টমসন আমার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব থেকে কিছু লেখেনি— আমার সঙ্গে আমার চারিদিকের যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধে সম্প্রদায়গত, ব্যক্তিগত বা জাতিগত কারণে ও যদি ভুল বুঝে থাকে সে ভুলের জন্য ছট্‌ফট্ করবার দরকার নেই'।[২৭]

প্রশান্তচন্দ্র কি তা হলে প্রতিবাদ করার কথা ভেবেছিলেন? (ব্যক্তিগত চিঠিতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে টমসনের ধারণার সমালোচনা করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র [পৃ. ৮৩-৮৪]) ; অথচ ই. পি. লিখেছেন যে বইটির প্রস্তুতিপর্ব থেকেই প্রশান্তচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ; পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া পড়েছিলেন তিনি, তথ্য ও পরামর্শ জুগিয়েছিলেন অক্লান্তভাবে (পৃ. ৫৭-৬৩ ; প্রসঙ্গত, *Rabindranath Tagore : His Life and Work*-এর ভূমিকাও দ্রষ্টব্য, পৃ. x)। ই. পি. জানিয়েছেন যে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও দেখেছিলেন বইটির পাণ্ডুলিপি (পৃ. ৬১)। কোনো সংস্কার বা সংশোধন করেছিলেন কিনা, কিংবা করে থাকলেও টমসন সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন কিনা, জানা নেই। কিন্তু টমসনের একাধিক চিঠিপত্রের উল্লেখ করে ই. পি. বলেছেন যে বইটি পড়ে ব্রজেন্দ্রনাথ এতদূর বিরক্ত হয়েছিলেন যে টমসনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। ই. পি.-র ভাষায় : 'There is no letter in my files from Seal after July 1920 ; indeed, the correspondence appears to end abruptly in silence. We know that Seal was deeply pained, since the dedication might seem to associate him with the judgements in the book' (পৃ. ৬০)। ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্য কিন্তু অন্যরকম। জুলাই ১৯২০-র ষোল মাস পর ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন : 'Heritage of India seriesএ Thompson যাহা আপনার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়াছি। <u>সে বিষয়ে তাহার সহিত আমার লেখালেখি চলিতেছে</u>। আমার মতে Europeএ সমালোচকের দল ভারতীয় সাহিত্য বা কলাবিদ্যা সম্বন্ধে সত্য ধারণায় পঁহুছিতে শীঘ্র পারিবে না। এক ধাপ অগ্রসর হইয়া দুই ধাপ পিছাইয়া যাইবে... Thompson একবার translation করিয়া দেখিতে চায়, দেখুক। কিন্তু শুধু translationএর কর্ম্ম নয়— transvaluation চাই... Thompson বঙ্গ সন্তানকে বর্জ্জন করিয়া বঙ্গের ঠাকুরকে লইতে পারিবে কি—ভারতপন্থাকে ছাড়িয়া ভারতপন্থীকে চিনিতে চিনাইতে পারিবে কি?' (নিম্নরেখা আমার)।[২৮] রবীন্দ্রানুরাগীদের মুখপত্র 'প্রবাসী'তেও যে দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেটি কোনোমতেই টমসন-বিরোধিতার নিদর্শন নয়।[২৯] বহু ত্রুটির উল্লেখ করেছেন সমালোচক, প্রশংসাও করেছেন অকুণ্ঠভাবে। মোটের ওপর, *Rabindranath Tagore : His Life and Work* প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুরাগীদের চোখে টমসন শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন— এই কথাটা

নেহাতই গুজব।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরজি অনুবাদের বিরুদ্ধে টমসন (এবং ই. পি.) যে-সব অভিযোগ তুলেছেন তা বহুলাংশে সত্য, সন্দেহ নেই। ই. পি. বলেছেন যে টমসন রবীন্দ্রনাথের অনুবাদক ছিলেন না (পৃ. ৫১) ; কিন্তু কয়েকটি উৎকৃষ্ট অনুবাদ করতে পেরেছিলেন : '*Urvasi* and *The Curse* [*at Farewell*]— deserve a place in the selected Tagore by several hands which must sometime be published' (পৃ. ৫২)। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সমস্যা আমার বর্তমান প্রসঙ্গ নয় ; কিন্তু টমসন-কৃত 'উর্বশী'-র অনুবাদ সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য নিবেদন করতে চাই। টমসন *Rabindranath Tagore : His Life and Work*-এর ভূমিকায় তাঁর দুজন ছাত্রের কাছে অনুবাদের ব্যাপারে ঋণ স্বীকার করেছেন।[৩০] মনে হয়, ঋণের সংখ্যা আরও বেশি। তাঁর এক ছাত্র, রামেন্দু দত্ত (এঁর কথা উক্ত ভূমিকায় নেই), লিখেছেন যে ১৯২১ সালে বাঁকুড়ায় অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে টমসন রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। অনুবাদগুলি তিনি রামেন্দু দত্তকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দেখে দিতে অনুরোধ করেন। রামেন্দু অবশ্য পারিশ্রমিক নেন নি। 'প্রথম দুই চার দিন কতকগুলি অনুবাদ ঠিক করিয়া দিবার পর টম্‌সন্ সাহেব "উর্বশী" কবিতাটি দিয়া বলিলেন "ভাল করিয়া দেখিয়া দিবে। ইহা রবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।" আমি যখন উহা ফেরৎ দিতে গেলাম, তখন ভয়ে সংকোচে, লজ্জায় আমার হাত কাঁপিতেছে। "কী ব্যাপার রমেন ?" (মুখে ও বহুপরে চিঠিপত্রেও তিনি আমাকে এই সম্বোধনে অভিহিত করিতেন)। তারপর দেখিয়া বলিলেন, "You have almost re-done it, make out a fair copy and you will get a copy."। আজও তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত টাইপ করা "উর্বশী' আমার নিকট আছে।'[৩১]

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে টমসনের প্রথম বইটি যখন প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ তখন অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাল। কিছুকাল আগেই জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, এবং রবীন্দ্রনাথ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেছেন। ই. পি.-র বিবেচনায় এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা রবীন্দ্রনাথ ও টমসনের বন্ধুত্বের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছিল (পৃ. ৭৪-৭৫)। বস্তুত তা নয়। রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন নি। টমসন এবং খুব সম্ভব প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও নয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালের একটি চিঠিতে টমসন তাঁর বন্ধু ক্যানটনকে লিখেছিলেন : '...non-cooperation has passed its floodtide. Tagore has killed it here'. (পৃ. ৭৯)। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। শুধু 'স্যার' খেতাব বর্জনই নয়, ১৯২০-২১-এ ইংলন্ডে ভ্রমণকালে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন যাতে হানটার কমিশনের রিপোর্ট হাউস অব লর্ডসের দ্বারা গৃহীত হয়। সফল হন নি। এবং এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কিছু ইংরেজ বন্ধুর সাময়িক মনোমালিন্যও ঘটেছিল। ১৮ জুন ১৯২০ তারিখে অক্সফোর্ডে ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা আহূত এক রবীন্দ্র-সংবর্ধনা সভায় রবার্ট ব্রিজেস সভাপতিত্ব করতে রাজি হন নি।[৩২] রোটেনস্টাইনও সভায় অনুপস্থিত ছিলেন এই অজুহাতে যে তিনি অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথের আবাসস্থল খুঁজে পান নি।[৩৩] কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও 'বড়ো ইংরাজ'-এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা বিচলিত হয় নি। নাইটহুড ত্যাগের উপলক্ষে তিনি যে ঐতিহাসিক চিঠিটি লিখেছিলেন তার শেষ কয়েক ছত্রই সেই আস্থার প্রমাণ।

পক্ষান্তরে টমসন প্রকাশ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নিন্দায় অংশ নিয়েছিলেন স্টেটসম্যান পত্রিকায় মুদ্রিত একটি চিঠিতে (পৃ. ৭৬)। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে অবশ্য তাঁর কণ্ঠস্বর একটু তিক্ত। স্টেটসম্যানে পত্রটি প্রকাশের (মনে রাখা ভালো যে চিঠিটি লিখেছিলেন পঁচিশজন খ্রিস্টীয় যাজক ১৪ জুলাই ১৯২০ তারিখে। টমসন অন্যতম একজন স্বাক্ষরকারী ছিলেন মাত্র) দশদিন পর টমসন তাঁর স্ত্রীকে লিখলেন : 'I've done with the Dyer controversy'; এবং পরদিন লিখলেন : '.... the old British Empire has come well out of this matter. The English rule is still the sanest and fairest on this globe,

after all' (পৃ.৭৭)। রবীন্দ্রনাথ টমসনের ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর শোনেন নি। অনুমান করা যেতে পারে যে স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিটি তিনি দেখেছিলেন। ভারত ছাড়ার আগে ১৯২১ সালের শেষের দিকে টমসন যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, তখনও রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে কোনো অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় নি। রবীন্দ্রনাথ ১২ অক্টোবর ১৯২১ (২৬ আশ্বিন ১৩২৮) তারিখে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখছেন : 'Thompson কয়েকদিন থেকে চলে গেছেন। তিনি বলচেন কাল হোক বা পর্শু হোক আমার ইংরেজি তর্জমার একটা collected সংস্করণ বের করতেই হবে। অতএব এই বেলা কারো উচিত গীতাঞ্জলি বাদে বাকি লেখাগুলি কালক্রমানুসারে সাজিয়ে একটা manuscript এই বেলা তৈরি করে রাখা। তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারবে না।'[৩৪] বস্তুত, টমসন-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের চিড় ধরেছিল টমসনের দ্বিতীয় বই *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* (1926) প্রকাশিত হবার পর। সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তটি এখনও অনুদ্‌ঘাটিত। কিন্তু অনুমান করা অসংগত হবে না যে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতার পিছনে ছিল টমসনের দ্বিতীয় বইতে কিছু অসতর্ক উক্তির পুনরাবৃত্তি এবং ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে টমসনের মন্তব্য প্রকাশের ধরন। ফাটল বড়ো করার ব্যাপারে কতিপয় রবীন্দ্রভক্তেরও যে একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া, ভারত-সমস্যা বিষয়ে টমসনের সাম্প্রতিক মতামতের দায়িত্বও কিছু কম ছিল না।

লক্ষণীয় যে ভারতবাস কালে টমসন তাঁর রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে বিশেষ সরব ছিলেন না, বিশেষত তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের কাছে। তাঁর স্বদেশবাসী বন্ধুজন ও আত্মীয়দের কাছে লেখা চিঠিপত্রের কথা অবশ্য আলাদা। ১৯২৩ থেকে (১৯২২-এর শেষে টমসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন) এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং এই দশকের শেষে টমসন রীতিমতো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। বিস্তৃত হয়েছে তাঁর পরিচিতের পরিধি এবং ভারত-সম্পর্কিত তাঁর মতামতের জন্য বন্ধু ও শত্রু উভয়ের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

ই. পি. লিখেছেন : 'In his letters to Tagore and Mahalanobis in 1920 to 1922 there is scarcely any direct discussion of political or national questions. He carefully skirted around sensitive matters in his letters to Tagore, confining himself to literary issues' (পৃ. ৭৭)। কথাটা দুটো কারণে অস্বস্তিকর। প্রথমত, ১৯২০-২২ সালে বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে একে এড়িয়ে যাওয়া একটু অস্বাভাবিক ঠেকে। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথকে না লিখলেও তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের ও বাংলাদেশে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা চিঠিপত্রে কিন্তু টমসন অনবরতই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন (পৃ. ৭৮-৭৯)। এমন-কি, বাঁকুড়ার অসহযোগ আন্দোলনকারীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি। ১৯২১ সালের ১৯ জানুয়ারি তারিখে তিনি প্রশান্তচন্দ্রকে লিখছেন : '...They have raised a fund for a rival college, <u>so far it amounts to rs 7, annas 14, pies 6</u>.' (নিম্নরেখা আমার। পৃ. ৭৯)। যতটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টমসন বাঁকুড়ায় অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলেছেন ব্যাপারটা ঠিক ততটা তুচ্ছ ছিল না। ১৯২০ সালে বাঁকুড়া শহরে গান্ধীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ওয়েসলিয়ান স্কুল ও কলেজে। হস্টেল সমেত স্কুল ও কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পদত্যাগ করেন দর্শনের অধ্যাপক অনিলবরণ রায়। সাতটাকা, চোদ্দ আনা, ছয় পাই নিয়ে টমসন যতই ঠাট্টা করুন, সরকারি স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাবার পর বাঁকুড়া শহরে দত্তপুকুরের পাড়ে সত্য সত্যই একটি জাতীয় মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। সরকারি স্কুলগুলি যখন খুলল, দেখা গেল বহু স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নাম খারিজ করে নিয়েছে। জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা তখন পাঁচশোর বেশি।[৩৫]

অথচ রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিপত্রে টমসন এসব বিষয়ে নীরব। ই. পি. মনে করেন যে এক অ-রাজনৈতিক স্তরে টমসন রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন (পৃ. ৬৯-৭১)। বস্তুত ই. পি.-র মূল প্রতিপাদ্য এই যে যুদ্ধপূর্ব ইংলন্ড ও ভারতের ভাবুকসমাজ রাজনীতির কলুষ থেকে মুক্ত একটি উদার ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাংস্কৃতিক

ভাববিনিময় করার চেষ্টা করেছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধে আর ই. পি. তার উল্লেখও করেছেন 'Crisis in Civilization'-এর সূত্রে। তিনি মনে করেন, এইভাবে দেখলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক একটা নতুন মাত্রা পেতে পারে এবং এডওয়ার্ড সইদ -প্রচারিত (ই. পি. অবশ্য কোথাও সইদ-এর নাম করেন নি) ওরিয়েন্টালিজমের একদর্শিতা এড়ানো যায়। হয়তো যায়। কিন্তু সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতার পেছনেও লুকিয়ে থাকে অনেক জরুরি প্রশ্ন। উপনিবেশের ক্ষেত্রে অ-রাজনৈতিক রাজনীতি ব্যাপারটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

টমসনের পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্র-মূল্যায়ন, *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* প্রকাশিত হয় ১৯২৬-এ, যদিও বইটি লেখা হয়েছিল বছর তিনেক আগে। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন চিত্তে বইটি গ্রহণ করেন নি। তাঁর তীব্র উষ্মা ও অসহিষ্ণুতা অনেকের কাছেই বেমানান ঠেকেছে। কিন্তু তবু, রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া নিয়ে যে-কাহিনী এতাবৎ কাল চলে এসেছে এবং ই. পি.-ও যা নিঃসংশয়ে অনুসরণ করেছেন, তার অনেকখানিই তথ্য-সমর্থিত নয়। কিন্তু তার আগে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। টমসনের দ্বিতীয় বইটি রবীন্দ্রনাথ ভালো করে পড়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ই. পি. (পৃ. ৯০)। রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতাকে তাঁর মনে হয়েছে অবোধ্য। রোটেনস্টাইনকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (২০ এপ্রিল ১৯২৭) যে টমসন তাঁকে ইংরেজ-বিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করেছেন। ই. পি.-র মতে টমসন ঠিক তা বলেন নি (পৃ. ৯০) ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজ ও ইংলন্ডের কঠোর সমালোচনা করেছেন একাধিকবার, তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন উক্তিতে। ই. পি. এমনই একটা উক্তি উদ্ধার করেছেন টমসন-ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ থেকে 'Our modern school masters are Englishmen; and they of all the western nations, are the least susceptible to ideas. They are good, honest and reliable, but they have vigorous excess of animal spirits, which seek for exercise in racing, fox-hunting, boxing-matches, etc., and they offer stubborn resistance to all contagion of ideas.' (পৃ. ৯০)। রবীন্দ্রনাথের যে-চিঠি থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি লেখা হয়েছিল ১০ জুন ১৯২১ সালে।[৩৬] বছরখানেক আগে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড-সম্পর্কিত হানটার কমিশনের রিপোর্ট ইংলন্ডের পার্লামেন্টে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। লন্ডন থেকে ২২ জুলাই ১৯২০ তারিখে অ্যান্ড্রুজকে লিখছেন : 'The result of the Dyer debates in both Houses of Parliament makes painfully evident the attitude of mind of the ruling class of this country towards India. It shows that no outrage, however monstrous, committed against us by agents of their Government can arouse feeling of indignation in the hearts of those people from whom our Governors are chosen.'[৩৭] ১৩ আগস্ট ১৯২০ তারিখে আবার লিখলেন : 'Our stay in England has been wasted. Your Parliament debates about Dyerism in the Punjab and other symptoms of an arrogant spirit of comtempt and callousness about India have deeply grieved me, and it was with a feeling of relief that I left England.'[৩৮]

এ রকম এক জাতীয় ক্ষোভের ছায়ায় লেখা কোনো চিঠিকে ঠিক ইংরেজ-বিদ্বেষের দলিল বলে ধরে নেওয়া যায় না। ই. পি. অবশ্য ধরে নেন নি (পৃ. ৯১)। কিন্তু টমসন একে বলেছেন 'patronising summary'।[৩৯] মজার ব্যাপার এই যে ঠিক একই কথা বলা চলে টমসনের সম্পর্কেও, যখন তিনি বাঙালি মানসিকতা ও সাহিত্য বিষয়ে ঢালাও মন্তব্য করেন (পৃ. ৮১ দ্রষ্টব্য)। *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* বইয়ের যে-পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ উদ্ধৃত হয়েছে তার উনিশ পৃষ্ঠা পরে টমসন লিখেছেন : 'There is no literary criticism in Bengal. Politics overshadow all thought and the national sensitiveness is so quick that a book is judged not by its honesty or ability,

not by the insight it shows or help it brings, but solely according as it flatters patriotic vanity' ।[৪০] রবীন্দ্রনাথ ও টমসন— উভয়ের মন্তব্যই সাময়িক প্রতিক্রিয়ার ফসল। পার্থক্য শুধু এই যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার পেছনে রয়েছে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মতো এক শোকাবহ ঐতিহাসিক ঘটনা, ইংরেজ সরকারের নিদারুণ ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা এবং পরাধীন ভারতবাসীর দীর্ঘ-সঞ্চিত ক্ষোভ। আর টমসনের মন্তব্যের পেছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম-প্রকাশিত বই সম্পর্কে কিছু শোনা কথা অথবা চিঠিপত্রে বন্ধুজনের সমালোচনা।

কথাটা শুধু এই নয় যে ইংরেজ-বিদ্বেষী বলে চিহ্নিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিব্রত বোধ করেছিলেন। ১৯২০ সালের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ'-এর কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন। অন্য দিকে, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে— বিশেষত জার্মানিতে— রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, খ্যাতি ও সম্মান তখন যে-কোনো কবির পক্ষে ঈর্ষণীয়। ঘটনাটা রবীন্দ্রনাথের উদারপন্থী ইংরেজ বন্ধুদের ভালো লাগে নি। টমসনেরও না : 'I think that Indians over-rate the powers and achievements of the German intellect, great as they are, and under-rate those of the French and English. German intellect has great kinship with their own; and the Germans are further away from them than the English, whose services to Indian scholarship are easily overlooked in the daily exasperation caused by the political situation. The position is not natural; we are not guests in their country, as we shall be one day' ।[৪১] ১৬ মার্চ ১৯২৭ তারিখে রোটেনস্টাইনকে লিখিত একটি চিঠিতে প্রসঙ্গটি স্পষ্টতর করেছেন টমসন। চিঠিটি আগাগোড়া তাঁর সদ্য প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত বইয়ের বিষয়ে। বলেছেন, এই বই তাঁর চার বছরের পরিশ্রমের ফসল ; ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের ক্ষীয়মাণ খ্যাতির জন্য আক্ষেপ করেছেন ; তাঁর মনে হয়েছে যে টি. এস. এলিয়ট ও অলডাস হাক্সলি-র যুগে এই বাঙালি কবি কখনোই সুবিচার পাবেন না। ই. পি. এই চিঠির বিভিন্ন অংশ তিনবার উদ্ধৃত করেছেন তাঁর বইতে (পৃ. ৩৫, ৫১, ৬৬ পাদটীকা ৫২)। কিন্তু যে অনুচ্ছেদটি তিনি উদ্ধৃত করেন নি, সেটি এইরকম : 'We have no Indian studies at Oxford, other than Sanskrit— and that less of literature than of grammar The vernaculars are despised, are not considered serious studies— yet Sanskrit is dead, they are vigorous and developing. <u>As a result, Indian intellectuals are now turning to the continent— they are getting increasingly out of touch with us, and are forming connections with Scandinavia, Germany, Czechoslovakia, Italy. This fact has even a political importance</u>.' (নিম্নরেখা আমার)। অনুচ্ছেদটি ওরিয়েন্টালিজমের নিদর্শন কিনা, সে বিচারের ভার পাঠকের।[৪২]

টমসনের দ্বিতীয় বইটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন আমেদাবাদে অবস্থান কালে ; খুব সম্ভব ১৯২৭-এর এপ্রিল মাসে।[৪৩] পড়ার পর যে তীব্র ও অনেকাংশে অন্যায্য প্রতিক্রিয়া তিনি চিঠিপত্রে ও একটি সমালোচনায় প্রকাশ করেছিলেন সে কথা সকলেই জানেন। ই. পি. লিখেছেন : 'Tagore not only denounced Thompson's book vehemently in his own intimate circle, he also wrote a savage pseudonymous critique in *Prabasi* and enlisted others (Ramananda Chatterjee, Shanta Debi (Ramananda's daughter) and Niharranjan Ray) to join the attack'. (পৃ. ৯১)। শান্তা দেবী কখনো টমসনের সমালোচনা করেছেন বলে জানি না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য দুটি আক্রমণাত্মক সমালোচনা লিখেছিলেন যথাক্রমে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায়।[৪৪] নীহাররঞ্জন রায়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল একমাস পরে 'বিচিত্রা' পত্রিকায়।[৪৫] কিন্তু এই দুইজন সমালোচককে রবীন্দ্রনাথ নিয়োজিত করেছিলেন, এই তথ্য ই. পি. কোথায় পেলেন জানান নি। তিনি হরীশ ত্রিবেদীর দীর্ঘ ভূমিকা ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

'রবীন্দ্রজীবনী'র উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৯৮ পাদটীকা ৯)। কিন্তু প্রাসঙ্গিক অংশে এঁরা কেউই সে কথা বলেন নি। বস্তুত সমস্ত ঘটনাটি এমনভাবে প্রচারিত হয়েছে যেন টমসনের চরিত্রহননের জন্য রবীন্দ্রনাথ এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ১৯২৭ সালে। অতএব সত্যের খাতিরে আনুপূর্বিক তথ্যাদি বিবৃত করা দরকার।

এ কথা ঠিক যে *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* পড়বার আগেই রবীন্দ্রনাথ বইটি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য শুনেছিলেন অ্যান্ড্রুজ ও খুব সম্ভব, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সূত্রে। ১৯২৭-এর ৩১ জানুয়ারি তারিখে ডারহান থেকে লিখিত একটি চিঠিতে অ্যান্ড্রুজ কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন : 'I have dipped into Thompson's book and have found a "superiority' complex about it which has distressed me amid much that is good and true. What I found lacking almost entirely was the appreciation of Gurudeva's own personal spirit. It was an appreciation and criticism of his <u>literary</u> work leaving out almost entirely the personality. To tell the truth, I had to force myself to go on reading it. On every page, the revolt came to my mind against the picture drawn of Gurudeva himself and his work at Santiniketan, and I could hardly bear to go on reading. Probably you yourself have felt about it the same way.'[৪৬] এ বিষয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে ঠিক কী বলেছিলেন জানা যায় না ; কিন্তু রামানন্দকে লিখিত ১৮ জুন ১৯২৭ তারিখের একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ টমসনের বই সম্বন্ধে তাঁর আপত্তিগুলি খুব স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য নির্মলকুমারী মহলানবিশকে একটি দীর্ঘ উত্তপ্ত (৮ এপ্রিল ১৯২৭) ও রোটেনস্টাইনকে একটি নাতিদীর্ঘ ও ক্ষুব্ধ চিঠি (২০ এপ্রিল ১৯২৭)[৪৭] লিখেছেন টমসন প্রসঙ্গে। নির্মলকুমারীকে লেখার কারণ বোধহয় এই যে টমসন তাঁর বইয়ের প্রাথমিক তথ্যাদির জন্য নির্ভর করেছিলেন মূলত প্রশান্তচন্দ্রের ওপর। ১৯২৬-এর প্রথম সংস্করণটিও প্রশান্তচন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত। দুটি চিঠিই বহু-আলোচিত,অতএব এখানে তার আলোচনার দরকার নেই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে-চিঠির উল্লেখ করেছি, তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'আমার সঙ্গে Thompson-এর কথাবার্তা যা কিছু হয়েচে কোনো ছাপার বহিতে তার গতি হবে এমন আশঙ্কা মনেও উদয় হয় নি। সেগুলো যে আমাকে দেখিয়ে নেবে এমন মানুষই ও নয়।'[৪৮] অস্বীকার করেছেন, তাঁর কাব্য, নাটক ও উপন্যাসে ইংরেজি সাহিত্যের (টমসন-আরোপিত) প্রভাবের কথা। টমসনের রবীন্দ্রচর্চার অন্যতম প্রসঙ্গ হল রবীন্দ্রসাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব। রাদিচের ভাষায়, 'Tagore throughout his [Thompson's] book is treated as an off-shoot of English literature.'[৪৯] সন্দেহ নেই, প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট উত্তেজিত করেছিল। রামানন্দকে লেখার একমাস আগে রবীন্দ্রনাথ একটি সাক্ষাৎকারে নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়কে বলেছিলেন : 'জানেন কি ? ওঁরা আমাদের মধ্যে কোনো মৌলিকতা দেখতে পান্ না এবং স্বীকার করেন না। এমন কি আমাদের "সভ্যতা ও শাস্ত্রের" প্রাচীনত্বটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতে প্রস্তুত নন্। "এটা গ্রীকদের থেকে নেওয়া, ওটা বেবিলোন থেকে ধার করা" ইত্যাদি বাক্যে আমাদের যা কিছু তার প্রতিই অবজ্ঞা— কারণ আমরা যে subject-people, British subjects ! ঘৃণা ও অবজ্ঞার মূল সেখানে।'[৫০]

১৮ জুন ১৯২৭-এর পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা আর কোনো চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ টমসনের উল্লেখ করেন নি। (১৯৩০-এর ৪ অক্টোবর তারিখে লিখিত চিঠির একটি অকিঞ্চিৎকর বাক্য অবশ্য আমি হিসেবের মধ্যে ধরি নি।)[৫১] ১৯২৬-এর মে মাস থেকে ১৯২৭-এর জুলাই মাস পর্যন্ত 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা'-কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের মধ্যে খানিকটা মনান্তরের সৃষ্টি হয়। এই সময়কার চিঠিগুলি প্রায় আদ্যন্ত এই বিতর্কে ভরা ; একটিমাত্র চিঠিতে টমসনের উল্লেখ করে রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'টমসনের বহি সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধটি চাহিয়াছি। তাহা ছাপিব।' চিঠি শেষ করার পর পুনরায় যোগ করেছিলেন : 'প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যা হইতে আমি আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। সুতরাং টমসনের বহি

সম্বন্ধে লেখাটি ছাড়া অনুগ্রহ করিয়া আর কিছু পাঠাইবেন না।' চিঠির তারিখ ৩০ জুন ১৯২৭।[৫২]

রামানন্দ-উল্লেখিত রবীন্দ্রনাথের টমসন-সম্পর্কিত ওই প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল সম্ভবত ১৯২৭ সালের জুন মাসে। রচনার ইতিহাস অনুধাবনযোগ্য। রামানন্দ কিংবা অন্য কারো অনুরোধে অথবা পরিকল্পিতভাবে টমসনের সমালোচনায় হাত দেন নি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রভবনে (বিশ্বভারতী) রক্ষিত প্রাসঙ্গিক পাণ্ডুলিপি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে নীহাররঞ্জন রায়-রচিত একটি প্রবন্ধের পরিমার্জনা করেছিলেন তিনি। প্রবন্ধটি শিরোনামহীন ; তার আলোচ্য : টমসনের সদ্য-প্রকাশিত বই। প্রথম পাতাটি বর্জিত এবং প্রথম আট পাতা জুড়ে নীহাররঞ্জনের রচনার মার্জিনে, ওপরে ও নীচে, পরিমার্জনের বদলে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে রচনাটি লিখতে শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ-রচিত অংশটির প্রতিলিপি তৈরি করেন কবির তৎকালীন সচিব অমিয় চক্রবর্তী। এই প্রতিলিপিই পাঠানো হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকার অফিসে। প্রতিলিপির যে-আলোকচিত্র রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে তার থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রতিলিপিটি যখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়, তখন রচনার এবং লেখকের কোনো নাম ছিল না। মূল পাণ্ডুলিপির ওপর রামানন্দ স্বহস্তে লিখে দিয়েছিলেন : 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেন্ড টমসনের বহি' এবং রচয়িতার নাম : 'শ্রী বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়'। পাণ্ডুলিপির ওপরে বাঁ দিকে রামানন্দের নির্দেশ ছিল 'প্রুফ আমাকে দিবেন। র. চ.।' এই প্রবন্ধই প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'র শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায়। পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত সমস্ত প্রসঙ্গটি (আলোকচিত্র সহ) পুলিনবিহারী সেন 'রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত রচনা' নামক এক নিবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন আজ থেকে তিরিশ বছর আগে।[৫৩] বাণীবিনোদের রচনা প্রকাশিত হবার একমাস পরে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর মূল রচনাটি ঈষৎ সংশোধন সহ প্রকাশ করেছিলেন 'বিচিত্রা' (ভাদ্র ১৩৩৪) পত্রিকায়। 'প্রবাসী'র যে-সংখ্যায় বাণীবিনোদের রচনা প্রকাশিত হয়, সেই সংখ্যাতেই রামানন্দ লিখেছিলেন 'রেভারেন্ড টমসনের পণ্ডিতম্মন্যতা' নামক একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ। বলা বাহুল্য এর কোনোটিই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে রচিত হয় নি। রামানন্দ-রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন সম্পর্কের কথা মনে রাখলে ব্যাপারটা কল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয়।

১৯২৬-এর পর টমসন আর কখনো সরাসরিভাবে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের চেষ্টা করেন নি। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ক্রমশ বেড়েছে। ততদিনে টমসন ইংলন্ডে ভারতীয় ইতিহাস-বেত্তা রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন, ভারতে ও ইংলন্ডে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁর বন্ধু এবং বাংলাদেশে তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য। ১৯২৭-এর পর রবীন্দ্রনাথও দু-একটি ইতস্তত মন্তব্য ছাড়া, টমসনকে নিয়ে আর মাথা ঘামান নি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা আলাদা। ই. পি. লিখেছেন : "The tide of *Prabasi* and the *Modern Review* had set against Thompson. There was a sad moment of chill in 1930 when Thompson was in the United States and was goaded by the torrent of ill-informed American criticism into an ambivalent defence of the British record.... He was jumped upon, not for the first or last time, by Ramananda Chatterjee in the *Modern Review* for "his mischievous anti-Indian propaganda work" ' (পৃ. ৯১-৯২)।

প্রসঙ্গটি একটু বিশদ করা দরকার। ই. পি. যাকে বলেছেন, 'ill informed American criticism' তা আসলে ছিল সানডারল্যান্ড (J. T. Sunderland)- লিখিত *India in Bondage* (1927) নামক একটি বই। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার বইটি ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন কারণ সানডারল্যান্ড এই বইতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অধিকার ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছিলেন। মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকার সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সংখ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'Mr Thompson on "India in Bondage" ' শীর্ষক মন্তব্যে লিখেছিলেন : 'Mr Edward Thompson...who has been doing mischievous anti-Indian propaganda work in America... has recently contributed three articles to the London *Times* on "America and India". The last of these three articles is devoted to the criticism

of "India in Bondage" by Dr. J. T.Sunderland.... Three clippings have been sent to me... in the hope that I might answer Mr. Thompson's criticism....I, however, labour under certain difficulties. At the end of each of the three articles, there are the words, "copyright reserved. Reproductions in whole or part forbidden." This prevents the quotation from Mr. Thompson's criticisms verbatim. Another difficulty is that Dr. Sunderland's book, having been proscribed in India, is not available for reproduction of passages here।'[৫৪] তার পর চারপাতা ধরে রামানন্দ টমসনের সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন আইন বাঁচিয়ে। দেশ জুড়ে তখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বরাজের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। শুধু বাংলাদেশেই গ্রেফতার হয়েছে পনেরো হাজার সত্যাগ্রহী। পুলিশের অত্যাচারে ও নিপীড়নে জনগণ ত্রস্ত। একজন বিদেশী সাংবাদিক, ওয়েব মিলার (Webb Miller), দেখেছিলেন, এই অত্যাচার : 'Unresisting men being methodically bashed into a bloody pulp'।[৫৫] দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে রামানন্দের সমালোচনা খুব অন্যায্য বলে মনে হয় না।

দুমাস পর, মডার্ন রিভিয়ু-র নভেম্বর ১৯৩০ সংখ্যায় টমসন আবার সমালোচিত হলেন তাঁর *Reconstruction of India* (1930) পুস্তকের জন্য। পত্রিকায় এই বইয়ের যে মন্তব্যটি সবচেয়ে বেশি ভর্ৎসিত হয়েছিল সেটি এইরকম : 'Immediate full Dominion Status would merely make a fool of India, or rather put her where she cannot help making a fool of herself (and an extremely unhappy fool). Independent India would be like independent China, but far more torn and wretched, even more ridiculous a spectacle to the outside world.'।[৫৬] এই পটভূমিতে টমসন যখন ১৯৩২ সালের গোড়ায় ইঙ্গ-ভারতীয় লেখক-গোষ্ঠীর মৈত্রীসাধনের প্রয়াসে ভারতে এলেন, তখন কলকাতায় তাঁর পুরোনো বন্ধুদের কাছে তেমন উষ্ণ অভ্যর্থনা পান নি (প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবিশ অবশ্য ব্যতিক্রম)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি যেসব মন্তব্য করেছিলেন রোটেনস্টাইন ও পত্নী থিয়োডোসিয়াকে লিখিত পত্রে (যথাক্রমে ১৪ মে ১৯৩২ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২) এবং যেগুলির অংশবিশেষ ই. পি. উদ্ধৃত করেছেন (দ্রষ্টব্য পৃ. ৯২, ৯৩) সেগুলি পড়লে অবাক হতে হয়। রোটেনস্টাইনকে তিনি লিখেছিলেন : 'Tagore insisted that I was an Imperialist and had been nobbled by the India Office for anti-Indian work. Quite frankly, he has treated me pretty rottenly.... He has kept steady resentment for what he considers the "detraction" of my book....His apetite for flattery has grown to absurdity since his first success. He lives amid incense, and India outside Bengal and the Punjab half resents, half laughs at it.' (পৃ. ৯২)। এবং থিয়োডোসিয়াকে : '[Tagore] Sits in a room behind, purring as he laps up the cream of praise. We saw him, but he & I were barely on speaking terms. He slandered me all over India, & I was not going to pretend to be enthusiastic.' (পৃ. ৯৩)।

রোটেনস্টাইনকে লিখিত চিঠির শেষ পঙ্ক্তির সারবত্তা ও থিয়োডোসিয়াকে লিখিত চিঠির প্রথম পঙ্ক্তির রুচিহীনতা সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। অন্য অংশগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর ৭ মার্চ ১৯৩২-এর দিনলিপিতে প্রশান্তচন্দ্র লিখছেন : 'জোড়াসাঁকো। কলেজের পথে Thompson কে নিয়ে গেলুম। তখন বুবা [রামানন্দ-পুত্র, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়] ছিল, তাই তখন আর Thompson দেখা করলে না। দুপুরে ২টার সময়ে ফিরে এসে Thompson কে কবির কাছে বসিয়ে আমি নীচে গেলুম। আন্দাজ আধ ঘণ্টা পরে ফিরে গিয়ে দেখি যে, দুজনে বেশ ভালোভাবেই কথা বলছেন। Thompson বলছে যে, আমি জ্ঞাতসারে কখনো ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে কিছু বলি নি। আমি American Criticism যে অনেক সময়ে

unfair তা বলেছি... কবিকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, যে, তোমার সম্বন্ধে আমি কখনো disrespectfully কথা বলেছি তা হতেই পারে না কারণ আমার পক্ষে disrespectfully ভাবা অসম্ভব। আমি অনেক জিনিষ বুঝতে পারিনি হ'তে পারে। কিন্তু তাতে আমার সম্বন্ধে এরকম ধারণা কেন হ'লো। কবি বললেন, I thought you were speaking in an arrogant tone, and you could do it because I belong to a people who are not important in the affairs of the world; but I am glad to know that I was wrong. তার পরে Thompson আরও বললে, যে, Please remember I have never criticized anything disrespectfully. I must have done you injustice. This was inevitable. No one can do justice to the inner significance of a poet.... চলে আসার সময়ে কবি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন I am glad you came and I had the talk with you'।[৫৭] ১৯৩২-এর মার্চ মাসে কবির সঙ্গে যে টমসনের দেখা হয়েছিল, এই জরুরি তথ্যটি ই. পি. কোথাও উল্লেখ করেন নি।

তেইশ দিন পর, ৩০ মার্চ ১৯৩২-এর দিনলিপিতে প্রশান্তচন্দ্র আবার লিখেছেন : 'কবি আজ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা এলেন। রাত্রে অনেকক্ষণ ছিলাম। Thompson সম্বন্ধে খুব bitterly কথা বললেন, যে Horace Alexander অমিয়র কাছে Manchester Guardian থেকে cutting পাঠিয়েছে, তাতে সে অত্যন্ত বিশ্রিভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলেছে। আমি বল্‌লুম যে, সমস্ত প্রবন্ধ না পড়ে কোনো opinion form করতে পারি না। কবি রামানন্দবাবুও Thompson সম্বন্ধে কী বলেছেন তা বললেন ইত্যাদি। কবি নিজে Thompsonএর লেখা কিছু পড়েন নি। কিন্তু রামানন্দবাবুরা, যে, বলেছেন Thompson একেবারে পুরোপুরি মিথ্যেবাদী ইত্যাদি তা বিশ্বাস করেছেন দেখলুম। এ নিয়ে বেশ একটু কড়া রকম আলোচনা হ'লো। ....তারপরেই কবির বিরক্তি চলে গেল।'[৫৮]

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের প্রসঙ্গও ই. পি. তাঁর বইতে তোলেন নি। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ তারিখের ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় টমসনের যে-লেখাটি ('ভারতের চিঠি') ছাপা হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে মডার্ন রিভিয়ু-র এপ্রিল ১৯৩২ সংখ্যায় রামানন্দ একটি আলোচনা করেন। আলোচনার লক্ষ্য ছিল টমসনের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি : 'In its deeds Congress has played the fool, even the dishonest fool, and its present eclipse is well deserved'।[৫৯] বস্তুত, ১৯৩২-এ টমসনের ভারত সফরের উদ্দেশ্যকে বাংলাদেশের অনেকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। ২৩ জানুয়ারি ১৯৩২ তারিখে 'যৎকিঞ্চিৎ' শিরোনামে আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে : '...টমসন বিলাত হইতে পুনর্ব্বার এদেশে খুব একটা বড় রকমের "মিশন" লইয়া আসিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কৃতির যোগসাধন করাই নাকি তাঁহার উদ্দেশ্য! উদ্দেশ্যটা ভাল, কিন্তু টমসনের মত পল্লবগ্রাহী সেই কাজের যোগ্য বলিয়া আমরা কেহই মনে করি না। তাঁহার কোন কোন বহিতে তিনি এদেশের লোকের সম্বন্ধে যেরূপ অশ্রদ্ধার ভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এই অযোগ্যতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। কোন একজন শ্বেতাঙ্গ ভারতের নাম করিয়া একটা কিছু "মিশন" লইয়া আসিলেই এদেশের এক শ্রেণীর দাসমনোভাবগ্রস্ত লোক বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। মিঃ টমসনের আগমনে সেইসব লোক খুসী হইতে পারে বটে'।[৬০]

মনে হয় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ কথাবার্তার পর টমসন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক খানিকটা সহজ হয় ; কিন্তু রামানন্দের সঙ্গে হয় নি। ২৮ এপ্রিল ১৯৩৫ তারিখের একটি চিঠিতে টমসন রবীন্দ্রনাথের কাছে অভিযোগ করেন : '[*The Modern Review*]... has excelled itself in its latest attack on me...' (পৃ. ৯৪)। অভিযোগের অব্যবহিত কারণটি অবশ্য তুচ্ছ। মডার্ন রিভিয়ু-র এপ্রিল ১৯৩৫ সংখ্যায় এডওয়ার্ড টমসন ও জি. টি. গ্যারাট -রচিত *Rise and Fulfilment of British Rule in India* নামক পুস্তকের একটি বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি লিখেছিলেন রামানন্দ নয়, সুধীন্দ্রনাথ বসু।[৬১] কিন্তু ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে টাইম্‌স লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট পত্রে প্রকাশিত টমসনের 'A Land Made for Poetry' নামক নিবন্ধ নিয়ে যে-বিতর্কের কথা ই. পি. লিখেছেন (পৃ. ৯৪-৯৫) এটি তুচ্ছ নয়। রবীন্দ্রনাথ নাকি এই লেখা

পছন্দ করেন নি। প্রশান্তচন্দ্র টমসনকে লিখেছিলেন : 'Amiya Chakravarty had written to [Tagore] an angry letter. Amiya said many hard words about English reviewers (and I gather, you in particular). But poet told me that he did not feel much disturbed' (পৃ. ৯৯ পাদটীকা ২৫)। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অমিয় চক্রবর্তীর পত্রাবলীর মধ্যে এরকম কোনো চিঠির সন্ধান পাওয়া যায় নি। টমসনের নিবন্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কোনো মন্তব্য করেছিলেন কিনা সে-কথাও জানা যায় না। পক্ষান্তরে, ১৯৩৬-এর শেষের দিকে টমসন যখন ভারতবর্ষে আসেন, অমিয় চক্রবর্তী তখন অক্সফোর্ড থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'Edward Thompson তো ভারতবর্ষে— তাঁকে আশ্রমে একবার আপনি ডাকেন তো ভালো হয়'।[৬২] এই চিঠি পাবার আগেই অবশ্য ১৮ অক্টোবর তারিখে রবীন্দ্রনাথ টমসনকে শান্তিনিকেতনে আসার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।[৬৩] টমসন আসেন নি। ই. পি. বলেছেন : ' Thompson did not wish to break in upon him [Tagore] at a time when Nehru was known to be visiting' (পৃ. ৯৬-৯৭)। কারণটা ভিন্নও হতে পারে। নতুন ভারত-শাসন আইন প্রসঙ্গে এক খসড়া বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর চেয়েছিলেন টমসন তাঁর ১৬ অক্টোবর ১৯৩৬-এর চিঠিতে।[৬৪] রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে (২৪ অক্টোবর ১৯৩৬) জানিয়েছিলেন : 'There are sentiments in the Manifesto which are not mine… .I do not wish to be identified with any political groupings'[৬৫]। এর পরেই টমসন শান্তিনিকেতন যাবার অভিপ্রায় ত্যাগ করেন। ১৯৩৬-এর পরেও টমসন আর-একবার ভারতে এসেছিলেন ১৯৩৯ সালে— কংগ্রেস ও ব্রিটিশরাজের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে। বেশিরভাগ সময়টাই কাটিয়েছিলেন তেজবাহাদুর সপ্রু, জওহরলাল নেহরু ও গান্ধীর সাহচর্যে। কলকাতাতেও এসেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি।

টমসন-রবীন্দ্রনাথ ইতিবৃত্তের এখানেই ছেদ টানা যেতে পারে। প্রসঙ্গটি এতটা বিস্তারিত ও উদ্ধৃতি-কণ্টকিত করতে হল এই কারণে যে ওরিয়েন্টালিজমের রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের প্রশ্নটি অ-প্রমাণের প্রয়াসে ও টমসনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ-কৃত অবিচারের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ই. পি. প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীকে যেভাবে সাজিয়েছেন তাঁর বইতে, তা বড়োই একপেশে। টমসন-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কটি সেই বিন্যাসে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না।

টীকা

১. 'The Anglo-Saxon and the Hindu', মধুসূদন রচনাবলী, প্রধান সম্পাদক : অজিতকুমার ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২৪৭।
২. গীতাঞ্জলি ১০৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৮২।
৩. 'যাত্রার পূর্বপত্র', পথের সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ. ৪৬৮।
৪. 'সভ্যতার সংকট', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ. ৬৪০।
৫. Krisna Dutta and Andrew Robinson, eds., Tagore Centre, London, 1991.
৬. দ্রষ্টব্য অশোক সেন, 'ভিনদেশী প্রশস্তি', বারোমাস, শারদীয় ১৯৯৪, পৃ. ১০৪-১২০।
৭. দ্রষ্টব্য *Imperfect Encounter : Letters of William Rothenstein and Rabindranath Tagore 1911-1941*, ed., Mary M. Lago, Cambridge, Massachusetts, 1972, pp. 319-322.
৮. দ্রষ্টব্য Hugh Tinker, *The Ordeal of love : C.F. Andrews and India*, Delhi, 1979, p. 251 এবং Harish Trivedi, 'The Thompsons : Father and Son,' *Indian Review of Books*, December -January 1994, p. 2.
৯. 'The New Year', *Indian Methodist Times*, February 1913, cited in *Alien Homage*, pp. 5-6.

১০. রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত' (১৯০৯), কলকাতা ১৯৫২, পৃ. ২১-২২।
১১. বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্মৃতিচারণ, 'বাঁকুড়া খৃশ্চান কলেজ প্লাটিনাম জুবিলী স্মরণিকা', ১৯৮০, পৃ. ২৫।
১২. 'Introduction', *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist,* ed. with an introduction by Harish Trivedi, Delhi, 1991, p. a 18.
১৩. যথাক্রমে, *Gitanjali : Song-offerings* (India Society edition, London, 1912); *The Gardener* (Macmillan, London, October 1913); *The Crescent Moon* (Macmillan, London, November 1913) এবং *Sadhana* (Macmillan, London, 1913).
১৪. Tagore to Bridges, 22 March 1915, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
১৫. Tagore to Rothenstein, 4 April 1915, *Imperfect Encounter,* p. 195.
১৬. Tagore to Bridges, 9 June 1915, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
১৭. Yeats to Tagore, 31 July 1915, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
১৮. *The Oxford Book of Modern Verse,* chosen by W.B. Yeats, Oxford, 1936, p. 67.
১৯. দ্রষ্টব্য শঙ্খ ঘোষ, উর্বশীর হাসি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।
২০. যথাক্রমে, 'Tagores Poems', *Poetry,* December 1912, pp. 92-94; 'Rabindranath Tagore', *Fortnightly Review,* March 1913, pp. 571-79; 'Rabindranath Tagore : His Second Book into English', *New Freewomen,* November 1913, p. 187.
২১. 'ইংলন্ডের ভাবুকসমাজ', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬, পৃ. ৫৩৩-৫৩৯।
২২. David Perkins, *A History of Modern Poetry: From the 1890's to Pound, Eliot and Yeats,* Cambridge, Massachusetts, 1976, pp. 165-202.
২৩. দ্রষ্টব্য Rabindranath Tagore, *Nationalism,* London, 1917.
২৪. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ', শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্রসংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ. ৮৫০-৮৫১।
২৫. দ্রষ্টব্য দীনেশচন্দ্র সেন, 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য', কলকাতা, ১৯২২, পৃ. ১৯৩-১৯৮।
২৬. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত পত্রাবলী, দেশ, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২, পৃ. ২৫৩।
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫।
২৮. রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পত্র, মহীশূর, ২৪ নভেম্বর ১৯২১, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮০ শক, পৃ. ২৬৪-২৬৫।
২৯. শ্রী কখগ, 'অধ্যাপক টমসনের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', প্রবাসী, পৌষ ১৩২৮, পৃ. ৩৭৬-৩৮৮।
৩০. সত্যকিঙ্কর কবিরাজ ও নারায়ণচন্দ্র ঘোষ। দ্রষ্টব্য 'Preface', *Rabindranath Tagore : His Life and Work,* Heritage of India Series, YMCA, Calcutta 1921, p.x.
৩১. রামেন্দু দত্ত 'মহতের সহিত মুহূর্ত', যুগান্তর (রবিবাসরীয়), ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১।
৩২. Robert Bridges to Tagore, 15 June 1920, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
৩৩. Diary of Rathindranath Tagore (অপ্রকাশিত) ; ২৭ জুন ১৯২০ তারিখের দিনলিপি। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
৩৪. দেশ, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২, পৃ. ২৫৪।
৩৫. দ্রষ্টব্য, তরুণদেব ভট্টাচার্য, বাঁকুড়া : পশ্চিমবঙ্গ-দর্শন ২, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৫৩-১৫৪।
৩৬. দ্রষ্টব্য, Edward Thompson, *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist,* London, 1926, p. 278, fn.2.
৩৭. Tagore to Andrews, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
৩৮. Tagore to Andrews, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
৩৯. *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist.* p.278.

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭।
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮।
৪২. দ্রষ্টব্য, William Rothenstein, *Since Fifty : Men and Memories, 1922-1928*, London, 1939, p. 45। রোটেনস্টাইন ভুল করে তাঁর বইতে উল্লেখিত চিঠির তারিখ দিয়েছেন 16 March 1931; হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হটন লাইব্রেরিতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির তারিখ ১৬ মার্চ ১৯২৭।
৪৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ৩, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ৩০৭-৩০৮।
৪৪. 'রেভারেন্ড টমসনের পণ্ডিতম্মন্যতা', প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃ. ৫১৮-৫২১ এবং 'Mr. Thompson's Book on Rabindranath Tagore', The Modern Review, July 1927, pp. 99-102.
৪৫. 'টমসনের রবীন্দ্রনাথ', বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ. ৩৬৮-৩৭৯।
৪৬. C.F. Andrews to Rabindranath Tagore, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
৪৭. নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ ; রোটেনস্টাইনকে লিখিত পত্র, *Imperfect Encounter*, pp. 320-322.
৪৮. চিঠিপত্র ১২, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১০১।
৪৯. William Radice, *Rabindranath Tagore : Selected Poems*, Harmondsworth, Middlesex, 1985, pp. 7-8.
৫০. নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, রায়বাহাদুর, 'রবীন্দ্রনাথের সহিত কথোপকথন', দ্বিতীয় দিন, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ (১৮ মে ১৯২৭), প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ. ৬৫৯।
৫১. বাক্যটি এই : 'ভারতের উন্নতিসাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে কথা স্বয়ং খৃষ্টান পাদ্রি টম্‌সন্ অতি করুণ স্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েছেন', চিঠিপত্র ১২, পৃ. ১৩৮।
৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩।
৫৩. শারদীয়া দেশ ১৩৭২, পৃ. ১৫-২২।
৫৪. *The Modern Review*, September 1930, p. 352.
৫৫. দ্রষ্টব্য, Sumit Sarkar, *Modern India* : 1885-1947, Madras 1983, pp. 289-290.
৫৬. *The Modern Review*, November 1930, pp. 40-41.
৫৭. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ডায়েরি (অপ্রকাশিত), পৃ. ১০-১১, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ। 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ২৮. শ্রাবণ ১৪০২, পৃ. ৫৭-৮৪-তে প্রশান্তচন্দ্রের দিনলিপি প্রায় এক বছরের (৩০ জানুয়ারি ১৯৩২ - ১১ ডিসেম্বর ১৯৩২) ছাপা হয়েছে।
৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।
৫৯. 'Mr. E. J. Thompson's Latest Role', *The Modern Review*, April 1932, p. 474.
৬০. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৩ মার্চ ১৯২২ - ২১ মার্চ ১৯৩২, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৯৬।
৬১. *The Modern Review*, April 1935, pp. 467-468.
৬২. কবির চিঠি কবিকে : রবীন্দ্রনাথকে অমিয় চক্রবর্তী : ১৯১৬-১৯৪১, সম্পাদনা নরেশ গুহ, দেশ, ২৫ জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৭৪-৭৫।
৬৩. Tagore to Edward Thompson, 18 October 1936, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
৬৪. Thompson to Tagore, 16 October 1936, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।
৬৫. Tagore to Thompson, 24 October 1936, রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার। বাঁকুড়ার : অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, অধ্যাপক তারাপদ ধর, রেভারেন্ড এস. কে. কিসকু, শৈলেন দাস ও গৌতম দে। এবং অনাথনাথ দাস, আশিস্ হাজরা ও রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতীর সহকর্মীবৃন্দ।

রবীন্দ্রসংগীতের রূপকল্পনা : একটি দিক

অনন্তকুমার চক্রবর্তী

> In my young days, I owed everything to models : without constant contact with admired examples I scarcely ventured on a single step ; and yet with time I have come to feel that the whole essence of art is in their deliberate abandonment, in the leap in the dark, the possibility of achieving the new.
>
> —Thomas Mann, *A Sketch of My Life*, London, 1961, pp. 67-68.

> হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন, সেই ডিক্‌টেটার্‌দের আমি মানি নে। যাঁরা বলেন ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ তার স্থান নেই–ঐখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নিন্দোক্তি যাঁরা স্পর্ধা-সহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম।'
>
> —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুর ও সংগতি', সংগীতচিন্তা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯২, পৃ ১৩০।

'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো', প্রার্থনা জানিয়েছিলেন কবি। কিন্তু আমাদের এই খিন্ন জীবনে যখন সকল মাধুরী লুপ্ত হয়ে আসে তখন তাঁর অনুপম গানগুলিই সেই করুণাধারা। তথাপি যা-কিছু আমাদের আনন্দ দেয়, আমাদের আত্মসংবিৎকে জাগিয়ে তোলে, তাকে নিয়ে কোনো বিচার চলে না এই মনোভঙ্গি বোধহয় খুব শ্রদ্ধেয় নয়। বরং আনন্দের প্রাথমিক উপলব্ধি যেখানে পরবর্তী বিচারের দ্বারা পুষ্ট সেখানে সৌন্দর্যের এমন সব নতুন নতুন অভিব্যক্তি উন্মোচিত হতে পারে যা ইতিপূর্বে অনাবিষ্কৃতই ছিল। হয়তো তার পরেও কিছু রহস্য রহস্যই থেকে যায়। তখন নতুন বিচার ও নতুন উপলব্ধির পালা।

সুখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর সৃষ্টিরহস্যের কিছু কিছু সন্ধান আমাদের দিয়ে গেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার রায়ের আলোচনাও আমাদের কিছুদূর পথ দেখায়। কিন্তু পথের শেষ কোথায় ? আর ধূর্জটিপ্রসাদের এ-আক্ষেপ তো আজও অনেকাংশে সত্য যে 'ভারতীয় সংগীতে musical criticism নেই বললেই হয়।' আধুনিক সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, 'রবীন্দ্রসংগীত গবেষণায় অরুণ ভট্টাচার্য, সন্‌জীদা খাতুন রূপের দিকে যতোটা অভিনিবিষ্ট হলেন, এই শিল্পের ভাবাত্মার দিকে ততোটা ঘনিষ্ঠ হন নি। পক্ষান্তরে শঙ্খ ঘোষ বা অলোকরঞ্জন এর ভাবাত্মার সন্নিহিত হতে যতোটা ব্যগ্র এর সাংগীতিক রূপ বিচারে ততোটা অগ্রসর নন। এই দুটো কাজ এখনো ভাগ হয়েই রয়েছে।'[১] এখানে খুব সীমাবদ্ধভাবে হলেও একটা প্রাথমিক ঐক্যসাধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে স্মরণ করতেই হয় যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দুই খণ্ডের 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী' রবীন্দ্রসংগীতের পর্ব-বিভাগে আমাদের দারুণভাবে সাহায্য করে এবং তারও আগে শান্তিদেব ঘোষের বিখ্যাত গ্রন্থটি থেকে আমরা জেনে গেছি, রবীন্দ্রসংগীতের সামাজিক ও সাংগীতিক পটভূমিটি কী, তার বিভিন্ন দেশি-বিদেশি, ক্ল্যাসিক্যাল ও লৌকিক উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্যই বা কোথায়। সর্বোপরি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দুটি পথনির্দেশ, অন্তত বর্তমান প্রসঙ্গে, বিশেষভাবে স্মরণীয় :

১. '...সমস্ত বদল হবে তার আদিপ্রকৃতির উপর ভর দিয়ে।
গান সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। ভারতবর্ষের বহু-যুগের-সৃষ্টি-করা যে সংগীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়?' (সংগীতচিন্তা, পৃ. ১৩০)।
২. '...সংগীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক, অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলি নে। কিন্তু একেবারেই ঠাট বজায় না রাখি যদি তবে সেটা পাগলামি হয়ে দাঁড়ায়' (সংগীতচিন্তা, পৃ. ১২৯)। অন্যত্র : 'দেখিলাম তাদের [রাগরাগিণীর] খাঁচাটা এড়ানো চলে, কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে।' (সংগীতচিন্তা, পৃ. ৫৫)।

এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি ধূর্জটিপ্রসাদের এই অসামান্য উক্তিটি যে 'একজন বড়ো শিল্পী নিজের শিল্পীজীবনে শিল্পের গোটা ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটান, আবার তাকে বিকাশের পরবর্তী স্তরেও এগিয়ে দেন।' (*Rabindranath Tagore, A Centenary Volume : 1861-1941*, Sahitya Academy, 1961, অনুবাদ লেখকের)।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত স্বরবিতানের ১৯টি খণ্ডে রবীন্দ্রসংগীতের রাগ ও তালের নির্দেশ আছে। খণ্ডগুলি হল ৪, ৮, ৯, ১০, ২০, ২২-২৯, ৩২, ৩৫-৩৮ ও ৪৫। বাকিগুলিতে রাগ-তালের নির্দেশ প্রায়শ নেই। স্বামী-প্রজ্ঞানানন্দের 'সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান' বইয়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে (লেখক বীরেন্দ্রনাথ সরকার) উক্ত খণ্ডসমূহের অন্তর্ভুক্ত ৫৪৬টি গানের বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত রাগরাগিণীর সংখ্যা ১১৬। অবশ্য এর মধ্যে কীর্তন, বাউল, ভজন, ধুন, মিশ্র ইত্যাদিকেও ধরা হয়েছে এবং ১৩৪টি গান আবার মিশ্র রাগে। মোট ১১৬টি রাগের মধ্যে ৫২টি ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র একটি করে গানে, ১০টি ব্যবহৃত হয়েছে দুটি করে গানে এবং ১২টি ব্যবহার করা হয়েছে তিনটি করে গানে। অপর পক্ষে 'ভৈরবী, বেহাগ, ইমন-কল্যাণ, খাম্বাজ, বাহার— এই কয়টি রাগরাগিণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব ছিল। দেশ, রামকেলি, কেদারা, ছায়ানট, বিভাস, যোগীয়া, সাহানা, সিন্ধুও বেশ প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলার নিজস্ব সম্পদ বাউল ও কীর্তনও রবীন্দ্রনাথের গানে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।' রবীন্দ্রসংগীতের সাধারণ শ্রোতাদের কাছে উপরি-উক্ত সংখ্যাগুলি পরিচিত না হলেও মূল ঝাঁকগুলির কথা বোধহয় অজ্ঞাত নয়। লক্ষ করতে হবে, এই বিশেষ রাগগুলির নামোল্লেখের মধ্যে 'কাফি' রাগটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, যদিও তালিকায় আছে কাফি রাগে গানের সংখ্যা ৮, কাফি-সিন্ধুতে ৭ এবং সিন্ধুতে ৯। তৎসহ কাফি-কানাড়া, সিন্ধু-খাম্বাজ, সিন্ধু-বাঁরোয়া এবং সিন্ধুড়ার স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে কাফি রাগটিকে আশ্রয় করে আলোচনাকে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। রবীন্দ্রসংগীত কতটা রাগাশ্রিত এটা দেখানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। মুখ্য উদ্দেশ্য দেখানো, রাগ-বিশেষের স্বর-সমন্বয়কে মোটের ওপর মেনে নিয়েও কীভাবে রবীন্দ্রনাথ অবলীলাক্রমে রাগবহির্ভূত স্বরকেও ব্যবহার করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত যা 'হয়ে উঠেছে' তা রাগরাগিণীর সামান্যীকৃত রূপমাত্র নয়, তা নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে থেকেও বিশিষ্ট, একক ও স্বতন্ত্র। ইতিপূর্বে ভৈরবী বেহাগ ইমন ইত্যাদি নিয়ে কেউ কেউ কিছু কথা বলেছেন, কাফি নিয়ে বিশেষ আলোচনা কোথাও নজরে আসে নি। এখানে লেখকের বিশেষ নিবেদন এই যে সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য দেখাতে হলে কোনো একটা পয়েন্ট অব রেফারেন্স দরকার হয়। কাফি রাগ এখানে সেই পয়েন্ট অব রেফারেন্স। অন্যথা রবীন্দ্রসংগীত যে রাগ-সংগীত এটা প্রতিপন্ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কেননা সেটা সত্য নয়— বিশেষ করে তাঁর উত্তর-জীবনের গানগুলি।

কিন্তু সর্বাগ্রে কাফি রাগের একটু বিস্তৃত পরিচয় নেওয়া উচিত। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর 'হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি'-র দ্বিতীয় খণ্ডে (বাংলা সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৭) কাফি রাগের স্বরূপ-প্রকাশক কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে, তার মধ্যে 'রাগচন্দ্রিকা'র শ্লোকটি বেশ সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য। সেটি এই :

মৃদু গমৌ রিধৌ তীব্রাবুভৌ নী পঞ্চমোহংশকঃ।
যত্র ষড়্‌জস্তু সম্বাদী কাফী সা নিশি গীয়তে॥

এর অর্থ, গা ও মা মৃদু অর্থাৎ কোমল ; মা কোমল বলার অর্থ তীব্র নয়, কাজেই শুদ্ধ ; দুই নি— কোমল ও শুদ্ধ ; পঞ্চম (পা) স্বরটি অংশ অর্থাৎ বাদী, আর ষড়্‌জ সম্বাদী। রাগটি রাত্রিকালে গেয়। ভাতখণ্ডে-নির্দেশিত দশ ঠাটের অন্যতম হচ্ছে কাফি, যার স্বর-সমন্বয় স র জ্ঞ ম প ধ ণ র্স। এই ঠাটের অন্তর্ভুক্ত যতগুলি রাগ আছে, বোধহয় অন্য কোনো ঠাটেই তা নেই। তা ছাড়া রাগ হিসেবেও কাফি অত্যন্ত বিস্তৃত রাগ। এই রাগে ধ্রুপদ শোনা গেলেও খেয়াল প্রায় শোনাই যায় না, আর এর সবচেয়ে ব্যাপক প্রয়োগ টপ্পা ও ঠুংরিতে এবং পুরোনো বাংলা গানে। সেখানে রাগের বিশুদ্ধতা নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না, তবু সাধারণ ভাবটা থেকেই যায়। কাফির সঙ্গে শৃঙ্গার-রসের একটা সংস্কার জড়িয়ে আছে। ভাতখণ্ডেজীর আলোচনা থেকে আরও জানা যায় :

১. কাফি রাগটি কাফি ঠাট থেকে উৎপন্ন 'ঠাট রাগ', বা 'আশ্রয় রাগ' বা 'জনক রাগ' ; এই রাগে গান্ধার ও নিষাদ কোমল, বাকি স্বরগুলি শুদ্ধ।
২. এর বাদী স্বর পঞ্চম ও সম্বাদী ষড়্‌জ। কোনো কোনো গুণীজন গান্ধার ও নিষাদকে সম্বাদী বলে মানেন। (রবীন্দ্রলাল রায়ের ['রাগ-নির্ণয়'] মতে, 'রি বাদী ও প সম্বাদী'।)
৩. এর জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।
৪. আরোহে তীব্র (শুদ্ধ) গান্ধার ও তীব্র (শুদ্ধ) নিষাদ অনেকবার প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই স্বরগুলির যথার্থ প্রয়োগে রাগের বৈচিত্র্য অনেক বেড়ে যায়, তবে এগুলি রাগের নিয়মিত স্বর নয়। (পণ্ডিত বিনায়ক পটবর্ধনের মতে, ['রাগ-বিজ্ঞান' তৃতীয় খণ্ড] 'শুদ্ধ গান্ধার ঔর শুদ্ধ নিষাদ কা প্রয়োগ অবরোহ মে হী বক্ররূপ সে কিয়া জাতা হৈ। কাফী কে ইস স্বরূপ কো মিশ্র কাফী কহতে হৈ।')
৫. কখনো কখনো কোমল ধৈবত প্রয়োগ করেও নিপুণ গায়ক রাগ হানি হতে দেন না, কিন্তু এর প্রয়োগ গায়কের (রচয়িতারও) কুশলতার ওপর নির্ভর করে।
৬. সাধারণ শ্রোতাগণ সাসা, রারা, জ্ঞাজ্ঞা, মামা, পা এই বিশিষ্ট স্বরসমাবেশ (পকড়) থেকে মুহূর্তের মধ্যে এই রাগটিকে চিনে নিয়ে থাকেন। (রবীন্দ্রলাল রায় 'বিশেষ তান' হিসেবে দেখিয়েছেন রা জ্ঞা সা রা পা এই সুন্দর বিন্যাসটি।)

দেখা যাচ্ছে, কাফি রাগটির পরিচয় নিয়ে খুব বেশি মতপার্থক্য নেই। প্রধান কথা হল দুটি : ক. এই সম্পূর্ণ জাতির রাগটির গান্ধার ও নিষাদ কোমল, অন্য স্বরগুলি শুদ্ধ, আর খ. মাঝে মাঝে শুদ্ধ গান্ধার শুদ্ধ নিষাদও ব্যবহৃত হয়ে থাকে বৈচিত্র্যসাধনের জন্যে।

কিন্তু মুশকিল বাধে যখন এইসঙ্গে 'সিন্ধু' রাগটিকেও স্মরণ করি। কারণ 'রাগ-নির্ণয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয় জানাচ্ছেন : 'অনেকে একে [কাফি রাগকে] সিন্ধু বলেন। সম্ভবত 'সৈন্ধবী' নাম থেকে 'সিন্ধু' এসেছে। আসলে বর্তমান কাফিকে 'সিন্ধু' অথবা 'সৈন্ধবী' বলাই ঠিক কারণ শাস্ত্রোক্ত সৈন্ধবী রাগের সঙ্গে বর্তমান কাফি মেলে।' অপর পক্ষে ভাতখণ্ডেজী 'সিন্ধ' নামে এক 'ক্ষুদ্রগীতিক' রাগের উল্লেখ করেছেন যাতে দুই গান্ধার প্রযুক্ত হয় এবং ঋষভও হয় প্রবল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর 'রাগ-রূপায়ণ' গ্রন্থে ভাতখণ্ডেজীর উল্লেখ করে লিখছেন 'পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেছেন, তিনি সেতারে বোম্বাই অঞ্চলে প্রচলিত সিন্ধ্ নামক রাগের একখানি গৎ লিখেছিলেন, এর সরগমও তিনি দিয়েছেন। আমরা জানি এই ধরনের গৎ ইমদাদখানি সেতার ঘরাণায় প্রচলিত আছে, কিন্তু তার নাম সিন্ধু নয়, সিন্ধু-খাম্বাজ। এইটেই সিন্ধু ভৈরবী কিনা জোর করে বলা যায় না।' এই সিন্ধু-ভৈরবীর পরিচয় দিতে গিয়ে সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় বলছেন, 'সিন্ধু বা সিন্ধুড়া আর ভৈরবী মিলিয়ে এই রাগ কল্পিত।' কাজেই তাঁর মতে 'সিন্ধু' আর 'সিন্ধুড়া' একই রাগ। কিন্তু ভাতখণ্ডেজীর গ্রন্থ অনুযায়ী 'সিন্ধ' আর 'সিন্দুরা' স্বতন্ত্র রাগ, স্বতন্ত্রভাবে তাদের পরিচয়

দেওয়া আছে, এবং 'সিন্দুরা'র অপর নাম 'সৈন্ধবী' : এটি একটি কাফি-ঠাট-ভুক্ত ঔড়ব-সম্পূর্ণ-রাগ, এর আরোহে গান্ধার ও নিষাদ বর্জ্য, যদিও নিষাদ বর্জিত রাখার বিষয়ে মতভেদ আছে, আর অবরোহ সম্পূর্ণ, অর্থাৎ কাফির মতোই। পটবর্ধনজী 'সিন্দুরা' সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলেছেন, শুধু যোগ করেছেন এইটুকু যে 'ঋষভ পর অবরোহমে কম ঠাহরানা চাহিয়ে। অধিক ঠাহরনে সে কাফী হী হো জায়েগা।' তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম :

রবীন্দ্রলাল রায়ের মতে : কাফি = সিন্ধু = সৈন্ধবী ;
সুরেশ চক্রবর্তীর মতে : সিন্ধু = সিন্ধুড়া ;
ভাতখণ্ডের মতে : ক. সৈন্ধবী = সিন্দুরা, কিন্তু
খ. সিন্ধ একটু স্বতন্ত্র রাগ, আর
গ. কাফি তো আলাদা রাগ বটেই।

এ থেকে আমার মতো স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন লেখকের পক্ষে সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন। শুধু মিলের ক্ষেত্র আছে দুটি : ক. কাফির রাগ-পরিচয় সম্বন্ধে সকল মহাজনের সিদ্ধান্ত প্রায় এক, এবং খ. সিন্ধুড়া সম্পর্কেও সকল মহাজনের সিদ্ধান্ত মোটামুটি এক। রবীন্দ্রসংগীতে যাকে 'সিন্ধু' বলে ধরা হয়েছে তা কি আসলে ওই সিন্ধুড়া ? এরকম সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যুক্তি আছে দুটি। প্রথমত, রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন আলোচনায়, বিশেষ করে ইন্দিরা দেবীর 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' বইয়ে, সিন্ধু ও সিন্ধুড়ার স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, কাফির দৃষ্টান্ত আরও স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, সিন্ধু-রাগে সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীত 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ'-এর সঙ্গে সিন্ধুড়ার কিছুটা মিল থাকলেও পুরোপুরি মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য ধ্রুপদ-খেয়াল ছাড়া অন্য যে-কোনো গানে (বা ধুনে) শাস্ত্রীয় রাগলক্ষণ সর্বদা অবিকৃত রাখতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, রবীন্দ্রসংগীতে তো অবশ্যই নেই। তথাপি, সকলেই জানেন, 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ' গানটি একটি 'ভাঙা গান', এর পুরোবর্তী আদর্শ 'মুরলীধুনি শুনি'। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' অনুযায়ী এর রাগ ও তাল যথাক্রমে সিন্ধু ও ঝাঁপতাল। এই মূল গানটি সম্পর্কে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে শুনেছি, এটি রাগ সিন্ধুড়ায় গাওয়া হয়। কিন্তু বিজয় কিচলু মহাশয়ের মুখে গানটি যেভাবে ক্যাসেটে ধরা আছে (ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী: 'রূপান্তরী'—এইচ. এম. ভি. ক্যাসেট) সেটি পুরোপুরি সিন্ধুড়া কিনা সন্দেহ, যদিও মিল আছে যথেষ্ট। সিন্ধুড়া ছাড়া সিন্ধু-রাগের অন্য কোনো 'স্বতন্ত্র' শাস্ত্রীয় রূপ থাকলে বর্তমান লেখকের তা অজ্ঞাত— শুধু ভাতখণ্ডের বইয়েতেই 'সিন্ধ' রাগের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে। তবে কাফি, সিন্ধু, সিন্ধুড়া— সবই কাফি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত, এবং শেষোক্ত দুটি রাগ ভিন্ন হোক বা অভিন্ন হোক, মূল আশ্রয় রাগ (কাফি) থেকে খুব দূরবর্তী নয়, এ-কথা বোধহয় নিঃসংকোচে বলা যায়। অতএব বর্তমান আলোচনার বিশেষ ক্ষেত্রে :

১. 'স্বরবিতান'-এর নির্দেশকেই অনুসরণ করা হচ্ছে। সেখানে গানগুলিকে কাফি বা সিন্ধুরাগের গান বলে যেভাবে চিহ্নিত করা আছে তাদের সেই পরিচয়েই গ্রহণ করা হচ্ছে, এবং সিন্ধু রাগের গানগুলিকে বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্র থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।
২. যে গানগুলি রাগ-চিহ্নিত নয় তাদের ক্ষেত্রে কাফির অনুরূপ স্বরবিন্যাস পেলে তাদের কাফি বলেই ধরা হবে। সে ক্ষেত্রে কাফি ও সিন্ধুর স্বতন্ত্র শাস্ত্রগত পরিচয় ধর্তব্য হবে না।

নীচে আমরা কাফি-রাগাশ্রিত রবীন্দ্রসংগীতের একটি তালিকা দিচ্ছি। এই তালিকা দুটি অংশে বিভক্ত : ক ও খ। ক-অংশে আছে কবির ৪৮ বছর বয়স পর্যন্ত কালের রচনা, খ-অংশে পরবর্তীকালের। এই বিভাজনের কারণ : ৪৮ বছর বয়স পর্যন্ত কালের রচনাগুলিতে সাধারণত রাগ-তালের নির্দেশ পাওয়া যায়, বাকিগুলোতে সাধারণত তা নেই। মোটের ওপর বলা যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কালানুক্রমিক সূচী'র দুটি খণ্ডকেই (প্রথম: ১৩৮০, দ্বিতীয় : ১৩৮৫) দুই বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে—মাত্র ৫টি 'খ'-শ্রেণীভুক্ত গান প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত।

	গান		স্বরবিতান-খণ্ড		বয়স
	(ক)				
১.	তুই রে বসন্ত সমীরণ	...	২০	...	২০
২.	কেহ কারো মন বোঝে না (সিন্ধু কাফি)	...	৩২	...	২২
৩.	মাঝে মাঝে তব দেখা পাই	...	২৩	...	২৩
৪.	তারো তারো হরি দীন জনে	...	২৫	...	২৪
৫.	কেন চেয়ে আছো গো মা	...	৪৭	...	২৫
৬.	আছ অন্তরে চিরদিন	...	২২	...	২৬
৭.	কাছে আছে দেখিতে না পাও	...	৪৮	...	২৭
৮.	ভালোবেসে যদি সুখ নাহি	...	৪৮	...	২৭
৯.	সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল	...	৪৮	...	২৭
১০.	মন যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি	...	১০	...	৩৬
১১.	প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী	...	২৬	...	৩৯
১২.	শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ	...	৪	...	৪১
১৩.	যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ	...	২২	...	৪৩
১৪.	যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু	...	৩৮	...	৪৮
	(খ)				
১৫.	মম চিত্তে নিতি নৃত্যে	...	৪২	...	৪৯
১৬.	আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা	...	৪২	...	৪৯
১৭.	তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে	...	৫২	...	৫০
১৮.	ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে	...	৫২	...	৫০
১৯.	হার মানা হার	...	৩৯	...	৫১
২০.	আমার ব্যথা যখন আনে আমায়	...	৩৯	...	৫২
২১.	বসন্তে আজ ধরার চিত্ত	...	৩৯	...	৫২
২২.	তোমার পূজার ছলে তোমায়	...	৪১	...	৫২
২৩.	তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে	...	৪১	...	৫২
২৪.	কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না	...	৪১	...	৫২
২৫.	আমার হিয়ার মাঝে	...	৪১	...	৫২
২৬.	এই কথাটাই ছিলেম ভুলে	...	৭	...	৫৩
২৭.	পথ দিয়ে কে যায় গো চলে	...	৭	...	৫৩
২৮.	তুমি কি কেবলই ছবি	...	৩০	...	৫৩
২৯.	এরে ভিখারি সাজায়ে	...	৪০	...	৫৩
৩০.	যখন তুমি বাঁধছিলে তার	...	৪৩	...	৫৩
৩১.	হৃদয় আমার প্রকাশ হল	...	৪৩	...	৫৩
৩২.	একদা তুমি প্রিয়ে	...	১৬	...	৫৬
৩৩.	সে যে বাহির হল আমি জানি	...	৩৪	...	৫৭
৩৪.	অকারণে অকালে মোর	...	৩৪	...	৫৭
৩৫.	সময় আমার নাই যে বাকি	...	৩৩	...	৫৮

	গান		স্বরবিতান-খণ্ড		বয়স
৩৬.	আমার অভিমানের বদলে আজ	...	৪২	...	৫৮
৩৭.	ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের	...	১৪	...	৬০
৩৮.	আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার	...	১৫	...	৬১
৩৯.	আজ আকাশের মনের কথা	...	১৫	...	৬১
৪০.	বাদলধারা হল সারা	...	১৫	...	৬১
৪১.	পুব সাগরের পার হতে	...	১৫	...	৬১
৪২.	না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো	...	৬	...	৬১
৪৩.	যদি তারে নাই চিনি গো	...	৬	...	৬১
৪৪.	তোমায় গান শোনাব	...	৩০	...	৬১
৪৫.	আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল	...	১	...	৬২
৪৬.	আঁধার রাতে একলা পাগল	...	১	...	৬২
৪৭.	ও আমার ধ্যানেরই ধন	...	২	...	৬২
৪৮.	আজি সাঁঝের যমুনায় গো	...	৩	...	৬২
৪৯.	যখন এসেছিলে অন্ধকারে	...	৩০	...	৬২
৫০.	যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়	...	৩০	...	৬২
৫১.	ছায়া ঘনাইছে বনে বনে	...	৩০	...	৬২
৫২.	পুব হাওয়াতে দেয় দোলা	...	৩০	...	৬২
৫৩.	ভেবেছিলেম আসবে ফিরে	...	৩১	...	৬২
৫৪.	ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার	...	১	...	৬৩
৫৫.	আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার	...	৩০	...	৬৩
৫৬.	পাগল যে তুই কণ্ঠ ভরে তাই	...	৩১	...	৬৩
৫৭.	ওকে বাঁধিবি কে রে	...	১	...	৬৪
৫৮.	ওই মরণের সাগর পারে	...	২	...	৬৪
৫৯.	আমার ঢালা গানের ধারা	...	৩	...	৬৪
৬০.	সে কোন্ পাগল যায় পথে	...	৩	...	৬৪
৬১.	ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই	...	৩	...	৬৪
৬২.	ফাগুনের নবীন আনন্দে	...	৫	...	৬৪
৬৩.	বিরস দিন বিরল কাজ	...	৫	...	৬৪
৬৪.	হে মহাজীবন, হে মহামরণ	...	৫	...	৬৪
৬৫.	যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি	...	৩০	...	৬৪
৬৬.	এ পারে মুখর হল কেকা ওই	...	৩০	...	৬৪
৬৭.	যেতে দাও গেল যারা	...	৩১	...	৬৪
৬৮.	ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার	...	৩১	...	৬৪
৬৯.	জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার	...	২	...	৬৫
৭০.	দিনশেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল বলে	...	২	...	৬৬
৭১.	তুমি আমায় ডেকেছিলে	...	৩	...	৬৬
৭২.	তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে	...	১৩	...	৬৬

	গান	স্বরবিতান-খণ্ড	বয়স
৭৩.	ওই শুনি যেন চরণধ্বনি রে	... ৩১	... ৬৭
৭৪.	আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে	... ১	... ৬৮
৭৫.	চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে	... ১	... ৬৮
৭৬.	সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা	... ৫	... ৬৯
৭৭.	পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়	... ৫৬	... ৭২
৭৮.	কাছে থেকে দূর রচিল	... ১	... ৭৩
৭৯.	নারীর ললিত লোভন লীলায়	... ১৭	... ৭৪
৮০.	আমি তোমারে করিব নিবেদন	... ১৭	... ৭৪
৮১.	পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ	... ৫৪	... ৭৪
৮২.	ওই মালতীলতা দোলে	... ৫৪	... ৭৫
৮৩.	শুভ কর্মপথে ধরো	... ৪৭	... ৭৫
৮৪.	মেঘছায়ে সজল বায়ে	... ৫৮	... ৭৬
৮৫.	ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী	... ৫৯	... ৭৬
৮৬.	ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে	... ৬১	... ৭৭
৮৭.	ফিরে যাও কেন, ফিরে ফিরে চাও	... ১৯	... ৭৭
৮৮.	ন্যায়-অন্যায় জানি নে	... ১৯	... ৭৭
৮৯.	আমার প্রিয়ার ছায়া	... ৫৮	... ৭৭
৯০.	আমার আপন গান	... ৫৯	... ৭৭
৯১.	প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে	... ৫৯	... ৭৭
৯২.	দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে	... ৬০	... ৭৮
৯৩.	বাণী মোর নাহি	... ৬৩	... ৭৮
৯৪.	দোষী করিব না তোমারে	... ৬৩	... ৭৮
৯৫.	তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে	... ৫৯	... ৭৮

আর-একটি গান আছে 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ'। 'ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি-৫' (বৈশাখ ১৩১৬)-এ উল্লেখ ছিল এর রাগ সিন্ধু-কাফি, কিন্তু 'স্বরবিতান' (২৫)-এ গানটির রাগ উল্লেখ আছে সিন্ধু, তাই গানটিকে বর্তমান তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'চিরকুমার-সভা'তে একটি গান আছে 'নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ' (স্বরবিতান ৩৩ দ্রষ্টব্য), রচনাকালে কবির বয়স ছিল ৩৯। যদিও গানটির রাগ-তালের উল্লেখ নেই, তবু গানটিকে বর্তমান তালিকার অন্তর্ভুক্ত ধরে নেওয়াই সমীচীন মনে হয়। সেই হিসেবে তালিকাভুক্ত গানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬। তালিকাটি প্রমাদশূন্য এমন দাবি লেখকের নেই। ভ্রান্তি আসতে পারে দু দিক থেকে : ১. এমন গান এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল না, এবং ২. এমন গান বাদ গেছে যা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। লেখক সমগ্র তালিকাটিকে একটি প্রাথমিক খসড়া হিসেবেই ধরে নিচ্ছেন, অবশ্যই তা সংশোধনযোগ্য। যোগ্যতর ব্যক্তির হাত দিয়ে কাজটি সম্পন্ন হলে তালিকা নিশ্চয়ই আরও ত্রুটিশূন্য হত। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সংশোধন সর্বতোভাবে কাম্য। আপাতত সংখ্যাটিকে যদি সঠিক ধরে নিই এবং রবীন্দ্রনাথের গানের মোট সংখ্যা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হিসেব অনুসারে যদি ধরে নিই ২২৩২, তা হলে বর্তমান গণনানুযায়ী কাফি-রাগাশ্রিত গান হল মোট গানের শতকরা ৪.৩ ভাগ। এটি মোটেই নগণ্য নয়।

পরবর্তী আলোচনায় যাবার আগে রবীন্দ্রসংগীতের, বিশেষত তাঁর উত্তরজীবনের (বিশেষ করে 'গীতাঞ্জলি'

ও তৎপরবর্তী কালের), গানগুলির সাধারণ কাঠামোটিকে একটু পর্যালোচনা করে নেওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, এখানে লেখককে তাঁর অন্যত্র আলোচিত কয়েকটি প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ করতে হচ্ছে, অন্যথা বর্তমান প্রবন্ধটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যাবে না। রবীন্দ্রজীবনের গোড়ার দিকেই তৈরি হয়ে উঠেছিল একটি ধ্রুপদী সংস্কার, এ-কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। এখান থেকে তিনি যে শুধু রাগ-তালের ঐশ্বর্যই অর্জন করেছিলেন তা নয়। তাঁর উত্তরপর্বের গানে একদিকে গড়ে উঠেছিল লোকসংগীত-সুলভ সারল্য ও খোলামেলা মেজাজ, অন্য দিকে মিশেছিল ধ্রুপদ গানের যেটা চরম শিক্ষা— তার বিপুলতা ও গভীরতা, সঙ্গে সঙ্গে তার 'আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা'— যা 'দুর্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ' করে। তাঁর অধিকাংশ গানেই তৈরি হয়ে উঠেছিল একটি চার-তুকে বিভক্ত ধ্রুপদী ছক, যাকে আবার মোটের ওপর দুই সমান অংশে ভাগ করেও দেখানো যায়: প্রথম অংশে আস্থায়ী-অন্তরা, দ্বিতীয় অংশে সঞ্চারী-আভোগ। এতে একটা চমৎকার কাঠামোগত ভারসাম্যও ধরা পড়ে। রবীন্দ্রসংগীতে এটাই প্রধান আদল বা 'মডেল'। রবীন্দ্রনাথের আগে বা পরে অন্য কেউ এ 'মডেল' ব্যবহার করেন নি তা নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে এটা ক্রমশ একটা প্রধান রীতিতে পরিণত হওয়ার পরেই পরবর্তীরা সাধারণত তাকে অনুসরণ করেছেন— পূর্বসূরীদের মধ্যে এই রীতি অনেকটা কম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও পূর্বজীবনে ধ্রুপদের সঙ্গে সংযোগ যখন আরও প্রত্যক্ষ ছিল তখন বরং এই 'মডেল' সর্বত্র অনুসৃত হয় নি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে, ধ্রুপদের প্রভাব যখন অনেক কম প্রত্যক্ষ, তখনই এই 'মডেল' আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। কাজেই এটাকে বলতে পারি তাঁর ধ্রুপদী শিক্ষার অপ্রত্যক্ষ কিন্তু দীর্ঘ-মেয়াদি ফল।

এখন, এই চারটি তুককে (স্তবককে) ধ্রুপদী সংগীতে কীভাবে ব্যবহার করা হয় দেখা যাক। আমরা এখানে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'গীতসূত্রসার'কেই প্রধানত অনুসরণ করছি। আস্থায়ীই সুরের (রাগের) আরম্ভ, স্থিতি ও পুনরাবৃত্তির স্থান। এখানেই সুরের মূল রূপ, মেজাজ ও চালটা তৈরি হয়ে যায়। এইজন্যেই সাধারণত মধ্য-সপ্তকেই তার কাজ— কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক গতি সেইখানেই প্রকটিত। এর পর অন্তরায় সুর মধ্য-সপ্তকের মাঝামাঝি জায়গা থেকে শুরু হয়ে তার-সপ্তকের সা পর্যন্ত আরোহণ করে। হয়তো সেখানে কিছুটা বিশ্রামও করে, তার পর সুর-বিশেষে আরও উপরে উঠে ক্রমশ নেমে আসে, শেষ পর্যন্ত মধ্য-সপ্তকে এসে আস্থায়ীর সুরের সঙ্গে মিশে যায়। সঞ্চারীতে সুর আবার মধ্য-সপ্তকে শুরু হয়, মন্দ্র (খাদ বা উদারা)-সপ্তকের দিকে অবরোহণ করে, তার পর কিছুটা আরোহণ ক'রে মধ্য-সপ্তকে শেষ হয়। আভোগ অনেকটা অন্তরার মতো, এখানে সুর আরোহণ-গতি নিয়ে কিছুদূর বিচরণ করার পর অবরোহণ-গতি নিয়ে মধ্য-সপ্তকে শেষ হয় এবং আবার আস্থায়ীর সঙ্গে মিশে যায়। এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। মোটের ওপর তিনটে জিনিস এখানে স্পষ্ট। প্রথমত, সুরের সর্বপ্রধান অংশ আস্থায়ী। দ্বিতীয়ত, আভোগ সহজেই অন্তরার পুনরাবৃত্তি হয়ে উঠতে পারে, কেননা উভয়েরই গতি তার-সপ্তকের দিকে। তৃতীয়ত, একমাত্র সঞ্চারীরই গতি মন্দ্র-সপ্তকের দিকে অর্থাৎ খাদের দিকে এবং এইজন্যেই তার পুনরাবৃত্তি নেই। এইখানেই তার বৈশিষ্ট্য। আস্থায়ীর বৈশিষ্ট্য তার পুনরাবৃত্তির সুযোগে, সঞ্চারীর বৈশিষ্ট্য তার পুনরাবৃত্তির অভাবে। উভয়ের মধ্যেই প্রস্তুতি চলতে থাকে পরবর্তী আরোহণ-গতির। স্পষ্টত, আস্থায়ীর স্থান প্রধান হলেও সঞ্চারী হল দ্বিতীয় প্রধান স্থান। ধ্রুপদী সংগঠন ছাড়া সঞ্চারীর কোনো অস্তিত্বই নেই, গুরুত্ব পাওয়া তো দূরের কথা। ধ্রুপদী আঙ্গিক অনুসরণ করাতেই সঞ্চারীতে নতুন বিস্ময়-সৃষ্টির সুযোগ এসে গেল এবং রবীন্দ্রনাথও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিলেন— কখনো প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসরণ করে, কখনো তাকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, 'রবীন্দ্রনাথের "সঞ্চারী" এক অতুলনীয় সৃষ্টি।' (রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'বাংলার গীতিকার' ১৩৬৩, পৃ. ৫২)।

সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতে অন্ত্যমিলের পরিকল্পনাটিও লক্ষণীয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক একটি গান : 'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে'। প্রথম তুকে মিল হচ্ছে 'টুটে', 'উঠে'। এর সঙ্গে মিল হচ্ছে দ্বিতীয় তুকের শেষে 'লুটে' এবং চতুর্থ তুকের শেষে 'ছুটে'। কিন্তু তৃতীয় তুকের সঙ্গে এর মিল নেই, যদিও সেখানে একটা আলাদা অভ্যন্তরীণ মিল আছে : 'প্রাণে', 'তানে'। এই পরিকল্পনা যে আকস্মিক নয় তার প্রমাণ 'গীতবিতান'-

এর পাতায় পাতায় ; সম্ভবত অধিকাংশ গানে, ওই একই পরিকল্পনা। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'র যে-সব কবিতায় সুর নেই সেখানেও প্রায়শ ওই একই পরিকল্পনা কাজ করেছে। কিন্তু এগুলির বাইরে এ-রকম মিলের ব্যবস্থা রবীন্দ্রকাব্যে আর বিশেষ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্য, আমাদের দৃষ্টান্তটিতে আর একটু বিশেষ মিলেরও ব্যবস্থা আছে : অন্তরায় 'চিত্তমাঝে' ও 'যেথায় বাজে', আর আভোগে 'বিষম বাধা' ও 'সেই তো ধাঁধা' ; কিন্তু এটি সাধারণ নিয়মের বাইরে অতিরিক্ত মিল ; সাধারণ নিয়মটি হল : প্রথম ও দ্বিতীয় তুকে মিল, এবং তৃতীয়কে বাদ দিয়ে, আবার চতুর্থ তুকের সঙ্গে মিল। কেন এমনটা ঘটছে ? এর সম্ভবপর কারণ একটিই : কবিতাটি ধ্রুপদের প্রচলিত গায়ন-পদ্ধতি অনুসরণ করছে। সেই পদ্ধতিটি কী ? আবার কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণ নেওয়া যাক। তিনি বলছেন, 'চারি কলি গাওয়ার নিয়ম এই : আস্থায়ী বার বার গাইতে হয় ; তৎপরে অন্তরা গাইয়া আবার আস্থায়ী গাইতে হয় ; তৎপরে আস্থায়ী সমাপ্ত করিতে হয় ; সঞ্চারী গাওয়ার পর আস্থায়ী গাওয়ার রীতি নাই ; সঞ্চারীর পরই আভোগ গাইতে হয়' ('গীতসূত্রসার', চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮২, পৃ. ৯৫)। অর্থাৎ প্রথমে আস্থায়ী, তার পর অন্তরা, অন্তরার পর আবার আস্থায়ী, আস্থায়ীর পর সঞ্চারী, সঞ্চারীর পর আর আস্থায়ী নয়, একেবারে আভোগ, আভোগের পর আবার আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তন ও সমাপ্তি। সঞ্চারী গাওয়ার পর আস্থায়ী গাওয়ার রীতি নেই, তাই কথার মিল রাখার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু অন্তরা ও আভোগ গাওয়ার পর আস্থায়ী গাওয়া রীতি, তাই প্রত্যেকটি জায়গায় অন্ত্যমিলের ব্যবস্থা। কাজেই মিলের সাধারণ পরিকল্পনা হুবহু গাওয়ার রীতিকেই অনুসরণ করছে, অথবা বলা যায়, তার দিক নির্দেশ করছে। এই কারণেও এটি গানের কবিতা, নিছক কবিতা নয়।

আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রসংগীতে গানের কাঠামোটা ধ্রুপদী। কিন্তু শুধু কাঠামোটাই ধ্রুপদী, তার রাগরূপও নয়, মেজাজও নয়, যদিও রাগবিশেষের স্বর-সন্নিবেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করা হয় নি। আমরা এখানে বিশ্লেষণের জন্য রবীন্দ্রজীবনের উত্তরপর্বের পাঁচটি গান বেছে নিচ্ছি যাদের স্বর-সন্নিবেশ মোটামুটি কাফি রাগের অথবা তার সমীপবর্তী, কিন্তু মেজাজে তারা প্রত্যেকে এক-একটি স্বতন্ত্র সত্তা। ধূর্জটিপ্রসাদ সুন্দর একটি ইঙ্গিত রেখে গেছেন ('মনে এলো' ১৭. ১. ৫৬) : 'রবীন্দ্র-সংগীতের প্রাণ কথার মাধুর্য নয়, কথা ও সুরের সংগতিও ততটা নয়, যতটা গানটির ডিজাইন।... রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান এক একটি "ডিজাইন", সেইটিই কাঠামো, সেইটিই এক্সপ্রেশন।' রবীন্দ্রনাথ একেই বোধহয় বলতেন 'রূপ'। এই 'রূপ' বা 'ডিজাইন'টিকে বিশদ আলোচনায় ধরা যাবে কিনা জোর করে বলা যায় না। তবে চেষ্টা করায় দোষ নেই। শুধু অনুরোধ, আলোচনাটিকে অনুসরণ করার আগে প্রত্যেকটি গান ভালো করে পড়ে নিলে এবং কোনো ভালো গায়ক বা গায়িকার মুখে শুনে নিলে ভালো হয়। স্বরলিপিটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারলে আরও ভালো।

আমাদের প্রথম গান সুপরিচিত 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে'। এর চারটি তুক নিম্নরূপ :

১.	আস্থায়ী	:	'তুমি ডাক দিয়েছ...	কেউ তা মানে না ॥'
২.	অন্তরা	:	'ফিরি আমি উদাস...	কেউ তো টানে না ॥'
৩.	সঞ্চারী	:	'বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর...	কেউ তো হানে না।'
৪.	আভোগ	:	'আকাশে কার...	কেউ তো আনে না ॥'

এটি 'অচলায়তন' নাটকের গান। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে, কবির বয়স তখন ৫০। স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('স্বরবিতান-৫২' দ্রষ্টব্য)। নাটকের শুরুতে পঞ্চকের মুখে এটি গীত। 'অচলায়তন' ভেঙে বেরিয়ে আসার ডাক পৌঁছেছে পঞ্চকের কাছে, তাকে এক অনির্দেশ্য বেদনায় চঞ্চল করে তুলেছে ; গানটি একদিক থেকে যেন নাটকের 'থীম মিউজিক'। এই গানটি সম্পর্কে প্রথমেই যেটা মনে আসে তা হল এর অত্যাশ্চর্য সারল্য। বোধহয় সরল বলেই এমন অন্তরঙ্গ অথচ তীব্র। কিন্তু এই সারল্য বড়ো প্রবঞ্চক, তা অসামান্য কলাকৌশলকে ঢেকে রেখে দেয়। লক্ষ করতে হবে যে গানটির মধ্যে একটা

অদ্ভুত অনির্দিষ্টতা আছে। আরম্ভেই যাকে 'তুমি' বলা হল সে বেশ অনির্দিষ্ট— পাঠকের কাছে, দর্শক-শ্রোতাদের কাছেও— তবু সে বড়ো অন্তরঙ্গ। তার পর আছে 'কোন্ সকালে', 'কার ব্যাকুলতা', 'কার বারতা'— এবং 'কেউ তা জানে না' ইত্যাদি। এই 'কেউ' কথাটি একটা ছোটো গানের মধ্যে এসেছে পাঁচ বার— আস্থায়ীতে দুবার এবং অন্তরা সঞ্চারী আভোগে একবার করে— যেমন 'কেউ তা জানে না', 'কেউ তা মানে না', 'কেউ তো টানে না', 'কেউ তো হানে না', 'কেউ তো আনে না'। আর শুধু 'কেউ' এই কথাটিই নয়, অথবা শুধু অন্ত্যমিলের ব্যাপারও নয়, গোটা শব্দসমষ্টির ধ্বনি-সামঞ্জস্যও লক্ষণীয়। এখানেই হয়তো রয়েছে গানটির 'প্রাণকেন্দ্র', 'যার ওপর সমস্ত মাধুর্য নির্ভর করে' (শৈলজারঞ্জন মজুমদার)। রবীন্দ্রনাথের গানে সাধারণত প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকে মিল থাকে, তৃতীয় স্তবকে থাকে না। কিন্তু এখানে যে ব্যতিক্রম ঘটানো হল তা এসেছে ওই ধ্বনিসামঞ্জস্যের টানে। কেনেথ বার্ক* তাঁর psychology of form-এর ধারণার মধ্যে যে দুটি কথার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন তা হল repetition আর eloquence। তিনি বলেছেন যে অন্য আর্ট ফর্মের তুলনায় সংগীতে পুনরাবৃত্তির সুযোগ সবচেয়ে বেশি এবং এই দুটি গুণই psychology of form-কে psychology of information থেকে আলাদা করে তোলে। Psychology of information থেকে সংগীতের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রসংগীতেও তা-ই।

কিন্তু কথার পুনরাবৃত্তি মানেই সুরের পুনরাবৃত্তি নয়। অন্তরা ও আভোগ অংশে (দ্বিতীয় ও চতুর্থ তুকে) অবশ্য সুর একই রকম : 'কেউ তো' = পা -ধা -পা। কিন্তু প্রথম লাইনে আছে 'কেউ তা' = সা -র্সা র্সা— মধ্য-সপ্তকের সা থেকে তার-সপ্তকের সা। প্রথমেই তীব্র আর্তধ্বনি, তার পর দ্বিতীয় লাইনে গভীর হতাশা : 'কেউ তা মানে না' = রা -মা জ্ঞরা। সা -না না। সা -া -া। সা -া -া। সঞ্চারীতে আছে 'কেউ তো' = রা -পা মা। যেন বিভিন্ন স্থানে আবেগের তথা উচ্চারণের ওঠানামার সঙ্গে মিল রেখেই এই স্বর-সন্নিবেশ। অবশ্য একটা কথা এখানে মনে রাখা উচিত : একটি সুর একবার চলতে আরম্ভ করলে সে তার নিজস্ব নিয়মেই চলে, কথার অনুবাদমাত্র সে নয়। যান্ত্রিক সমান্তরাল টানার অভ্যাস সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তবু কথা ও সুরের এই সামঞ্জস্য গানের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে যেটা কথা ও সুরের অতিরিক্ত। কেননা কথা চলেছে কথার নিয়মে, সুর চলেছে সুরের নিয়মে, তবু তাদের গতি একই দিকে।

গানের শুরুতে আছে 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে'। এখানে স্বরসমাবেশ পুরোপুরি কাফি রাগের। কাফি রাগ শাস্ত্রমতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয়। কিন্তু এখানে দেখছি 'কোন্ সকালে'। ব্যাপারটি নিশ্চয়ই শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তবু পর্দাগুলো কাফির। আবার যেই এসে গেল 'কেউ তা জানে না' অমনি কাফি রাগের সমস্ত পুরোনো সংস্কার ভেঙে পড়ল একটি ছোটো চকিত 'মুভমেন্টে'— সা থেকে র্সা। 'আমার মন যে কাঁদে'— জাতীয় পদসমষ্টি পুরোনো বাংলা টপ্পা গানে সহজলভ্য, কিন্তু 'মন যে কাঁদে আপন মনে' বাঙালি হয়েও রাবীন্দ্রিক। তুলনীয় 'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী' অথবা 'কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে'। এইভাবে একটা রাবীন্দ্রিক সংস্কার গড়ে উঠেছে। সুরের দিক থেকেও লক্ষণীয় এখানে শুদ্ধ গান্ধারের ব্যবহার। এটিকে আর 'নিয়মিত স্বর নয়' বলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, বরং এ-ও আর-এক রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য, এবং অন্য গানগুলিতেও এই শুদ্ধ গান্ধারের ব্যাপক ও মোক্ষম প্রয়োগ আমরা বার বার লক্ষ করব যেখানে মেজাজটা মোটেই প্রথাসিদ্ধ নয়। সঞ্চারীতে যা 'বেজে ওঠে' সেটা কোমল গান্ধার, কিন্তু 'কেঁপে ওঠে' শুদ্ধ গান্ধারে, আবার পরের লাইনে এসে হতাশার ক্লেশ ফুটে ওঠে কোমল গান্ধারেই। অন্তরা ও আভোগের আরোহ-গতিতে তেমনি শুদ্ধ নিষাদই প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যত্র সাধারণত কোমল নিষাদ। 'উদাস প্রাণে' বা 'ব্যাকুলতা'য় শুদ্ধ নিষাদ ছাড়া আর কিছু ভাবাই যায় না, কেননা তাতে প্রাণ উদাসও হত না, আকাশে ব্যাকুলতাও জাগত না।

---

* Kenneth Burke, *Psychology and Form in Literary Opinion in America*, vol II, New York, 1962, pp. 667-76.

কিছু কিছু অভ্যন্তরীণ অলংকরণও বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যদিও তারা একান্তই বাহুল্যবর্জিত, এবং সেটাই এখানে 'প্যাটার্ন'। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক 'তুমি' কথাটির ব্যবহার। সহজ ত্রিমাত্রিক তালের (৩+৩ = ৬ মাত্রা অর্থাৎ দাদরা তাল) এই গানে প্রথম 'তুমি' কথাটি আছে মাত্রা-গণনার বাইরে এবং স্বরের দিক থেকেও কেবল সা সা। কিন্তু প্রথম লাইন শেষ করার পর সেটি হয়ে গেল ধা পা— অনেকটা পূর্ববর্তী কোমল নিষাদের টানে। কিন্তু অন্তরা বা আভোগের শেষে যে 'তুমি' সে এতক্ষণের সুর-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের, তার মানে শুধু পঞ্চকের নয়, দর্শক-শ্রোতাদেরও, আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে, তাই তার রূপ হল জ্ঞরা সন্া। 'জানে না', 'মানে না', 'টানে না', 'আনে না', অংশে প্রথম আ-কারটির ব্যবহার যেমন উচারণ-সম্মত তেমনি সুরতাল-সম্মতও বটে, অথচ কত সহজ। আর সঞ্চারী অংশের রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে বিশেষ করে 'হানে না' এই দুটি কথার ওপর সুরের বিশিষ্ট অলংকরণে : রজ্ঞা -রমা জ্ঞরা। সা -া -া। গোটা সঞ্চারীর গতিই প্রত্যাশানুযায়ী নিচু পর্দায় রাখা হয়েছে, যেন কান পেতে 'পঞ্চম' স্বরটি শুনতে চাইছি, তাই স্বরের বিস্তার মাত্র মন্দ্র-সপ্তকের নিষাদ থেকে মধ্য-সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত, কেননা এর পরেই জেগে উঠবে 'আকাশে কার ব্যাকুলতা'। সেখানেও থাকে 'গোপন' কথাটি শোনার প্রতীক্ষা, তাই 'গোপন' হয়ে ওঠে পা পধা -ণর্সা। -া, যার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় অন্তরার 'এমন' কথাটি। কাফি রাগের শাস্ত্রসম্মত পর্দাগুলি থেকে সুর কোথাও বিচ্যুত হয় নি, কিন্তু এ কোন্ কাফি ?

দ্বিতীয় গানটি হল 'আজি সাঁঝের যমুনায় গো।' গানটি হয়তো খুব সুপরিচিত নয়, কিন্তু এক কথায় অসামান্য এবং এর গঠনবৈশিষ্ট্যও সম্পূর্ণ আলাদা। এর রচনাকাল আশ্বিন ১৩৩০ অর্থাৎ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ, কবির বয়স তখন ৬২। স্বরলিপিকার পুনশ্চ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('স্বরবিতান-৩' দ্রষ্টব্য) 'গীতবিতানে' এটি 'প্রেম' পর্যায়ের গান। এর চারটি তুক নিম্নরূপ :

১.	আস্থায়ী	:	'আজি সাঁঝের	...	ভেসে যায় গো ॥'
২.	অন্তরা	:	'তারি সুদূর	...	করুণায় গো ॥'
৩.	সঞ্চারী	:	'আজ মনে মোর	...	দিন যায় কি।'
৪.	আভোগ	:	'যায় যাবে, সে	...	বেদনায় গো ॥'

এই সাজানোর পরিকল্পনাটি বড়ো অদ্ভুত। প্রথম স্তবকে আছে কিরণতরীর ভেসে চলা। দ্বিতীয় স্তবকে সেই ভেসে-চলার সারিগান বেয়ে দুটি উতল আঁখির বিদায়স্মৃতি। তৃতীয় স্তবকে আছে স্মৃতির গহন থেকে জেগে-ওঠা সুরে একলা-প্রাণের কথা। আর চতুর্থ স্তবকে আছে সেই সুরের বেদনাকে কেউ লুকিয়ে তুলে নিয়ে আপন বেদনার মধ্যে গ্রহণ করল কিনা তাই নিয়ে কিছু সংশয়-জড়িত প্রত্যাশা। অথচ আয়তন কত সংক্ষিপ্ত, শব্দব্যবহার কত পরিমিত— সুর যেন সর্বদাই কথার সীমা পেরিয়ে যেতে চায়, আবার ফিরে ফিরে আসে— হয়তো 'যায় যাবে, সে ফিরে ফিরে' শব্দগুচ্ছকে সম্মান দেখাবার জন্যেই। এই রহস্যময়তার যেন শেষ নেই। কী নেই এই ছোটো গানটিতে ? আছে তরী ভেসে যাওয়ার ছবি, আছে স্মৃতির জাগরণ, দুটি চোখের করুণা, মনের মধ্যে সুর জেগে ওঠা, প্রাণের কথা, তার বেদনা। সব-কিছুই আছে, নেই শুধু তার স্পষ্ট কোনো অর্থ। কেননা তরীটি এখানে 'কিরণতরী', স্মৃতি এখানে 'বিদায়স্মৃতি', দুটি চোখ 'উতল' আবার করুণায় 'উছল', সুরটিও কেউ শুনেছে কিনা সংশয় আছে, প্রাণের কথাটি একান্তই 'একলা প্রাণের কথা', আর বেদনাও 'পরম বেদনা'। তার ওপর আবার 'কোথায় ভেসে যায় গো', 'কেউ তা শোনে নাই কি', 'একলা এ দিন যায় কি', 'লুকিয়ে তুলে নেয় নি কি রে', জাতীয় সংশয়িত প্রশ্ন, যার উত্তর 'হ্যাঁ'-ও হতে পারে, 'না'-ও হতে পারে। এরকম 'অর্থহীনতা' কবির অন্য গানেও আছে, যেমন 'কারণ শুধায়ো না, অর্থ নাহি তার'— সেখানেও পাব শুধু পুঞ্জীভূত বেদনার সুর-সংকেত ('আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে' গানটি স্মর্তব্য)। এ-রকম সুরময় ভাষা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো গানে আছে বলে জানি না। কোনো কোনো সমালোচক একে বলেছেন 'সন্ধ্যা-ভাষা' ; কিন্তু এ-ভাষা কেবল গানের জন্যেই তৈরি, সাধারণ কবিতার ভাষা এটি নয়। 'গো' শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার এক ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণকেই সূচিত

করে, সে সম্ভাষণ হয়তো নিজেকেই। একদিকে এই ঘনিষ্ঠতা, অন্য দিকে ভেসে-যাওয়া দিনের দূরাগত স্মৃতি— মাঝখানে যে বিচ্ছেদের বেদনা তা-ই গানটিকে মেদুর করে তুলেছে।

আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'স্মৃতি' এই একটিমাত্র সুপরিচিত শব্দ ছাড়া আর কোথাও যুক্তব্যঞ্জনের কোনো ব্যবহার নেই। কিন্তু কেন? এ কি কিরণতরীর ভেসে চলাকে বাধাহীন করার জন্যেই?— হয়তো তাই, কেননা 'কোথায় ভেসে যায় গো' এটাই বোধহয় এ-গানের প্রাণকেন্দ্র— গানের প্রত্যেকটি স্তবকেই এই ভেসে যাওয়ার অনুষঙ্গটি রয়ে গেছে— প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে। এর পর স্বরলিপির ওপর একটু নজর বুলিয়ে নিলেই ধরা পড়বে, সারা গানটির অবয়বে অনেকগুলি (সংখ্যায় ২৫টি) জায়গায় ছোটো-বড়ো মীড়ের কাজ নির্দেশিত হয়েছে— সবই সুরকে প্রবহমান অথচ আন্দোলিত রাখার উদ্দেশ্যে, যদিও উদ্দেশ্যটা কখনোই স্পষ্ট নয়। তবে ছোটো ছোটো মীড়গুলি ঠিক তরঙ্গ নয়— ripples মাত্র। সমস্ত আয়োজন কত সহজ, স্বাভাবিক, অনায়াস— এবং সমগ্রের সঙ্গে একান্তভাবে লিপ্ত। ফলে গানের গোটা কাঠামোটিকেই এমন যত্নে ও সন্তর্পণে গড়ে তোলা হয়েছে যে মনে হবে সামান্য একটু বাড়তি বোঝাতেই সমগ্র আয়তনটি ভেঙে পড়বে। এইখানেই শ্রেষ্ঠ 'কম্পোজার'-এর রূপদক্ষতা— সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, 'সারি গান' শব্দটিও বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। যদিও 'কিরণতরী'র সূত্র ধরেই কথাটি এসেছে তবু পুরো শব্দগুচ্ছটি হল : 'তারি সুদূর সারি গানে'— এখানে তিনটি 'র'-এর বিশিষ্ট প্রয়োগ সুদূরের আবহই রচনা করে, এবং নিছক অর্থ নয়, ধ্বনি-ব্যঞ্জনাই এখানে প্রধান বিবেচ্য। এই 'সারি গানে'র অনুরূপ প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের অন্য গানেও আছে, যেমন 'তাই তোমারি সারি গানে/সেই আঁখি তার মনে আনে' ('ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের' গানটি স্মরণীয়), সেখানেও আছে 'রি'-ধ্বনির দ্বিত্ব। কাজেই এগুলি একান্তই বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক প্রয়োগ, যা নতুন সাংগীতিক অনুষঙ্গ রচনা করে। তা ছাড়া এই 'সুদূরে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ সাংগীতিক তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটি এই যে, 'গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা'। ('সংগীতচিন্তা', পৃ. ২০২)।

এর পর চারটি তুকের সুরবিন্যাস একটু আলাদাভাবে লক্ষ করা যাক। প্রথম তুকের (আস্থায়ীর) আরম্ভ : 'আজি সাঁঝের যমুনায় গো'— এর স্বর-সমাবেশ কাফির পর্দাগুলিকেই আশ্রয় করে আছে, যদিও 'যমুনায়' কথাটির শেষাংশে মীড়যুক্ত সা -জ্ঞা -া -রা এবং 'গো'-এর ওপর সা -া রা না ভারি একটা অন্তরঙ্গতার ভাবও সৃষ্টি করে। 'তরুণ চাঁদের' অংশে শুদ্ধ নিষাদ এবং 'কিরণতরী' অংশে কোমল নিষাদ সুরের চমৎকার একটা ওঠা-নামা দেখায়। এর পর পঞ্চম পর্দাটির শেষে 'কোথায়' কথাটির ওপর শুদ্ধ গান্ধারের প্রয়োগ সহজেই হয়ে ওঠে অব্যর্থ। তার পর 'যায় গো' অংশে একটু দীর্ঘমীড়যুক্ত ধপা -া -ণা -ধা। পমজ্ঞা -া -া -রা যেন ভেসে যাওয়াটাকেই প্রত্যক্ষগোচর করে তুলছে। এখানে সংগীতের চিত্রগুণও বিশেষভাবে লক্ষণীয়— সেটা শুধু ভাষার কারণে নয়, সঙ্গে আছে 'যায়' শব্দের অন্তর্গত আ-কারের দীর্ঘায়িত উচ্চারণ।

অন্তরা শুরু হয়েছে তার-সপ্তকের সা থেকে। তার পর কোমল গান্ধারে দীর্ঘকালীন স্থিতি, শুধু মাঝখানে একবার ঋষভকে স্পর্শ করে যাওয়া— এইভাবে 'সুদূরের' ইঙ্গিতটি আভাসিত হয়েছে। কিন্তু সুরের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো চমক দেখা দিয়েছে 'বিদায়স্মৃতি জাগায় প্রাণে' অংশে। এখানে ঋষভ স্বরটি কোমল এবং এই কোমল ঋষভকে ওই সামান্য কয়েকটি কথার ওপর পুরো চার বার ব্যবহার করা হয়েছে আশ্চর্য কৌশলে, অথচ কাফি রাগের কোনো শাস্ত্রগত অনুশাসনেই তার অনুমোদন নেই। এইজন্যে মনে হয় গানটি কাফি-রাগাশ্রিত না বলাই হয়তো উচিত ছিল। কাফি রাগকে রক্ষা করতে হলে এখানে সুরভ্রষ্ট হতে হয়, তাই স্রষ্টা তাঁর নিজের পথেই চলেছেন, তবু এই বিশিষ্ট musical phrase-টি সমগ্র অবয়বের সঙ্গে কেমন বেমালুম মিশে গেছে। এইখানেই সুরকারের আসল প্রতিভার স্পর্শ— তাঁর 'বিদ্রোহী' সত্তার যথার্থ পরিচয়। পরের গোটা পঙ্‌ক্তিটিতেও সুরের কাজ অসামান্য, বিশেষ করে 'উতল আঁখি' অংশে। কিন্তু আরও লক্ষণীয় যে এই গোটা পঙ্‌ক্তিটিকে সুরে দেখানো হয়েছে দুবার, এবং দুবার দুরকম ভাবে— হয়তো এই কারণে যে এই উতল

আঁখির স্মৃতিই সঞ্চারীতে এসে নতুন সুরের ও নতুন কথার জন্ম দেবে। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় 'আঁখি'তে এসে হঠাৎ একটা তীব্র মধ্যমও প্রয়োগ করা হয়েছে আশ্চর্যজনকভাবে, হয়তো 'আঁখি'কে আরও 'উতল' করে তোলার জন্যেই। 'আঁখি'তে ব্যবহৃত পঞ্চমের পর 'উছল করুণায়' অংশে সা-তে ফিরে আসায় অদ্ভুত এক করুণার সঞ্চার হয়েছে। রূপে ও রূপকৌশলে এই স্তবকটি সত্যি সত্যিই অতুলনীয়।

এর পর সঞ্চারী। সঞ্চারীতে রবীন্দ্রনাথ শুধু অপরকে নয়, নিজেকেও বার বার অতিক্রম করে গেছেন। তার মানে, এখানে কোনো কিছুই যেন প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রায় সবটাই স্রষ্টার, এবং তাঁর গান-বিশেষের, নিজস্ব। সঞ্চারীটি আরম্ভ হয়েছে মধ্য-সপ্তকের পঞ্চম থেকে, চড়েছে তার-সপ্তকের ঋষভ পর্যন্ত। তার পর 'শোনে নাই কি' অংশে পঞ্চম, মধ্যম ও কোমল গান্ধারের ব্যবহার একটু মল্লার রাগের আভাস এনে দেয় এবং এটিও একটি চমৎকার কিন্তু বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক প্রয়োগ, যা বহু গানে বার বার ফিরে এসেছে। কিন্তু এই মল্লার কাফি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই অসামান্য সৌন্দর্য ও গভীরতা সত্ত্বেও হয়তো বিস্ময়ের তেমন কিছু নেই। 'একলা প্রাণের কথা নিয়ে' দুবার উচ্চারিত হয়েছে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন সুরে, হয়তো এই কারণে যে এটা কবির 'প্রাণের কথা'। কিন্তু 'একলা এ দিন যায় কি' অংশে 'দিন' এবং 'যায় কি' বোধহয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। পা থেকে তার-সপ্তকের সা পর্যন্ত একটা দীর্ঘ মীড়, তার পর মধ্য-সপ্তকের ঋষভ ছুঁয়ে মজ্ঞা -রা সা -া —এর বৈচিত্র্য আর সৌন্দর্য ব্যাখ্যার অতীত। অথচ একাকিত্বের যে বেদনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে তা একেবারে মর্মদেশ স্পর্শ করে।

আভোগ অংশ সুরের দিক থেকে অনেকটা অন্তরারই অনুরূপ এবং এখানেও সেই কোমল ঋষভের রাগ-বহির্ভূত কিন্তু অমোঘ প্রয়োগ, এবং আগের মতোই এক-আধবার নয়, চার-চার বার ('ফিরে ফিরে/ লুকিয়ে তুলে নেয় নি কি রে' অংশে)। কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয় হল 'নেয় নি কি রে'-র শেষাংশ ; 'কি রে' = ণা দা পা -া। অপ্রত্যাশিত এই কোমল ধৈবতের চকিত কিন্তু অব্যর্থ প্রয়োগ সহজেই মনে করিয়ে দেয় ভাতখণ্ডেজীর পূর্বোল্লিখিত উক্তিটি, যে কাফিতে 'কখনো কখনো কোমল ধৈবত প্রয়োগ করেও নিপুণ গায়ক রাগ হানি হতে দেন না, কিন্তু এর প্রয়োগ গায়কের কুশলতার ওপর নির্ভর করে থাকে।' আমরা এখানে 'গায়ক' শব্দটির জায়গায় 'সুরকার' শব্দটি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারি। এর পর শেষের পঙ্‌ক্তিটি দুবার গাওয়ার ব্যবস্থা আছে, দুবার দুই ভিন্ন সুরে। কিন্তু দ্বিতীয় সুরটিতে এসে আর-এক বিচিত্র বিস্ময়। সেটি হল : 'পরম বেদনখানি।' এখানে 'বেদনখানি' = পা -া পা হ্মা। পা -হ্মা ধপা -া। পুনর্বার এই তীব্র মধ্যমটি উঠে এসেছে সৃষ্টির কোনো অজ্ঞাত রহস্যলোক থেকে, ব্যবহৃত হয়েছে দুবার— ঠিক যেমন আগে দেখা দিয়েছিল কোমল ঋষভের ব্যবহার। আমরা শুধু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি যে এই গানে শেষ পর্যন্ত তিন-তিনটি সপ্তক এবং শুদ্ধ-বিকৃত মিলিয়ে পুরো বারোটি স্বরই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এ-ও স্বীকার করতে হয় যে কাফির মতো একটি অতি বিস্তৃত রাগের মূল আশ্রয় ছাড়া হয়তো এটা সম্ভব হত না, প্রতিভার স্পর্শ তো অবিসংবাদিত। সমগ্র 'মুড্'-টি বড়ো একান্ত, বড়ো স্পর্শকাতর, এবং বিশিষ্ট— তাই অবিস্মরণীয়।

তৃতীয় গানটি হল 'বিরস দিন, বিরল কাজ'। এটিও 'প্রেম' পর্যায়ের গান, কিন্তু 'সেন্টিমেন্ট' সম্পূর্ণ আলাদা। এটি হল প্রেমের সমারোহের গান, বিদ্রোহের গান, শুদ্ধ দ্বার ভাঙার গান— প্রেম এখানে অপরাজিত, সে সমস্ত মোহনিদ্রাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এটির রচনাকাল বৈশাখ ১৩৩৩ (১৯২৬ খ্রি), কবির বয়স যখন ৬৪— ভাবাই কঠিন এই বয়সে এই গান রচিত হচ্ছে। গানটি 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'বিজয়ী' কবিতার পরিবর্তিত রূপ। আমরা স্বাভাবিক কারণেই এখানে 'গীতবিতান'-এর রূপটি বিবেচনা করব, 'মহুয়া'র রূপটি নয়। স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('স্বরবিতান-৫' দ্রষ্টব্য)। গানটির স্তবক-বিন্যাস নিম্নরূপ :

১. আস্থায়ী	:	'বিরস দিন	...	মহা সমারোহে' ॥
২. অন্তরা	:	'একেলা রই	...	অপরাজিত ওহে' ॥
৩. সঞ্চারী	:	'কানন-'পর	...	ধূর্জটির জটা।'
৪. আভোগ	:	'যেথা যে রয়	...	ঘনঘুমের মোহে' ॥

আমরা প্রতিটি তুকের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণে যাবার আগে কয়েকটি সাধারণ ঝোঁকের দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাই। প্রথমত, গানটির প্রথম লাইনেই আছে 'প্রবল বিদ্রোহে', আর দ্বিতীয় লাইনে 'কী মহা সমারোহে'। কিন্তু 'বিদ্রোহ' মানে তো প্রচলিত সংস্কারকে না-মানা। সেই না-মানার সঙ্গে সংগতি রেখে তাল-প্রয়োগটাও হয়েছে প্রচলিত রীতির বাইরে— ৩।২ ছন্দে। এই তাল একদিকে অসমমাত্রিক, অন্য দিকে প্রচলিত ঝাঁপতালের ২।৩ ছন্দ থেকেও আলাদা। রবীন্দ্রসংগীতে অবশ্য এ-রকম তাল আরও কয়েকটি গানে ব্যবহৃত হয়েছে, তবু তালটি (ঝম্পক) যে খুব সুপ্রচলিত নয়, এটা স্বীকার করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহ হচ্ছে কোনো একটা কিছুর বিরুদ্ধে— যেমন এখানে বিরসতার বিরুদ্ধে, কর্মহীনতার বিরুদ্ধে, জড়তার বিরুদ্ধে, রুদ্ধদ্বারের নিষেধের বিরুদ্ধে। তাই গানের ফর্মেও আনা হয়েছে এক অদ্ভুত ধরনের বিরোধিতা, অথবা বৈপরীত্য—একদিকে শব্দ-প্রয়োগের 'ঘনঘটা' ও ব্যঞ্জনধ্বনির বাহুল্য, অন্য দিকে সুরের আপেক্ষিক সরলতা ও চলনগত স্থৈর্য— ঠিক যেন উপলখণ্ডের বাধার ওপর দিয়ে স্রোতের স্থির প্রবহমানতা— উভয়ের সংঘাতেই জেগে উঠছে নতুন সংগীত। তৃতীয়ত, প্রেমের 'মহা সমারোহ' দেখাবার জন্যেই হয়তো আনা হয়েছে মিলের পরিকল্পনায় আর-এক অসামান্য সমারোহ। রবীন্দ্রসংগীতের স্বাভাবিক যে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকের অন্ত্যমিল সে তো এখানে আছেই, আছে তৃতীয় স্তবকের স্বতন্ত্র অন্ত্যমিলের ব্যবস্থাও, কিন্তু তা ছাড়াও রয়েছে আরও অনেকগুলি অভ্যন্তরীণ মিল, এবং সেটাও সম্পূর্ণ পরিকল্পনামাফিক। যেমন, প্রথম ও তৃতীয় স্তবকে আছে আরও দুটি করে শব্দগুচ্ছের মিল, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবকে আছে আরও তিনটি করে শব্দগুচ্ছের মিল। প্রথম স্তবকে 'বিরস দিন, বিরল কাজ' ও 'এসেছ প্রেম, এসেছ আজ'। তৃতীয় স্তবকে 'কানন-'পর ছায়া বুলায়' ও 'গঙ্গা যেন হেসে দুলায়'। তেমনি দ্বিতীয় স্তবকে 'একেলা রই অলস মন', 'নীরব এই ভবনকোণ' ও 'ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ'। আর চতুর্থ স্তবকে 'যেথা যে রয় ছাড়িল পথ', 'ছুটালে ঐ বিজয়রথ' এবং 'আঁখি তোমার তড়িতবৎ'। সত্যিই এ এক রাজকীয় সমারোহ, এবং ফলে কাঠামোগত ভারসাম্যটিও তৈরি হয়েছে রাজকীয়— যেন পাথর কুঁদে নির্মাণ করা, অথচ কৃত্রিমতা কোথাও নেই। এই সযত্নরচিত কাঠামো আশ্রয় করে কাফি রাগের পর্দাগুলিকে অনেকটা সরলভাবেই সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে গানের মধ্যে। এবার আমরা প্রতিটি তুককে একটু স্বতন্ত্রভাবেই খুঁটিয়ে দেখতে পারি।

আস্থায়ীর প্রথমেই আছে 'বিরস দিন'। বিরস দিন বড়ো দীর্ঘ হয়, তাই 'দিন' কথাটির আরম্ভের কোমল নিষাদটি সোজা টেনে রাখা হয়েছে ৭ মাত্রা ধরে। 'বিরল কাজে'ও স্বরসংখ্যা বিরল, মাত্র দুটি— ধা ও পা। 'প্রবল' শব্দের প্রতিটি অক্ষরে একটি করে স্বর— পা ধা ণা, কিন্তু 'বিদ্রোহে' শব্দের উচ্চারণ দীর্ঘায়িত এবং তার-সপ্তকের ঋষভ ছুঁয়ে সামান্য একটু ঘুরে ষড়্জে এসে স্থিত। পুনরায় 'প্রেম' শব্দটিতে এসে সুরকে চড়িয়ে তার-সপ্তকের ঋষভে পৌঁছে দেওয়া হল, কেননা, 'প্রেম' এখানে শুধু একটি শব্দ নয়, সে নিজেই গানের 'থীম' এবং স্বতন্ত্র একটি সম্বোধন— আসলে প্রেম এখানে ব্যক্তিস্বরূপান্বিত (পার্সোনিফায়েড)। সুরটি এখানেও বেশ সরল ; যা-কিছু অলংকরণ তা হল 'বিদ্রোহে' আর 'মহা সমারোহে'— ব্যাপারটা খুবই বোধগম্য। স্বর-সমাবেশ নিয়ে এতটা চিন্তা ও ক্ল্যাসিক সংযম সচেতন কিনা বলা কঠিন। হয়তো মহাশিল্পীর হাতে এসব আপনা থেকেই এসে যায়। তবু সব মিলিয়ে কী অসামান্য ঐশ্বর্য!

দ্বিতীয় তুকে অর্থাৎ অন্তরায় গানের দুটি জায়গায় কথার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে : এক. 'একেলা রই' আর দুই. 'ভাঙিলে দ্বার'। এই 'ভাঙিলে দ্বার'টাই এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু যে রুদ্ধদ্বার একাকিত্বের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ তাকে গুরুত্ব না দিলে দ্বার ভাঙা কোনো তাৎপর্য পায় না, তাই সেখানেও একটি পুনরাবৃত্তি। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সুরের কাজেও আর-একটি ছোটোখাটো পুনরাবৃত্তি আছে : সেটি হল 'ভাঙিলে দ্বার' এবং 'কোন্ সে ক্ষণ', কেননা উভয় ক্ষেত্রেই সুর তার-সপ্তকের ঋষভ থেকে মধ্যমে চড়েছে এবং একটু ভিন্নভাবে হলেও কোমল গান্ধারকে ব্যবহার করেছে। সংগত কারণে সুর এই জায়গাতেই সবচেয়ে উঁচুতে। এর পর সামান্য অলংকরণের কাজ আছে 'অপরাজিত ওহে' অংশে। এরও কারণটা খুবই

সহজবোধ্য, বিশেষত এইজন্যে যে প্রথম স্তবকে যে প্রেমকে সম্বোধন করা হয়েছে সে-ই এই 'অপরাজিত'। ('সমারোহে' শব্দটির সঙ্গে 'অপরাজিত ওহে'-র মিলটিও অত্যাশ্চর্য, এর ধ্বনিগত সংগতি বিস্ময়কর, এবং সুরেও তা আশ্চর্যভাবে মিশে যায়— দুটি প্রকরণ যেন একই বিন্দুতে সংহত।)

সঞ্চারীতে এসে আমরা গানটির সামান্য একটু গতি-পরিবর্তন লক্ষ করি— কী 'থীম্'-এর দিক থেকে, কী সুরের দিক থেকে। পরিবর্তনটা অবশ্য খুব বড়ো ধরনের নয়, কেননা বড়ো পরিবর্তনে গানটির গোটা স্ট্রাক্চারটাই নষ্ট হয়ে যায়। তবু সামান্য পরিবর্তনটাও এখানে লক্ষণীয়, কেননা এর তাৎপর্য বলা যেতে পারে দুটি : এক. আগের বিদ্রোহকে একটু সংহত করে নেওয়া, আর দুই. পরবর্তী বিস্ফোরণের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। 'থীম'-এর দিক থেকে বলা যায়, এতক্ষণ আমরা প্রেমের বিদ্রোহ ও সমারোহকেই দেখেছি, এখন দেখব প্রেমের হাসি এবং তার অশান্ত লীলা। মহাপ্রাণ বর্ণের জমকালো অনুপ্রাসের ('ঘনায় ঘনঘটা') সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জনের ধ্বনিগৌরব, অরণ্যশীর্ষে ছায়া-সঞ্চরণের সঙ্গে গঙ্গা ও ধূর্জটির প্রণয়লীলার ক্ল্যাসিক উপমা— এ-রকম চিত্রধ্বনিময় ঐশ্বর্যকে বোধহয় অসমমাত্রিক তাল ছাড়া সামলানোই যেত না ('eloquence of form')। কিন্তু ঠিক এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সুরেও এসেছে নতুন গতি। সঞ্চারীর প্রত্যাশিত মন্দ্র-সপ্তক ছেড়ে এখানে সুর আরম্ভ হয়েছে তার-সপ্তকের সা থেকে অবরোহ গতিতে, চলেছে কার্যত কাফি রাগের পুরো অবরোহণ অবলম্বন ক'রে। তার মানে, 'কানন-'পর ছায়া বুলায়' হয়েছে কার্যত র্সা ণা ধা। পা -া। মা জ্ঞা রা। সা ন্‌া (মাত্র একটি স্পর্শস্বর বাদ দেওয়া হয়েছে)। 'ঘনায় ঘনঘটা'তে সামান্য একটু অলংকার আছে— খুব স্বাভাবিক কারণে। 'হেসে দুলায়'-তে এসে পা ধা ণা-র গতিকে একটু বক্র করে দেওয়া হয়েছে (পণা ণা ধা। ণা -া)— তা না হলে 'হাসি'ই বা কীসের, আর 'দোলানো'ই বা কীসের! এর পর 'ধূর্জটির' কথাটির শেষ অক্ষরটিই একমাত্র অক্ষর যেখানে তিনটি স্বরকে (পধপা) একমাত্রায় রাখা হয়েছে, আর 'জটা'র প্রথম অক্ষরে মগা ব্যবহার করা হয়েছে। এই অলংকরণগুলি সামান্য বলেই অসামান্য মনে হয়।

আভোগ সুরের দিক থেকে অনেকটা অন্তরার পুনরাবৃত্তি। এখানেও কথার পুনরাবৃত্তি দেখানো হয়েছে দু জায়গায় : 'যেথা যে রয়' এবং 'আঁখি তোমার' ('টেক্সট'-এ কিন্তু কোথাও কোনো পুনরাবৃত্তি নেই)। যেখানে যে 'রয়' সেখানে তো সে দীর্ঘকাল ধরেই বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে, তাই এই কথাগুচ্ছকে প্রথমেই সাতমাত্রায় দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। তেমনি 'আঁখি তোমার'। এবং এই 'আঁখি' যেহেতু এখানে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, তাই প্রথমত এর উচ্চারণ দীর্ঘায়িত ; দ্বিতীয়ত, এখানেই স্বর-সমাবেশটি সবচেয়ে তীব্র। এর পর দ্বিতীয় বার যখন 'আঁখি তোমার' কথাটি উচ্চারণ করা হয়েছে তখন আবার সেই তার-সপ্তকের ঋষভ থেকে মধ্যমে উল্লম্ফন, এবং সুরেও কার্যত পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে 'তড়িতবৎ' কথাটির ওপর— একেই আমরা আগের অনুচ্ছেদে বলেছি বিস্ফোরণ। 'তড়িতবৎ' শব্দটিও একটু লক্ষ করবার মতো। গানে এ-রকম হলন্ত শব্দের ব্যবহার কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু ব্যাকরণসম্মতভাবে 'তড়িৎবৎ' রাখা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া 'তড়িত' শব্দকে অ-কারান্ত রাখায় তিন মাত্রার র্রা র্রমা র্রা এই স্বর-বিন্যাস সহজ হয়েছে, শোভনও হয়েছে, অন্যথায় জবরদস্তি করতে হত।

আমাদের চতুর্থ গানটি হল : 'শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান।' এটি কবির একেবারে শেষ বয়সের রচনা। রচনাকাল ১০ মাঘ ১৩৪৩ (২৪ জানুয়ারি ১৯৩৭), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে রচিত, কবির বয়স তখন ৭৫। স্বরলিপিকার শান্তিদেব ঘোষ। 'গীতবিতানে' এটি 'স্বদেশ' পর্যায়ের গান বলে চিহ্নিত এবং 'স্বরবিতান'-এর ৪৭-নম্বর খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানগুলিকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় : ক. ১৯০৫ সালের আগে, খ. ১৯০৫ সালে এবং গ. ১৯০৫ সালের পরে। প্রথম পর্বের গানগুলি প্রায় সবই রাগভিত্তিক এবং তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে স্বদেশের দুঃখে মনোবেদনা, ক্ষোভ, গ্লানিবোধ, যথা : 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না', 'কেন চেয়ে আছ গো মা', 'আজি এ ভারত লজ্জিত হে' ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের সময়কার গানগুলি প্রাণোন্মাদনাকারী,

এবং অধিকাংশই লোকসুরের ভিত্তিতে রচিত, তবে সবগুলি নয়, যেমন 'সার্থক জনম আমার'। তৃতীয় পর্বে গ্লানি উম্মাদনা কিছুই নেই, আছে আদর্শের ও ত্যাগব্রতের সংযত উদ্‌বোধন, মানবমিলনের উদার আহ্বান ; সুরবয়নে রাগরাগিণী থাকলেও কিছুটা যেন অন্তরালে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রূপকর্মের যথার্থ রাবীন্দ্রিক কুশলতা, সংযম ও গঠনসৌষ্ঠব। বর্তমান গান এই তৃতীয় শ্রেণীর গান ; এবং এখানে দেশাভিমানের কোনো স্থান নেই— এরা স্বদেশীও বটে, বিশ্বজনীনও বটে।

গানটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কাব্যছন্দে কলাবৃত্তের অসামান্য ব্যবহার এবং দীর্ঘস্বর ও যুক্তব্যঞ্জনকে সংগীতের চতুর্মাত্রিক তাল-বিভাজনে যথাযথ প্রয়োগ। কবিতার ছন্দ-বহির্ভূত শব্দগুলিকেও (যথা 'শুভ', 'সব', 'চির' ইত্যাদি) চমৎকার কৌশলে তালের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। গানের মধ্যে যে উদার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, ছন্দ ও তালের ওঠা-নামার মধ্য দিয়েই তা সার্থক, অথচ ব্যাপারটা যেন খুবই সহজ। (বিশেষ করে 'রেফ'-এর চমৎকার পৌনঃপুনিক ব্যবহার গানটিকে প্রায় আগাগোড়া এক অদ্ভুত মর্যাদা দান করে।) সুরে কাফি রাগের মধ্যে অনেক সময় টপ্পা-ঠুংরির যে প্রথাগত সংস্কার জড়িয়ে থাকে এখানে তার চিহ্নমাত্র নেই, বরং ধ্রুপদ-ধামারের সঙ্গেই এর কিছুটা আত্মীয়তা। কিন্তু শেষ বিচারে এটি রবীন্দ্রসংগীত, যদিও এক বিশেষ ধরনের রবীন্দ্রসংগীত। সম্মিলিত কণ্ঠে গাওয়ার পক্ষে গানটি বিশেষ উপযোগী। গানের স্তবক-বিন্যাস নিম্নরূপ :

১. আস্থায়ী	:	'শুভ কর্মপথে	...	হোক অবসান ॥'
২. অন্তরা	:	'চির-শক্তির	...	বিত্ত মহান ॥'
৩. সঞ্চারী	:	'চল' যাত্রী	...	অনুসন্ধান।'
৪. আভোগ	:	'জড়তাতামস	...	কর' স্নান ॥'

আস্থায়ীর প্রথম লাইনেই সুরটি তার-সপ্তকের সা থেকে শুরু হয়েছে, তার পর সহজ কয়েকটি অগ্র-পশ্চাৎ ধাপ পেরিয়ে মধ্য-সপ্তকের সা-তে এসে শেষ হয়েছে, কেবল পরের লাইনের 'সব' কথাটির জন্য দুমাত্রার মধ্যমকেও জুড়ে নিতে হয়েছে। দ্বিতীয় লাইনে মাত্র মধ্যম ও পঞ্চমে অল্প নড়াচড়ার পর 'অবসান' কথাটির শেষে একটি ছোট্ট মীড়-যুক্ত পা -র্সা-এর ধাক্কা লাগানো হয়েছে— হয়তো এই কারণে যে সব দুর্বলতা ও সংশয়ের অবসানই এখানে কাম্য লক্ষ্য।

অন্তরায় 'শক্তির' শব্দটিতে আছে শুধু দু মাত্রার মা ও দু মাত্রার পা। এ শুধু চতুর্মাত্রিক তালকে অনুসরণ করার জন্যেই নয়, শক্তির আন্তরিক ঋজুতাও এতে প্রকাশিত। 'নির্ঝর' শব্দটিতে আছে পঞ্চমের মধ্যস্থতায় দুই নিষাদ (ণা ও না) এবং 'নিত্য ঝরে'-তে কেবল শুদ্ধ না ও র্সা। এই ক্রমিক ঊর্ধ্বগতি সর্বাধিক তীক্ষ্ণতা অর্জন করেছে 'ললাট-'পরে' শব্দটিতে এসে ('ললাট-'পরে' = র্রা। র্মা -র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞর্মা। র্রা -।)— সম্ভবত এই কারণে যে ললাট-স্পর্শনের দ্বারাই অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এখানে সুরের যৎসামান্য অলংকরণও লক্ষণীয়। তার পর সুর ক্রমশ নেমে এসেছে মধ্য-সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত, যেখান থেকে নতুন 'দীক্ষা' ও 'শিক্ষা'র সূত্রপাত। লক্ষ করতে হবে যে 'ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা' ও 'বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা' একই স্বর-সমন্বয়ে গঠিত, যেন একই ধরনের মঙ্গল-কামনা দু-বার উচ্চারিত হল, শুধু প্রথম উচ্চারণের শেষ দিকে পা থেকে একটা অতিরিক্ত মীড়-যুক্ত ণা যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় উচ্চারণটিকে সহজসাধ্য করার জন্যে, সঙ্গে সঙ্গে সামান্য বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি হয় এর ফলে। এর পর কেবল 'নিষ্ঠুর' শব্দটিকে তার-সপ্তকের সা-এর ওপর দাঁড় করিয়ে সুর ক্রমশ নেমে আসে কোমল গান্ধারের মধ্য দিয়ে মধ্য-সপ্তকের সা-এর প্রশান্তিতে, যেখানে দুঃখই হয়ে উঠবে মানুষের পরম বিত্ত।

সঞ্চারীতে এসে রবীন্দ্র-সৃষ্টি আবার দেখা দিয়েছে বিশিষ্ট মূর্তিতে। এখানে 'যাত্রী'কে দিবারাত্র এগিয়ে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে, কিন্তু যেহেতু এই যাত্রী অমৃতলোকের পথ অনুসন্ধান করছে সেহেতু তার যাত্রার সংকল্পকে হতে হবে অবিচল। তাই প্রথম লাইনের প্রথম চারমাত্রায় কেবল সা, দ্বিতীয় চারমাত্রায় কেবল রা, তৃতীয় চারমাত্রায় কেবল সা ও রা, চতুর্থ চার মাত্রায় কেবল মা ও জ্ঞা— এই নিয়েই 'চলো যাত্রী,

চলো দিনরাত্রি' ; 'করো' এরই অনুসৃতি ; তার পর 'অমৃতলোকে'-তে মধ্যমই প্রবল ; অতঃপর সুর ধীরে ধীরে নামতে নামতে সামান্য একবার মন্দ্র-সপ্তকের শুদ্ধ নিষাদকে স্পর্শ করে সা-তে এসেই স্থিতি। শৈলজারঞ্জন মজুমদার আমাদের জানিয়েছেন (শান্তিদেব ঘোষও অনেকটা একই কথা উল্লেখ করেছেন) যে এভাবে 'একই সুরের ওপর কিছুক্ষণ থেমে থাকা' রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'অন্য কোনও গানে এতো অতিমাত্রায়, যাকে বলে austerity বা ভোগসংযম বোধহয় নেই।' গানের বিশিষ্ট 'মুড'-এর প্রকাশেই এই austerity বিশেষ তাৎপর্য পায়। সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় কবি অনেক আগেই বুঝে নিয়েছিলেন যে, 'দরকার নেই "প্রভূত" কারুকৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়— অতি সূক্ষ্ম, অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।' যদি আনন্দ পাওয়া যায় তা হলে 'তার মধ্যে উপাদানের যতই স্বল্পতা থাকবে ততই তার গৌরব।' ('সংগীতচিন্তা', পৃ. ১১২)। আলোচ্য গানটি, বিশেষ করে তার সঞ্চারী, এ কথার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আভোগ অংশ অবশ্যই কিছুটা পরিমাণে অন্তরার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু পুরোপুরি নয়। যেখানে ক্লান্তিজালকে 'দীর্ণ বিদীর্ণ' করা হচ্ছে সুর সেখানেই সবচেয়ে তীক্ষ্ণতা পাবে ('বিদীর্ণ' = র্রা। র্মজ্র্রা -। জ্র্রা -।), এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু ঠিক তার পরের 'দিন-অন্তে' কথাটির ওপর তার-সপ্তকের মধ্যম বরং আরও দীর্ঘকালীন স্থিতি লাভ করেছে— হয়তো এই কারণে যে শিল্পীর কাছে মানুষের 'অপরাজিত' চিত্তই শেষ পর্যন্ত 'মৃত্যুতরণ তীর্থে' স্নান করার অধিকারী।

বর্তমান আলোচনার শেষ গান 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার'। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গান— এবং অতুলনীয় গান, এর 'সেন্টিমেন্ট' আগেকার গানগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর রূপ আলাদা, চলন আলাদা, সত্তাই আলাদা, এর সঙ্গে তুলনীয় সম্ভবত অন্য কোনো গানই নেই, অথচ কাফি রাগের শাস্ত্রসম্মত স্বর-নির্বাচন থেকে কোথাও বিচ্যুতিও নেই। গানটি শোনা গেছে 'রক্তকরবী' নাটকে বিশু পাগলের মুখে, কিন্তু সে কেবল আস্থায়ী-অন্তরা, সামান্য একটু পাঠভেদও আছে ; 'গীতবিতান'-এর পাঠে সঞ্চারী ও আভোগ যুক্ত হয়েছে, কিন্তু নাটকের মূল মেজাজটি তো নষ্ট হয়-ই নি, বরং তাতে আরও গভীরতর রঙ লেগেছে। নায়িকা নন্দিনী মুখোমুখি হয়েছে প্রধানত তিন জন পুরুষের— একজন যক্ষপুরীর রাজা, থাকেন জালের আড়ালে, প্রচণ্ড তার শক্তি, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ক্লান্ত, রিক্ত, বিরক্ত। দ্বিতীয় রঞ্জন, আছে সম্পূর্ণ নেপথ্যে, তবু তারই মধ্যে নন্দিনী দেখেছে যৌবনের দুর্জয় সাহস— প্রাণ নিয়ে সর্বস্বপণ খেলায় সে নন্দিনীকে জিতে নিয়েছে। আর তৃতীয় জন হচ্ছে বিশু পাগল— সে একান্তই প্রত্যক্ষ, সে গান গায়, কিন্তু যে-দুঃখের গান সে গায় তার খবর নন্দিনী এই যক্ষপুরীর জমাট-বাঁধা অন্ধকার প্রত্যক্ষ করার আগে কোনোদিন টেরই পায় নি। রাজা এখানে প্রাণের রিক্ততার দিক, রঞ্জন প্রাণের স্ফূর্তির দিক, আর বিশু প্রাণের বেদনার দিক। আলোচ্য গানটি হল এক অতলস্পর্শ বেদনার মর্মান্তিক গান। 'রক্তকরবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে (ডিসেম্বর ১৯২৬), কিন্তু গানটি 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে, কবির বয়স তখন ৬৩ বছর। গানের স্বরলিপিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('স্বরবিতান' প্রথম খণ্ড)।

গানটির রহস্যময়তার যেন শেষ নেই। আরম্ভে আছে চাঁদের আলোয় চোখের জলের জোয়ার, শেষে আছে 'হাসে অন্ধকারে', আর মাঝখানে আছে 'আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে'— গানের প্রাণকেন্দ্র হয়তো এখানেই, এবং এখানেই যেন চেনা কূলের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এখানে কবিতার অর্থের চেয়ে গানের ব্যঞ্জনাটাই প্রধান, এবং সেই ব্যঞ্জনাটি প্রকাশ পাচ্ছে বিশেষ কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। প্রথমত, সব শেষের 'অন্ধকারে' শব্দটি ছাড়া সমগ্র গানে আর কোথাও যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ নেই, ভাষা অত্যন্ত সরল, কথাগুলি খুবই সাধারণ, ফলে শ্রোতার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগই রাখেন নি কবি। দ্বিতীয়ত, সঙ্গে রয়েছে দীর্ঘ স্বরের, বিশেষত এ-কার ও আ-কারের, বাহুল্য। তরী চেনা কূলের বাঁধন খুলে অচেনার ধারে ভেসে চলেছে— তাই 'এ'-কারের বাহুল্য। আর পারাবারের কানায় কানায় কানাকানির মধ্যে আকুল আলোর দিশাহারা রাত— তাই 'আ'-কারের প্রাধান্য। লক্ষ করতে হবে, এই এ-কার, বিশেষত আ-কারকে, আশ্রয় করেই সুর

বিশেষভাবে দীর্ঘায়িত, লীলায়িত হয়ে উঠছে। অন্য স্বরবর্ণও নেই তা নয়, কিন্তু তারাও প্রায়শ দীর্ঘ— অন্তত তাদের আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘ-স্বরের মতো। এই দীর্ঘায়িত চলনকে সাহায্য করেছে বিলম্বিত লয়ের চতুর্মাত্রিক তাল। বোধ হয় তাল ছাড়া গাইলেও খুব একটা ক্ষতি নেই, তবু তালের যে একেবারে প্রয়োজন নেই তা-ও নয়, কেননা প্রত্যেকটি musical phrase-ই ৪ + ৪ অর্থাৎ ৮ মাত্রায় প্রসারিত। মাঝে মাঝে আছে সামান্য কয়েকটি অক্ষর বা কিছু ঘননিবদ্ধ কথা, তার পরেই দীর্ঘ একটি সরল টান বা অলংকৃত স্বরগুচ্ছ— এই প্রকরণই সারা গানে অনুস্যূত। এখন আমরা গানের স্তবক-বিন্যাসটি লক্ষ করি :

১. আস্থায়ী	:	'ও চাঁদ, চোখের	...	এ পারে ওই পারে' ॥
২. অন্তরা	:	'আমার তরী ছিল	...	অচেনার ধারে' ॥
৩. সঞ্চারী	:	'পথিক সবাই	...	দিশাহারা রাতে'।
৪. আভোগ	:	'সেই পথ-হারানোর	...	হাসে অন্ধকারে' ॥

প্রথম তুকের আরম্ভেই আছে 'ও চাঁদ' এই দুটি কথা। কিন্তু সুর আরম্ভ হয়েছে 'চোখের জলে' থেকে, 'ও চাঁদ' এসেছে গোটা পঙ্‌ক্তির শেষে— তা না হলে বোধ হয় চাঁদের অমোঘ টানটি ঠিক প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। তার পর ওই একই কথার একই সুরে পুনরাবৃত্তি হয়েছে আস্থায়ী, অন্তরা ও আভোগের শেষে, এবং সর্বত্রই 'ও চাঁদ' = ন্‌সা -রজ্ঞা -মজ্ঞা -া। রা -া। এই শেষের শুদ্ধ ঋষভটি শাস্ত্রীয় ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে 'ন্যাস'-স্বর, অর্থাৎ সেই স্বর যেখানে রাগের রূপ পূর্ণতা লাভ ক'রে বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রলাল রায় ঋষভকেই বলেছেন, কাফি রাগের 'অংশ' বা বাদী স্বর, এ কথা আমরা আগেই দেখেছি। 'অংশ' স্বরের ন্যাস-স্বর হতে শাস্ত্রীয় কোনো বাধা নেই। কিন্তু শ্রোতার কানে ঋষভটি সত্যি সত্যিই হয়ে ওঠে একটি প্রত্যাশিত ও প্রতীক্ষিত বিশ্রামস্থান।... কিন্তু, এই 'চাঁদ'টি এখানে কে? হয়তো অংশত বিশু পাগলের অতীত প্রেমের স্মৃতি, যার টানে বিশু যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদাইয়ের কাজে নেমে এসেছে, কিন্তু নাট্যমঞ্চে প্রত্যক্ষত আছে নন্দিনী, তার 'দুখজাগানিয়া' তার 'সমুদ্রের অগম পারের দূতী'। সুরে 'চোখের' কথাটি আছে টানা ৬ মাত্রায় সা-এর ওপর দাঁড়িয়ে, 'জলের' কথাটিতে কেবল দু মাত্রার সা রা, 'লাগল'-তে মন্দ্র-সপ্তকের কোমল নিষাদ এসেছে, কিন্তু তার পরেই 'জোয়ার' কথাটিতে এসেছে বিশেষ যত্নকৃত একটি অলংকার (সা। ন্‌সা -রজ্ঞা রা -া)। এই রকম অলংকার আছে 'পারাবার' কথাটিতেও (পধা [ণ]পা। মা -া -পধপা -মপা। [জ্ঞ]মা -া -জ্ঞরা -সা)— রচয়িতার উদ্দেশ্য বুঝতে খুব অসুবিধে হয় না। পুনরায় অলংকৃত হয়েছে 'কানাকানি' (মা পা -মর্সা র্সা। র্সা -া -ণর্সর্রা -ণা) এবং 'এই পারে ওই পারে' (ধা -র্সা [র্স]ণা -া। -া -া ধা পধপা। [প]মা -া -পধপা -মপা। মজ্ঞা -া -জ্ঞরা -সা)। প্রথম 'পারে'র 'পা'-তে আছে কোমল নিষাদের কিছুটা দীর্ঘ একটি টান, কিন্তু দ্বিতীয় 'পারে'র 'পা'-তে এবং 'রে'-তে এসেছে ওই অসামান্য দুটি অলংকরণ— অসামান্য, কিন্তু বড়োই অন্তরঙ্গ— অন্তরঙ্গ না হলে কানাকানি হয় কী করে, এবং তার পরেই 'ও চাঁদ' এই সম্বোধন এবং প্রথম লাইনে প্রত্যাবর্তন।

অন্তরাতে 'আমার তরী'র যাত্রা শুরু হয়েছে শুদ্ধ মধ্যম থেকে। 'তরী ছিল'-তে যেভাবে মধ্যম থেকে কোমল নিষাদ, শুদ্ধ ধৈবত ও শুদ্ধ নিষাদের সমাবেশ হয়েছে তাতে কেউ কেউ হয়তো কিছুটা বাহার রাগের আভাস পেতে পারেন। কিন্তু এই বাহার কাফি ঠাটেরই অন্তর্ভুক্ত, কাজেই একেবারে শাস্ত্র-বহির্ভূত নয়, অথচ আশ্চর্য সুন্দর। 'তরী'র শেষে কোমল নিষাদ (তৎসহ শুদ্ধ ধৈবত) কিছুটা দীর্ঘায়িত না হলে তরীর অকূল যাত্রা ধরা পড়ত না। কিন্তু পরিত্যক্ত চেনা কূলের আকর্ষণও তো কিছু কম ছিল না, তাই 'চেনার' কথাটির ওপরেও এসেছে এতটা অন্তরঙ্গ অলংকরণ, সঙ্গে সঙ্গে এতটা তীক্ষ্ণতা ('চেনার' = না র্সনা -ধনা -র্সর্রসা)। 'বাঁধন যে তার' অংশে প্রথমেই পা থেকে তার-ষড়্‌জের ধাক্কা, তার পর দীর্ঘ ৭ মাত্রা জুড়ে ঋষভে স্থিতি— বুঝিয়ে দিচ্ছে যে চেনা বিশ্বের কঠিন বন্ধনটি আর নেই, 'গেল খুলে'-তেও সেই বাঁধন-ছেঁড়া যাত্রারম্ভের ইঙ্গিত। কিন্তু সুরটি যখন কিছু পথ ঘুরে পঞ্চমে ফিরে আসে তখনই আভাসে বুঝিয়ে দেয় দিক-হারানোর বেদনা। তাই 'হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল'-তে আর-একবার ধরা পড়ে বেদনার তীব্রতা, বিহ্বলতা। প্রথম 'হাওয়ায়'

কথাটি দীর্ঘায়িত, দ্বিতীয় 'হাওয়ায়' কেবলমাত্র দু মাত্রার ধা ণা। 'কোন অচেনার ধারে' অংশের 'কোন্' কথাটির ওপর আছে মা থেকে ণা-এর ওপর ছোট্ট একটি মীড়, এটা 'কোন্'-এর অনির্দেশ্যতাকে বুঝিয়ে দেয়। আর 'ধারে' কথাটির ওপর আছে ৮ মাত্রা ব্যাপী আর-এক অসামান্য অলংকরণ— কিছুটা টপ্পা-আঙ্গিকে— কেননা এই 'ধারে' কোনো কিনারায় নয়, এ আছে 'অচেনার' প্রান্ত ছুঁয়ে।

সঞ্চারীতে এসে বর্তমান লেখককে একটু থমকে দাঁড়াতেই হয়, স্বীকার করতেই হয় যে এর সৌন্দর্য, এর বেদনা বিশ্লেষণ করা তার সাধ্যের অতীত। 'পথিক সবাই'-এর প্রথম দুই অক্ষরকে দু মাত্রায় মজ্ঞা জ্ঞা-তে রেখে ওই কোমল গান্ধারকে আরও চারমাত্রায় টেনে 'পথিক' কথাটিকে সম্পূর্ণ করা হল, 'সবাই' = দুমাত্রার রা সা ; 'পেরিয়ে গেল'-তে রা পা প্রাধান্য পেয়েছে, তার পর ধৈবত ছুঁয়ে মধ্যম। 'ঘাটের কিনারাতে' এসে পঞ্চম থেকে কোমল নিষাদ পর্যন্ত ছোট্ট একটি মীড়, এবং ওই নিষাদকেই টেনে যাওয়া ; 'কিনারাতে' কথাটিকেও আস্তে আস্তে লীলায়িত ও দীর্ঘায়িত করা হয়েছে ১০ মাত্রা জুড়ে। 'আমি সে কোন্' অংশে এক মাত্রার ঋষভ সহ কোমল গান্ধারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এবং তার পরেই আছে 'আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে'। 'আকুল আলো' এবং 'দিশাহারা রাতে'র অর্থ কী ? আলংকারিক দৃষ্টিতে এরা হয়তো transferred epithet-এর দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাতে কিছুই বোঝানো হয় না। 'আকুল' কথাটির ওপর আছে রা রজ্ঞা -মজ্ঞা -রজ্ঞা, অর্থাৎ কোমল গান্ধারের প্রাধান্য, কিন্তু এর পরেই যে 'আলোয়' শব্দটি এসেছে সেটি কোন্ আলো ? কেননা, এখানে এসেই প্রথম দেখছি শুদ্ধ গান্ধারের প্রয়োগ এবং তার পর 'দিশাহারা রাতে' অংশেও গান্ধার মানেই শুদ্ধ গান্ধার। এই শুদ্ধ গান্ধারটির স্পর্শ পাওয়া মাত্রই শ্রোতাকে বিহ্বল হয়ে পড়তে হয় ; তখন এর অতলস্পর্শ গভীরতাকে শুধু অনুভব করাই যায়, বুঝে নিতে হয় যে এ-কাজ মহাশিল্পীর কাজ— বাক্য বিচার এখানে অর্থহীন। 'দিশাহারা' = গা গা মা পা, অর্থাৎ চার মাত্রা— এখানে আছে তিনটি আ-কার ; এবং এর শেষ আ-কারটিকে অনুসরণ করে আরও চার মাত্রার একটি ছোটো কিন্তু অসামান্য তান : -পধাপা -মগা -রগা -মপা ; 'রাতে' কথাটিতে আছে মাত্র গা মা, কিন্তু এই মধ্যম আরও ৬ মাত্রা জুড়ে প্রসারিত।... এর পর কেবলই মনে হচ্ছে, এই বেদনা তো কেবল 'সহৃদয়জনবেদ্য', তা হলে এত কথার দরকার কী ! বর্তমান আলোচকের ব্যর্থতা নতমস্তকে স্বীকার করতেই হয়।

আভোগ অংশটি অবশ্য এখানেও কিয়ৎপরিমাণে অন্তরারই পুনরাবৃত্তি। তবু এখানেও একেবারে শুরুতেই কিন্তু নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। আগের সঞ্চারীতে মধ্যমের দীর্ঘায়িত টানে যে বেদনার স্তব্ধতা নেমে এসেছিল তাকে মর্যাদা দিয়ে আভোগের ছন্দ-বহির্ভূত 'সেই' কথাটিকে আর কোনোভাবেই সঞ্চারীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি ; তাই ওই কথাটিকে আভোগের প্রারম্ভে এক মাত্রায় রেখে তবে সুরকে অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো পরিবর্তনকে উল্লেখ না করলেও চলে। তবু 'দিক্-ভোলাবার' কথাটির বিশিষ্ট স্বর-সমাবেশ, 'আমার' কথাটি নিয়ে অল্প কিন্তু অন্তরঙ্গ খেলা আর 'হাসে অন্ধকারে' কথাগুচ্ছের ওপর উচ্চারণ ও স্বর-বিন্যাসের বিচিত্র প্রয়োগ কোনোক্রমেই অন্তরার পুনরাবৃত্তি নয়, হওয়া উচিতও ছিল না— বোধহয় সম্ভবও ছিল না। এর অর্থ, প্রতিটি কথাগুচ্ছকে কবি গভীর মমতায় বিশিষ্ট সুর-সজ্জায় সজ্জিত করেছেন— মূল সুরটিকে পটভূমিতে রেখেই।

টীকা

১. সন্‌জীদা খাতুন সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে আমার একটু আপত্তি আছে। বস্তুত সন্‌জীদা খাতুনের আলোচ্য বিষয়ই হল 'রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ'।

‘ছোটো গল্প’ আর ‘শেষ কথা’ : পাঠভেদের প্রকৃতি

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

‘ছোটো গল্প’ বেরিয়েছিল ‘দেশ’ পত্রিকায় (৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬)। ‘শেষ কথা’ নামে তারই নতুন-করে-লেখা রূপ বেরল ‘শনিবারের চিঠি’-তে (ফাল্গুন ১৩৪৬)। ‘তিন সঙ্গী’ গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে দ্বিতীয়টিই। মাত্র দু মাসের মধ্যে গল্পটি এমন ঢেলে সাজার দরকার পড়ল কেন ? এ বিষয়ে কোনো তথ্য হাতে নেই। দুটি গল্প পাশাপাশি রাখলে প্রথমেই চোখে পড়ে : নতুন রূপটি আকারে অনেক ছোটো হয়ে গেছে। বিয়োগ হয়েছে বিস্তর, যোগ কম। দু-এরই কিছু তাৎপর্য আছে।

তিনটি ভাগ ছিল ‘ছোটো গল্প’-র : শেষ কথা, প্রথম পর্ব, অন্তপর্ব। প্রথম ভাগটি পরে পুরোপুরি বাদ গেছে। তার কারণ বোঝা শক্ত নয়। আমি-র আঙ্গিকে নায়কের বয়ানে যে-গল্প লেখা হয়, তার সূচনায় অনেক তত্ত্বকথা এসে গিয়েছিল। প্রাক্তন-বিপ্লবী-পরে-ভূতত্ত্ববিদ্ চরিত্রটির সঙ্গে তা একেবারেই খাপ খায় না।[১] সব পর্বনাম তুলে দিয়ে, একটানা লিখে যাওয়ায় গল্পের গড়নও অনেক আঁট হয়েছে।

বদলাবার সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে-কোনো লেখাই মাজাঘষা করতেন। চির-অতৃপ্ত বাক্‌শিল্পী চাইতেন এক শব্দ বদলে আরও লাগসই শব্দ বসাতে, বা কিছু এধার-ওধার করে যেটুকু উন্নতি করা যায় তার সদ্‌ব্যবহার করতে।

‘ছোটো গল্প’-র প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল এইভাবে :

> জীবনের প্রবহমান ঘোলারঙের হ-য-ব-র-ল’র মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধ’রে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়ক-নায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আসে। গল্পের গোড়ায় প্রাক্‌গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাতে কিছু সময় নেবে। আমি যে কে, সে কথাটা পরিষ্কার করে নিই।
>
> কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে চেনাশোনার মহলে গল্পের যাথাযথ্যের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। এ কথা সবাই বোঝে না, ঠিকঠাক সত্য বলবার এক কায়দা আর তার চেয়েও বেশি সত্য বলার ভঙ্গী আলাদা।
>
> কী নাম নেব তাই ভাবছি। রোম্যান্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকে গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমসুরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলনসই। ওর শাম্‌লা রঙটা মেজে ফেলে গিল্‌টি লাগালে ওটা হতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত, কিন্তু খাঁটি শোনাত না।

‘শেষ কথা’-য় এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে :

> জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-ল’র মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা অপন রূপ ধরে সদ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়ক-নায়িকারা আপন পরিচয়ের সূত্র গেঁথে আসে। পিছন থেকে সেই প্রাক্-গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাই কিছুটা সময় নেব, আমি যে কে সেই কথাটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে। কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে জানাশোনা মহলের জবাবদিহি সামলাতে পারব না। কী নাম নেব তাই ভাবছি, রোম্যান্টিক নামকরণের দ্বারা গোড়া থেকেই গল্পটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমসুরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলে যেতে পারবে। ওর বাস্তবের শ্যাম্‌লা রঙটা ধুয়ে ফেলে করা যেতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত ; কিন্তু তা হলে খাঁটি শোনাত না, গল্পটা নামের বড়াই করে লোকের বিশ্বাস হারাত, লোকে মনে

করত ধার-করা জামিয়ার প'রে সাহিত্যসভায় বাবুয়ানা করতে এসেছে।

তিনটি অনুচ্ছেদ পরিণত হয়েছে একটিমাত্র অনুচ্ছেদে। মধ্যে বিয়োগ হয়েছে, যোগ হয়েছে শেষে। অল্প বদল হয়েছে বাক্যের গড়নে। কিন্তু এগুলো খুব বড়ো কথা নয়। 'ছোটো গল্প'-র চতুর্থ অনুচ্ছেদের একটি বাক্যের সঙ্গে 'শেষ কথা'র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বাক্যটির এমনই একটা ছোট্ট তফাত আছে। প্রথমে ছিল : 'আমি ছিলুম বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন।' পরের পাঠে 'ছিলুম'-টা বাদ গেছে।

এরকম অনুচ্ছেদ-জোড়া, বাক্যের প্রসার বা সংকোচন, বাক্যাংশের সংযোজন বা বর্জন, শব্দপরিবর্তন ইত্যাদি চলতেই থাকে। তার পুরো তালিকা করার বোধহয় কোনো দরকার নেই। কবিতার ক্ষেত্রে এই ধরনের পাঠভেদের গুরুত্ব অনেক। গল্প-উপন্যাস-নাটকের বেলায় পুনর্লিখনের দরকার পড়ে মূলত অন্য কারণে : বক্তব্য ও/বা চরিত্রচিত্রণের ব্যাপারে লেখক যদি কোনো সংস্কার করতে চান, তখনই। এ ক্ষেত্রেও যেসব পাঠান্তর গল্পটির ভাববস্তু ও চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত, আমরা শুধু সেগুলির দিকেই নজর দেব। তাৎপর্য আছে বা থাকতে পারে এমন শব্দপরিবর্তন, গল্পের কোনো কোনো অংশ বর্জন ও সংযোজন— এই তিনটি প্রসঙ্গই আলোচনায় আসবে।

'ছোটো গল্প'-র গোড়ার দিকে ছিল হেনরি ফোর্ড-এর সঙ্গে নবীনমাধবের সাক্ষাতের বিবরণ। নবীনমাধব ভেবেছিল '...ফোর্ডকে যদি একটুখানি আভাস দিয়ে যাই যে নিজের স্বার্থসিদ্ধি আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই দেশকে বাঁচাতে, তা হলে ধনকুবের বুঝি বা খুশি হবে, এমন-কি দেবে আমার রাস্তা প্রশস্ত করে।' ঘটল তার উল্টো। 'অতি গম্ভীরমুখে ফোর্ড্ বললে, "আমার নাম হেনরি ফোর্ড, পুরোনো পাকা ইংরেজি নাম। কিন্তু আমি জানি আমাদের ইংলন্‌ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, ইন্‌এফীসিয়েন্ট্, তাদের আমি কেজো করে তুলব এই আমার সংকল্প।" '

'শেষ কথা'-য় এটি হয়ে দাঁড়াল :

> মনে হল ফোর্ড্‌কে যদি একটুখানি আভাস দিই যে, আমার উদ্দেশ্য নিজের উন্নতি করা নয়, দেশকে বাঁচানো, তা হলে স্বাধীনতাপূজারী আমেরিকার ধনসৃষ্টির জাদুকর বুঝি খুশি হবে, এমন-কি আমার রাস্তা হয়তো করে দেবে প্রশস্ত। ফোর্ড্ চাপা হাসি হেসে বললে, 'আমার নাম হেনরি ফোর্ড, পুরাতন ইংরেজি নাম। আমাদের ইংলণ্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, তাদের আমি কেজো করব— এই আমার সংকল্প।'

এর পরে 'ছোটো গল্প'-য় ছিল :

> অর্থাৎ অকেজো টাকাওয়ালাকে কেজো করবে কেজো টাকাওয়ালা স্বগোত্রের লাইন বাঁচিয়ে, আমরা থাকব চিরকাল কেজোদের হাতে কাদার পিণ্ড। তারা পুতুল বানাবে। এই দুঃখেই গিয়েছিলুম একদিন সোভিয়েটের দলে ভিড়তে। তারা আর যাই করুক কোনো নিরুপায় মানব-জাতকে নিয়ে পুতুলনাচের অর্থকরী ব্যবসা করে না।

'শেষ কথা'-য় কিন্তু এর বদলে আসে দুটিমাত্র বাক্য :

> আমি ভেবেছিলুম, ভারতীয়কেও কেজো করে তুলতে উৎসাহ হতেও পারে। একটা কথা বুঝতে পারলুম, টাকাওয়ালার দরদ টাকাওয়ালাদেরই 'পরে।

ফোর্ড আর শুধু 'ধনকুবের' নন, তিনি এখন 'স্বাধীনতাপূজারী আমেরিকার ধনসৃষ্টির জাদুকর'। 'গম্ভীরমুখে'-র বদলে এসেছে 'চাপা হাসি'। ইংরিজি শব্দ 'ইনএফীসিয়েন্ট্' বাদ গেছে, 'পুরনো' হয়েছে 'পুরাতন'। এই সবকটি পরিবর্তনই তুল্যমূল্য নয়। তবে আশা আর আশাভঙ্গের ব্যাপারটা সংক্ষেপ করার ফলে দ্বিতীয় পাঠেই যেন আরও ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

তবু, 'সোভিয়েটের দলে ভেড়া'র কথা একদম বাদ পড়ল কেন ?[২] একটু পরেই সেটি আমরা দেখব।

'ছোটো গল্প'-য় এক খনি-ধর্মঘটের কথা আসে। নবীনমাধব তাতে খুবই ক্ষুব্ধ। তার মতে, 'কোনো কারণ ছিল না— কেন না আমি নিজে সোশালিস্ট, সেখানকার বিধিবিধান আমার নিজের হাতে বাঁধা, কারও সেখানে না ছিল লোকসান, না ছিল অসম্মান।' অচিরার কিন্তু তা মনে হয় নি। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে সে এসে হাজির হয়, 'উত্তেজিতভাবে' নবীনমাধবকে বলে, 'আপনি মোটা মাইনে নিয়ে ধনিকের নায়েবি করছেন, এ দিকে গরীবের দারিদ্র্যের সুযোগটাকে নিয়ে আপনি— ।' রেগে ওঠে নবীনমাধব, আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টাও করে, কিন্তু তার দুর্বলতা কিছুতেই চাপা পড়ে না। অচিরার অভিযোগটাই যেন প্রমাণ হয়ে যায়।

> অচিরা বললে, "সব বুঝলুম। কিন্তু আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছি দেখতে, এই স্ট্রাইক মেটাতে আপনি নিজে কবে যাবেন। নিশ্চয়ই আপনাকে ডাকও পড়েছিল। কিন্তু কেন যান নি।"
>
> চাপা গলায় বলতে চেষ্টা করলুম, "এখানে কাজ ছিল বিস্তর।"
>
> কিন্তু ফাঁকি দেব কী করে? আমার ব্যবহারে তো আমার কৈফিয়তের প্রমাণ হয় না।
>
> কঠিন হাসি হেসে দ্রুত পদে চলে গেল অচিরা।
>
> আর চলবে না। একটা শেষ নিষ্পত্তি করাই চাই। নইলে অপমানের অন্ত থাকবে না।

প্রথমেই একটা জিনিস দেখার আছে। গল্পের মূল ভাববস্তুর সঙ্গে এই উপাখ্যানের কোনো যোগ নেই। হয়তো এটিকে উপলক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ 'শেষ নিষ্পত্তি' করার কথা ভেবেছিলেন। নতুন করে লিখতে বসে মনে হল : এর কি দরকার আছে? বিনা উপলক্ষেই তো সেটি করা যায়। 'শেষ কথা'-য় তাই নবীনমাধব ও অচিরার আলাপের এই মধ্যপর্বটা বাদ পড়ে। নবীনমাধব বলে :

> আমার গল্পের আদিপর্ব শেষ হয়ে গেল। ছোটগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটা ফলিয়ে বলবার লোভ করব না, ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাই নে।
>
> অচিরার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলার যুগ [?] এল সংক্ষেপেই।

'ছোটো গল্প'-য় শেষ অনুচ্ছেদটি ছিল না।

মনে হতে পারে, 'সোভিয়েটের দলে ভেড়া' আর এই ধর্মঘটের প্রসঙ্গ বাদ না-পড়লেই ভালো হত। কিন্তু দুটোই একসঙ্গে বাদ পড়ায় একটা সুবিধে হয় : নবীনমাধবের চরিত্রে আর কোনো অসংগতি থাকে না। অচিরার কাছে সে সর্বদাই প্রণম্য থাকতে পারে। সে তো লেখকের সহানুভূতি-পাওয়া চরিত্র। ধর্মঘটের ব্যাপারে তার ভূমিকা যেন তাকে সেই সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করছিল। আর, অচিরাকে রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকে যে-ভাবে হাজির করেছেন— মানুষের সংসর্গ এড়িয়ে শুধু দাদুর সঙ্গেই দিন কাটায়— তার সঙ্গেও অচিরার এই উত্তেজনা, 'কঠিন হাসি'র মিল ছিল না। দুটি চরিত্রের সংগতি রাখার জন্যেও, 'সোভিয়েটের দলে ভেড়া' আর ধর্মঘটের প্রসঙ্গ বাদ পড়ে।

'ছোটো গল্প'-য় সাঁওতালদের পার্বণের সময়ে অচিরার উৎসাহের কথা ছিল : 'অচিরা ওদের পরম বন্ধু। মদের পয়সা জোগায়, সালু কিনে দেয় সাঁওতাল ছেলেদের কোমর [কোমরে ?] বাঁধবার জন্যে, বাগান থেকে জবা ফুলের জোগান দেয় সাঁওতাল মেয়েদের চুলে পরবার। ওকে না হলে তাদের চলেই না।'—এটুকু বাদ দিয়েও বোধহয় ভালোই হয়েছে। অন্তরাহত যে-মেয়েটি দিন কাটায় একা-একা, এই ঘটনাও তার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। শেষ নিষ্পত্তির পরিবেশ তৈরির জন্যেই ওই পার্বণের কথা এসেছিল। বাদ পড়ায় মূল গল্পের কোনো ক্ষতি হয় নি।

এই দুটি অংশ বর্জনের ফলে দুটি চরিত্রই আরও সুসংগত রূপ পায় ; লেখকও তাঁর ভাববস্তুকে আরও সংহত চেহারা দিতে পারেন।

এইসব পরিবর্তন ও বর্জন তাই গল্পের নিজের যুক্তিতেই এসেছে। এর ফলে, সমস্ত প্রসঙ্গান্তর এড়িয়ে গল্পটিকে অনেক বেশি ঋজু করা সম্ভব হয়েছে। এর চেয়ে আরও তাৎপর্যময় পরিবর্তন এসেছে তার পরে : 'বিদায় অভিশাপ'-এর ব্যাখ্যায়।

ওই কবিতাটি লেখার (১৮৯৩) পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন : পাঠকদের মধ্যে তার নানা ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে। 'কাব্যের তাৎপর্য' ('পঞ্চভূত') প্রবন্ধে, পঞ্চভূতের মুখে পঞ্চভাষ্য শুনিয়ে তিনি নিজের মন্তব্য যোগ করেছিলেন : '...যখন কবিতাটি লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থই মাথায় ছিল না : তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড়ো নিরর্থক হয় নাই— অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না।' অতগুলো ভাষ্য সত্যিই হাজির হয়েছিল কিনা তা বলা শক্ত। হতে পারে, সবকটিই রবীন্দ্রনাথের মনগড়া। কিন্তু তাঁর মনেও যে একটি ব্যাখ্যা ছিল তা বোঝা যায় 'ছোটো গল্প'-য় এসে। সেখানে দুবার কবিতাটির কথা ওঠে। প্রথমে অচিরা একটি ব্যাখ্যা দেয় তার নিজের বয়ানে :

> কচ ও দেবযানী বলে একটা কবিতা আছে। তার শেষ কথাটা এই, মেয়েদের ব্রত পুরুষকে বাঁধা আর পুরুষের ব্রত মেয়ের বাঁধন কাটিয়ে স্বর্গলোকের রাস্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিলেন দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আর আপনি মায়ের অনুনয়— একই কথা।

পরে, দাদুর বয়ানে অচিরা আবার বলে :

> দাদু একদিন আমাদের কলেজ-ক্লাসে কচ ও দেবযানীর ব্যাখ্যা করছিলেন। কচ হচ্ছে পুরুষের প্রতীক, আর দেবযানী মেয়ের।

'শেষ কথা'-য় অচিরার বয়ানের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও কয়েকটি কথা :

> মেয়েপুরুষের এই চিরকালের দ্বন্দ্বে আপনি জয়ী হয়েছেন। জয় হোক আপনার পৌরুষের। কাঁদুক মেয়েরা, সে কান্না আপনারা নিন পূজার নৈবেদ্য। দেবতার উদ্দেশে আসে নৈবেদ্য। কিন্তু দেবতা থাকেন নিরাসক্ত।

আর দাদুর বয়ানটা পুরো বাদ যায়, শুধু উল্লেখটুকু থাকে : 'মনে আছে, দাদু, অনেক দিনের কথা [,] যখন কলেজে ছিলে, আমাকে কচ ও দেবযানীর কবিতা শুনিয়েছিলে ?'

'কবিতা'র কথা থাকায় 'মহাভারত' বা 'মৎস্যপুরাণ'-এর কচ-দেবযানী উপাখ্যান এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়, থাকে শুধু 'বিদায় অভিশাপ'।[৩] কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা আছে। 'ছোটো গল্প'-য় দেখি, দেবযানী কচকে অভিসম্পাত দিয়েছিল : 'তোমার সাধনায় পাওয়া বিদ্যা তোমার নিজের ব্যবহারে লাগাতে পারবে না।' 'শেষ কথা'-য় সেটি একটু বদলে গেছে : 'তোমার জ্ঞানসাধনার ধন তুমি নিজে ব্যবহার করতে পারবে না, অন্যকে দান করতে পারবে।'

এই দ্বিতীয় পাঠটিই 'বিদায় অভিশাপ'-এর সঙ্গে মেলে। এ ছাড়া, দাদুর বয়ান বাদ পড়ায় হারিয়ে যায় পুরুষ ও নারীর প্রতীক হিসেবে কচ ও দেবযানীর স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের কি মনে হয়েছিল : কথাটা এমন স্পষ্ট করে বলা ঠিক হবে না ? তাই কি ভাষ্যটি বাদ গেল ?

'ছোটো গল্প'-য় দাদুর বয়ানের পরে অচিরা বলেছিল, 'সেইদিন নির্মম পুরুষের মহৎ গৌরব মনে-মনে মেনেছি, মুখে কক্‌খনো স্বীকার করি নে।' 'শেষ কথা'-য় দাদুর বয়ান নেই বটে, তবে এই কথাগুলিই একটু হেরফের হয়ে এসেছে : 'সেইদিন থেকে আমি পুরুষের উচ্চ গৌরব মনে মনে মেনেছি, কক্‌খনো মুখে স্বীকার করি নে।'

শব্দের রদবদলগুলো এখানে লক্ষ করার মতো। 'নির্মম' বাদ গেছে, কিন্তু তার জায়গায় আর কোনো শব্দ আসে নি। 'গৌরব'-এর বিশেষণ হিসেবে 'মহৎ'-এর বদলে এল 'উচ্চ'। এর ফলে কচ ও দেবযানীর বিশেষ পরিস্থিতি যেন অনেকটাই নির্বিশেষ হয়ে যায়। মমতা বা নির্মমতার প্রসঙ্গ সেখানে অবান্তর।

'ছোটো গল্প'-য় এর পরে অচিরা ও তার দাদুর মধ্যে আরও কিছু কথা হয়। তার প্রায় সবটাই 'শেষ

কথা'-য় বাদ গেছে। এখানেও কি রবীন্দ্রনাথের মনে হচ্ছিল : অতিব্যাখ্যা হয়ে যাচ্ছে ?[৪] যেমন, ধরা যাক, অচিরার এই বিশ্লেষণ :

> আসল হচ্ছে এটা স্ত্রীদেবতার দেশ— এখানে পুরুষেরা স্ত্রৈণ, মেয়েরা স্ত্রৈণ। এখানে পুরুষেরা কেবলই 'মা মা' করছে, আর মেয়েরা চিরশিশুদের আশ্বাস দিচ্ছে যে তারা মায়ের জাত। আমার তো লজ্জা করে। পশুপক্ষীদের মধ্যেও মায়ের জাত নেই কোথায়।

কথাগুলো 'শেষ কথা'-য় বাদ পড়ে বটে, কিন্তু এই বক্তব্য 'ছোটো গল্প'-র আর-এক জায়গায় ছিল ; কিছু অদলবদল হয়ে তা 'শেষ কথা'-তেও থাকে— নবীনমাধবের আত্মপরিচয়-অংশে :

> মায়ের-আঁচল-ধরা খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর আওড়াব না...('ছোটো গল্প')
> মায়ের-আঁচল-ধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না...('শেষ কথা')[৫]

মনে হয়, অচিরার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর এই বক্তব্য বলাতে চান নি। তাই কথাগুলো পড়েছে একমাত্র নবীনমাধবের ভাগে। এতে পুনরাবৃত্তি এড়ানো গেছে, আর অচিরার কথায় যে-ঝাঁঝ ছিল সেটাও চলে গেছে।

'শেষ কথা'-র শেষ অংশটি প্রায় নতুন করে লেখা। নতুন বিষয়ও এইখানেই আসে। তার আগে কিছু ছোটোখাটো রদবদল দেখা যাক। 'ছোটো গল্প'-য় ছিল :

> সমস্ত বনটা মিলে প্রকাণ্ড এক বহু-অঙ্গ-ওয়ালা প্রাণী। গুঁড়ি মেরে বসে আছে শিকারি জন্তুর মতো। যেন স্থলচর অক্টোপাশ, কালো চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নিরন্তর হিপ্‌নটিজমে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে আমার মনের মধ্যে একটা ভয়ের বোঝা যেন নিরেট হয়ে উঠছে।

'শেষ কথা'-য় এই বক্তব্য এঁটে গেছে একটিমাত্র ছোটো বাক্যে : 'এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে, ক্রমেই তাকে আমার ভয় করছে।'

তার পরেও অচিরার কথায় কিছু শব্দ বদলায় : 'মনঃপ্রকৃতি'-র জায়গায় 'মানবচিত্ত', 'মানুষের মনের শক্তি'-র জায়গায় 'মানুষের চিত্ত'। নবীনমাধবের কথায় যোগ হয় অনেকখানি। 'ছোটো গল্প'-য় সে বলেছিল :

> আমাদের মন খোঁজে এমন একজন মানুষের সঙ্গ যে আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ জাগিয়ে রাখতে পারে, চেনার বন্যা বইয়ে দেয় জনশূন্যতার মধ্যে।

'শেষ কথা'-য় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে :

> ...এই রকম জায়গায় এমন একজন মানুষের সঙ্গ সমস্ত অন্তর বাহিরে পাওয়া চাই, যার প্রভাব মানবপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করে রাখতে পারে। যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ অন্ধশক্তির কাছে কেবলই হার ঘটতে থাকবে। আপনি যদি সাধারণ মেয়েদের মতো হতেন, তা হলে আপনার কাছে সত্য কথা শেষপর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে মুখে বাধত।

নবীনমাধবের উত্তর শুনে 'ছোটো গল্প'-র অচিরা 'একটু অবজ্ঞা করে' বলেছিল :

> আপনি যার খোঁজ করছেন তেমন মানুষ পাওয়া যায় বই-কি, যদি বড্ড দরকার পড়ে। তারা চৈতন্যকে উসকিয়ে তোলে নিজের দিকেই, বন্যা বইয়ে দিয়ে সাধনার বাঁধ ভেঙে ফেলে। এ সমস্তই কবিদের বানানো কথা, মোহরস দিয়ে জারানো। আপনাদের মতো বুকের-পাটা-ওয়ালা লোকের মুখে মানায় না। প্রথম যখন আপনাকে দেখেছিলুম, তখন দেখেছি আপনি রস খুঁজে বেড়ান নি, পথ খুঁজে বেরিয়েছিলেন কড়া মাটি ভেঙে। দেখেছি আপনার নিরাসক্ত পৌরুষের মূর্তি— সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আপনাকে প্রণাম করেছি। আজ আপনি কথার পুতুল দিয়ে নিজেকে ভোলাতে বসেছেন।

এ দশা ঘটালে কে। স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করি, এর কারণ কি আমি।

'শেষ কথা'-য় কিন্তু অচিরার মধ্যে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না। সে যেন জানে : তার জন্যেই নবীনমাধবের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটেছে। ভবতোষের প্রসঙ্গটা সেখানে নবীনমাধব তোলে। 'ছোটো গল্প'-য় কিন্তু অচিরাই নিজের থেকে বলেছিল : 'আপনি শুনেছেন আমি ভবতোষকে ভালোবেসেছিলুম।' আর, অচিরার প্রশ্নের ('এর কারণ কি আমি') উত্তরে নবীনমাধব হ্যাঁ-না কিছুই স্বীকার করে নি, শুধু বলেছিল, 'তা হতে পারে।' 'শেষ কথা'-য় এই প্রশ্ন-উত্তর দুই-ই বাদ গেছে।

এও দেখবার, প্রথম পাঠে অচিরাই জেরা করছিল নবীনমাধবকে, দ্বিতীয় পাঠে ঘটে তার উল্টো : নবীনমাধবই জেরা করে অচিরাকে। তার ফলে গল্পে একটা নতুন বিষয় এসে যায় : সতীত্বের সদর্থ, 'ছোটো গল্প'-য় যেটি ছিল নঞর্থে।

'শেষ কথা'-র প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

> "ভালোবাসাকে আপনি এমন করে গঞ্জনা দিচ্ছেন নারী হয়ে?"
>
> "নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পূজা করছিলুম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না।"
>
> "আপনি শ্রদ্ধা করতে পারেন ভবতোষকে?"
>
> "না।"
>
> "তার কাছে যেতে পারেন?"
>
> "না। কিন্তু সে আর আমার সেই জীবনের প্রথম ভালোবাসা, এক নয়। এখন আমার কাছে সেই ভালোবাসা ইম্পার্সোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।"
>
> "ভালো বুঝতে পারছি নে।"
>
> "আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের— উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়— যা-কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁয়াও যায়, ভোগ করা যায়— তবু বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ। অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।"

নবীনমাধবের 'ইম্পার্সোনাল ভাবে' করা প্রশ্নের ('আজও কি আপনি [ভবতোষকে] তেমনি ভালোবাসেন') উত্তরেই কথাগুলো আসে।[৬] নবীনমাধবের প্রতি অচিরার যে-নতুন ভালোবাসা তার জন্যে সে দায়ী করে 'অন্ধশক্তির আক্রমণ'কে। 'ছোটো গল্প'-য় ব্যাপারটা ছিল একেবারেই অন্যরকম। সেখানে বরং ভবতোষকে ভালোবাসার 'একনিষ্ঠ স্মৃতি'—'মেয়েরা যাকে বলে সতীত্ব'— তাকে অচিরা ধিক্কার দিয়েছিল 'মোহ, মোহ, অন্ধ মোহ!' ব'লে। এর থেকেই তাকে মুক্তি দিয়েছিল নবীনমাধব। কৃতজ্ঞ অচিরা তাই বলেছিল, 'আপনি এই আত্মাবমাননা থেকে ছিনিয়ে এনে আমাকে বাঁচালেন।'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয় নি। সেখানেও অচিরার 'ভাবের পরিবর্তন' ঘটেছে। নবীনমাধব তার বেদি থেকে নেমে এসেছে প্রতিদিন। তাতে গ্লানি বেড়েছে অচিরার। নবীনমাধবকে অনুযোগ করেছে সে :

> আপনার পথের সামনেকার ঢেলাখানার মতো আমাকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না কেন। কেন নিষ্ঠুর হতে পারলেন না। যদি পারতেন তবে আমি ধন্য হতুম। আমার ব্রতের পারণা হত আমার কান্না দিয়ে।

'শেষ কথা'-য় এর কোনোকিছুই নেই। তার বদলে এসেছে অন্য এক 'সাধনা'র কথা :

> আমারও একটা সাধনা ছিল, সেও তপস্যা। তাতে আমার জীবনকে পবিত্র করবে, উজ্জ্বল করবে,

> এ আমি নিশ্চয় জানতুম। দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি— যে চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল তার প্রেরণা এই ছায়াচ্ছন্ন বনের নিশ্বাসের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির।

এই 'সাধনা'র কথা 'ছোটো গল্প'-য় একেবারেই ছিল না। সেখানে, যেন 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩)-র প্রকৃতির মতোই, একটাই ভয় পাচ্ছিল অচিরা :

> [আনন্দের] পথ আসছে শেষ হয়ে— তার পরে ? তার পরে কী। শুধু এই আমি ! আর কিছু না ! এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে ? শুধু আমি ? কিসের জন্যে এত দীর্ঘ এত দুর্গম পথ ! শেষ কোথায় এর ! শুধু এই আমাতে !

'ছোটো গল্প'-য় এর বেশি কোনো ভাবনা রবীন্দ্রনাথ হাজির করেন নি। আবার, 'নিজের দুঃখকে সম্মান' করবে বলে অচিরা যে 'কর্তব্যকে অবজ্ঞা করে' এও তাঁর মনে ধরে নি। কিন্তু দুমাসের মধ্যেই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন : পুরুষের মতো নারীকেও একটা তপস্যার, একটা সাধনার সন্ধান দিতে হবে। অধ্যাপক কুরি-র পাশে কোনো বাঙালি মেয়ে যদি মাদাম কুরি না-ও হয়ে উঠতে পারে, তবু তার জীবনে একটা কোনো সম্পদ থাকুক— বুদ্ধির না হোক, হৃদয়ের। যেন এই তাগিদ থেকেই 'ছোটো গল্প' আগাগোড়া নতুন করে লেখা হয়ে গেল। সারা জীবন ধরে নারীপুরুষ সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে-ভাবনা— জগৎ ও জীবনের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে-ভাবনা বারেবারে বদলেছে— তারই একটা নতুন দিক্‌চিহ্ন হয়ে থাকে 'শেষ কথা'। এর ফলে গল্পের পরিণাম পালটায় না— বিয়োগান্ত ছাড়া এ গল্পের অন্য কী পরিণতি হতে পারে ?— কিন্তু ভাবনার খাতটা একটু ঘুরে যায়।

'আমার কাছ থেকে শেষ কথাটা শুনতে চান, প্রথম কথাটা পূর্বেই আদায় হয়েছে !'— 'শেষ কথা'-য় এ কথা বলে অচিরা। 'ছোটো গল্প'-য় এই সংলাপ ছিল না। আসলে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল হালকা ভাবে। নবীনমাধব যখন অচিরার সঙ্গে প্রথম আলাপ করল, তখন সে বলেছিল, 'ওরই [= 'হিন্দুস্থানী গোঁয়ার'] সাহায্যে আপনার সঙ্গে প্রথম কথাটা হয়ে গেল। এতদিন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না কী যে বলি।' দু-চার কথার পরে অচিরাও হালকাভাবেই বলে, 'সে [= উদ্ধারকর্তা নবীনমাধব] তো আলাপ করবার প্রথম কথাটা চেয়েছিল— পেয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম কথা।' এই সূত্র ধরেই 'শেষ কথা'টা ওঠে ; গল্পের নামও হয় তা-ই।

কিন্তু 'শেষ কথা'-ই কি রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা ? মনে হয়, না। বরং শুধু 'ভালোবাসার আদর্শ' নিয়ে বেঁচে থাকার তপস্যাও তাঁর কাছে বোধহয় তেমন গ্রাহ্য লাগে নি। হৃদয়ের তপস্যা ছাড়া মেয়েদের কি আর কোনো সাধনা থাকতে পারে না ? 'ল্যাবরেটরি'-তে তাই দেখা দেয় সোহিনী।

এও দেখবার, 'তিন সঙ্গী'-র প্রথম গল্প 'রবিবার'-এ মুখ্য চরিত্র ছিল পুরুষ। গল্পের শেষে দেখা যায় : সিদ্ধান্ত নিয়েছে অভীকই, বিভার কিছুই করার নেই। 'ছোটো গল্প'/ 'শেষ কথা'-য় সিদ্ধান্ত নিতে হয় দুজনকেই : প্রথমে অচিরা, পরে নবীনমাধবকে। আর 'ল্যাবরেটরি'-তে সমস্ত সিদ্ধান্ত— ঠিক হোক, ভুল হোক— নেয় সোহিনী একা। সে-ই হয়ে ওঠে মুখ্য চরিত্র, রেবতী তার পাশে দাঁড়াতেই পারে না।

কিন্তু 'ল্যাবরেটরি'-ও শেষ কথা নয়। দেশকাল-পরিস্থিতি ও পাত্রপাত্রীর পরিবর্তন হয়েই চলে। নারীপুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো শেষ কথা হয় না।

টীকা

যাবতীয় উদ্‌ধৃতিই 'গল্পগুচ্ছ', চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮২ থেকে।

১. ভাষাভঙ্গি ছাড়াও (সে-সমস্যা 'শেষ কথা'-তেও আছে) নবীনমাধবকে এখানে কাব্যসাহিত্যেও যথেষ্ট পারঙ্গম বলে মেনে নিতে হয়— পরে তার নিজের কথার সঙ্গে যা একেবারেই মিলবে না। 'ছোটো গল্প'-র শেষ কথা-অংশে

(অর্থাৎ প্রথম অংশে) দুটি ছোটো গল্প-র নমুনা দেওয়া আছে। একটি রবীন্দ্রনাথেরই 'পতিতা' কবিতা থেকে নেওয়া ('পুরাণের রূপান্তর : "পতিতা" থেকে "ল্যাবরেটরি" ', 'চতুরঙ্গ', বর্ষ ৫০ সংখ্যা ১, মে ১৯৮৯, পৃ. ৩২-এ এ-বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাবে), অন্যটি বেতালভট্ট-র 'নীতিপ্রদীপঃ' থেকে। নবীনমাধব বলে, 'আমি হচ্ছি সেই মানুষ যার অদৃষ্ট ভীল-রমণীর মতো ঝুড়িতে প্রতিদিন সংগ্রহ করত কাঁচা পাকা বদরী ফল, একদিন হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছিল গজমুক্তা, একটি ছোটো গল্প।' বেতালভট্ট-র পঞ্চম কবিতাটি এই :

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাদ ভিল্লস্য পত্নী মুদা।
পাণিভ্যামবগৃহ্য শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহা-
বস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ ॥

করি-কুম্ভ দিল সিংহ বিদীর্ণ করিয়া
রক্ত-মাখা মুক্তা এক পড়িল খসিয়া।
দেখিতে কুলের মত ভাবি তাহা মনে,
আহ্লাদে ব্যাধের পত্নী ছুটে গেল বনে।
দু-হাতে টিপিয়া দেখে শক্ত সাতিশয়,
ফে'লে দিল,—শাদা রঙ্ দেখিয়া বিস্ময়!
অস্থানে পতিত যদি হন মহাজন,
এরূপ দুর্গতি তাঁর হইবে তখন! (পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর-এর তর্জমা)

('উদ্ভট-শ্লোক-মালা', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা, [১৯৩৭], পৃ. ৯২-৯৩)।
শ্লোকের গল্পটি নবীনমাধবের বয়ানে একটু বদলে গেছে। সেটা বোধহয় রবীন্দ্রনাথেরই বিস্মরণের ফলে। নীতিকথাটাও থাকে নি।

প্রসঙ্গত বলা যায়, বেতালভট্ট-র এই শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ আগেও একবার উল্লেখ করেছিলেন ('বাজে কথা', আশ্বিন ১৩০৯, 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-র অন্তর্ভুক্ত), যদিও মূলটি উদ্ধৃত হয় নি, শেষ চরণটি বাদে তার ভাবানুবাদই দেওয়া আছে। পম্পা মজুমদার এই সূত্রে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ এটি যোহন হেবরলিন-এর 'কাব্যসংগ্রহঃ' থেকে পেয়ে থাকবেন ('রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস', কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৯২, ৫৬৩)। তবে তিনি যে এটিকে 'পূর্ণ অনুবাদ' বলেছেন তা ঠিক নয়। 'ছোটো গল্প'-য় এই পরোক্ষ উল্লেখটিও পম্পা মজুমদারের নজর এড়িয়ে গেছে। (হেবরলিন-ধৃত পাঠে শেষ চরণের শেষ পদে 'দুর্গতিঃ'-র জায়গায় 'স্যাদ্‌গতিঃ' আছে)।

২. নবীনমাধব সোভিয়েটের দলে, অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এ ভিড়তে গিয়েছিল— শেষ পর্যন্ত ভেড়ে নি। তবে সে 'সোশালিস্ট' হয়েছিল বটে। এই সোশালিস্ট বুর্জোয়া-কে নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি ('চরিত্রের সামুদ্রিক বিচার : রবীন্দ্রনাথের বুর্জোয়া', [মাসিক] 'বারোমাস', অগাস্ট ১৯৭৮)।

৩. 'মহাভারত' ও 'মৎস্যপুরাণ'-এর সঙ্গে 'বিদায় অভিশাপ'-র কাহিনীর পার্থক্যের জন্যে "পুরাণের পুনর্ব্যবহার : 'বিদায়-অভিশাপ' থেকে 'শেষ কথা'", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বর্ষ ৩০ সংখ্যা ২, কার্তিক-পৌষ ১৩৪৮ দ্র.।

৪. 'প্রজাপতি' কবিতাটির ('নবজাতক', ১৯৪০) দ্বিতীয় পাঠ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, 'হয়ত এসব জিনিস একটু কম বোঝানোই ভালো— কারণ এর ধর্মই হচ্ছে স্পষ্ট না বোঝা।' (শঙ্খ ঘোষ, 'নির্মাণ আর সৃষ্টি', রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪০-এ উদ্‌ধৃত)। কিন্তু গল্পের ক্ষেত্রেও কি সে-কথা বলা যাবে? বরং 'শেষ

কথা'-র সমাপ্তিতে, 'ছোটো গল্প'-র তিনটি অনুচ্ছেদ এক করে দিয়ে আর কিছু পরিবর্জন-পরিবর্তন করে বিষয়টি তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন :

> বাড়ি ফিরে গিয়ে যত আমার প্ল্যান আর নোট আর রেকর্ড উলটে পালটে নাড়াচাড়া করলুম। দেখলুম, সামনে দিগন্তবিস্তৃত কাজের ক্ষেত্র, তাতেই আমার বৃহৎ ছুটি। ('ছোটো গল্প')
>
> বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট আর রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল— বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। ('শেষ কথা')

'আনন্দ' কথাটা এখানেই প্রথম এল, আর 'বৃহৎ ছুটি'-র জায়গায় 'মুক্তি'। শেষে পাখি আর শেকলের বিম্ব (ইমেজ)টি একই থাকে, শুধু 'বাজবে'-র জায়গায় আসে 'বাজে'। 'মায়ার খেলা'-র পরিবর্তিত রূপেও (১৯৩৮) অমর ও শান্তার গানেও একই বিম্ব-র ব্যবহার দেখা যায়।

৫. 'ল্যাবরেটরি'-তেও এই বক্তব্য আবার পাওয়া যায়। সোহিনীকে অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, 'মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি।' অন্যত্র, 'মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা।'

৬. 'শেষ কথা'-য় অচিরাই অবশ্য প্রথমে বলেছিল, 'মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।' 'ছোটো গল্প'-য় এই ব্যক্তিগত-নৈর্ব্যক্তিকের প্রসঙ্গটি কখনোই ওঠে নি।

পরিশিষ্ট ক

পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত চেহারায় পাঠভেদ

রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহ থেকে 'ছোটো গল্প'-র দুটি খসড়ার ফোটো কপি* দেখার সুযোগ হয়েছে। দুটিতেই অবশ্য গল্পের নাম 'শেষ কথা'। কিন্তু ওই নামে যে-গল্পটি 'শনিবারের চিঠি' (ফাল্গুন ১৩৪৬, বর্ষ ১২, সংখ্যা ৫, পৃ ৬২১-৫৫)-তে ছাপা হয় তার সঙ্গে খসড়াদুটির তফাত অনেক (পরিশিষ্ট খ দ্র.)। 'ছোটো গল্প' নামটি বোধহয় 'দেশ' (৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, বর্ষ ৭ সংখ্যা ৫, পৃ ১৬৫-৭৬)-এ ছাপার সময়ে দেওয়া। সেখানে অবশ্য বানান ছিল অন্য : "ছোট গল্প"।†

---

* সংগ্রহণ সংখ্যা MS ২১১ (A-B) ও MS ২১১ (C-D)। প্রথমটি রুল-টানা কাগজ আদ্ধেক করে কেটে হাফ-মার্জিন-এ (ডান দিকে) লেখা। দ্বিতীয়টি The Drágon Exercises Book-এ (দুটি খাতায়)। দুটি পাণ্ডুলিপিই 'ছোটো গল্প'-র খসড়া, 'শেষ কথা'-র কোনো পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবন-এ নেই— এমনই জানিয়েছিলেন তার (স্থানাপন্ন) অধ্যক্ষ (৬-৪-৯৫-এর চিঠি)।

† রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা কপি, পত্রিকায় ছাপা চেহারা, ও বিশ্বভারতী-পাঠের মধ্যে তফাত হয় বানান, ছেদচিহ্ন, অনুচ্ছেদ-ভাগ ও বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার ফাঁক, Space-এর ক্ষেত্রে। ফলে ছাপা চেহারা দেখে রবীন্দ্রনাথের বানান বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'তুলচি', 'এল'— ছাপায় হয়ে গেল 'তুলছি', 'এলো'। তেমনি রোমান হরফে 'Time-Space'-র', ছাপায় "টাইম-স্পেস'-এর'। বিশ্বভারতী-পাঠে হাইফেন-এর প্রকোপও অনেক বেশি, আর বিস্ময়চক বাক্যের শেষে খড়্গ (?)-র বদলে দণ্ড (।) অনেক সময়েই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সারণিতে এই ধরনের তফাত দেখানোর চেষ্টা করা হয় নি, দু-একটি ক্ষেত্রে শুধু তার আভাস দেওয়া হয়েছে।

দুটি খসড়ার সঙ্গে 'দেশ' ও বিশ্বভারতী সংস্করণে ('গল্পগুচ্ছ', চতুর্থ খণ্ড, ১৩৮২) ছাপা 'ছোটো গল্প'-র পাঠের কিছু তফাত নীচে দেওয়া হল :

বিশ্বভারতী-পাঠ	'দেশ'-এর পাঠ	দ্বিতীয় খসড়া	প্রথম খসড়া
১. পৃষ্ঠা ৮৮৭, পঙ্ক্তি ২৬ ...অসংখ্য-দীপদীপ্ত...	অসংখ্য দীপদীপ্ত	অসংখ্য দীপালোকিত	অসংখ্য দীপালোকিত
২. পৃ. ৮৮৮, প. ৯-১১ জীবনের প্রবহমান...সূত্র গেঁথে আসে	[বিশ্ব.-পাঠের অনুরূপ]	[লিখে আবার কেটে দেওয়া আছে]	[কিছু শব্দভেদ থাকলেও ছাপা চেহারারই অনুরূপ]
৩. পৃ. ৮৮৮, প. ২৩ ...জাহাজি গোরার নানা কাজ নিয়ে...	[ঐ]	...খালাসির...	...খালাষির...
৪. পৃ. ৮৮৮, প. ২৯-৩২ আগুনের উপর... চিতানল	[ঐ, শুধু বানানের তফাত আছে]	×	×
৫. পৃ. ৮৮৯, প. ৪-৫ ...যন্ত্রের সঙ্গে দিতে হবে...	...যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে...	যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে...	[দ্বিতীয় খসড়ার অনুরূপ]
৬. পৃ. ৮৮৯, প. ৩৬ প্রথম বয়সে একবার বচনের	[বিশ্ব.-পাঠের অনুরূপ]	...বয়সে এরকম...	ঐ
৭. পৃ. ৮৯০, প. ২৩ আমার দেশের অর্ধাশনশীর্ণ পাঠকের...	ঐ	...অর্ধাশনী...	ঐ
৮. পৃ. ৮৯১, প. ৯ ...নাম দিয়েছেন তনিকা।	ঐ	...তনুকা।	ঐ
৯. পৃ. ৮৯১, প. ২৮ এক-একদিন রাত দুপুর...	ঐ	এক একদিন রাত দুপুর...	একএকদিন রাত দুপুর
১০. পৃ. ৮৯২, প. ৭-১১ আমার বিস্তৃত...কী করে।	ঐ	×	×
১১. পৃ. ৮৯৩, প. ৩৪ ...ঝগড়ার উষ্মায় একদিন	ঐ	...একএকদিন	এক একদিন
১২. পৃ. ৮৯৩, প. ৩৫ ...কাজ করেছে...	ঐ	...কাজ করচে...	...কাজ করে...
১৩. পৃ. ৮৯৬, প. ২ "ভয় করেছিল।"	ঐ	"ভয়ে ভয়ে ছিলুম।"	[দ্বিতীয় খসড়ার অনুরূপ]

১৪. পৃ. ৮৯৬, প. ১২-১৩	...বুদ্ধির চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ।	...অনেক বেশি তীক্ষ্ণ।	...অনেক বেশি তীক্ষ্ণ।	ঐ
১৫. পৃ. ৮৯৭, প. ২	"কিছু বলতে হবে না...	"কিচ্ছু...	"কিচ্ছু...	ঐ
১৬. পৃ. ৮৯৭, প. ৬	"কিছু জানা নেই	[বিশ্ব.-পাঠের অনুরূপ]	"কিচ্ছু জানা নেই—	ঐ
১৭. পৃ. ৮৯৮, প. ৭	ও নিজে জানে না সে কথা।	ঐ	ও নিজে জানে সে কথা।	ঐ
১৮. পৃ. ৮৯৮, প. ১৮	...আমি মনে-মনে ততবার	...মনেমনে...	...আমি মনে-মনে	...ততবার আমি মনে মনে
১৯. পৃ. ৮৯৮, প. ৩৫	"আপনি মনে-মনেই জানেন।"	...মনে মনেই...	"সে আপনি মনে মনেই জানেন।"	"কী বলব আপনি মনে মনেই জানেন।"
২০. পৃ. ৮৯৯, প. ১২	অন্তপর্ব	• [বিশ্ব.-পাঠের অনুরূপ]	×	দ্বিতীয় পর্ব
২১. পৃ. ৯০২, প. ১৯	...চিরশিশুদের আশ্বাস দিচ্ছে	ঐ	...চিরশিশুদের চেঁচিয়ে আশ্বাস দিচ্ছে...	...চিরশিশুদের চেঁচিয়ে জানাচ্ছে [এর পরে 'পশু-পক্ষীদের মধ্যেও... কোথায়।' বাক্যটি নেই।]
২২. পৃ. ৯০২, প. ২৬	ঠিক এই সময়টাতেই...	ঐ	পাঠের সময়টাতেই...	সেই সময়টাতেই...
২৩. পৃ. ৯০৩, প. ৭	...সোশালিস্ট...	...সোশিয়ালিস্ট...	...সোশিয়ালিস্ট	×
২৪. পৃ. ৯০৫, প. ২৮	...সুসাধ্য প্রয়াসের...	...দুঃসাধ্য...	...দুঃসাধ্য...	...দুঃসাধ্য...
২৫. পৃ. ৯০৬, প. ২	...দিলেন না কেন। কেন... পারলেন না।	না কেন ? কেন...না ?	দিলেন না। নিষ্ঠুর হতে...	দিলেন না ! আমি তাহলে ধন্য হতুম
২৬. পৃ. ৯০৬, প. ১২-১৩	...ডুব দিয়ে স্নান করে...	...ডুব দিয়ে দিয়ে সান করে...	ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করে.	ঝাঁপ দিয়ে পড়ে স্নান করে এসেছি।

২৭. পৃ. ৯০৬, প. ৩৬			
"কিছু অন্যায় হয় নি।...	"কিছু...হয়নি।...	"কিচ্ছু...	"কিচ্ছু...
২৮. পৃ. ৯০৭, প. ৭			
দেখেন নি নবীনবাবু ?	দেখোনি, নবীনবাবু,	দেখনি নবীনবাবু,	দেখনি নবীনবাবু
২৯. পৃ, ৯০৭, প. ২১			
...নূতন ছাতার...	...নতুন ছাতার...	...নতুন ছাতার...	...নতুন ছাতার...
৩০. পৃ, ৯০৮, প. ৯			
...একলার অভিযান, জনতার...	একলার অভিযান জনতার...	...একলার যাত্রা জনতার...	[অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। পরি.খ দ্র.]

এর থেকে মনে হয়, ৫, ১৪, ২৪, ২৬, ও ২৯ -এর ক্ষেত্রে 'দেশ'-এ প্রকাশিত পাঠই ঠিক ছিল। বিশ্বভারতী-পাঠে ভবিষ্যতে এগুলিই গ্রহণ করা সমীচীন মনে হয়। ২৮-এর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরোনো অভ্যেসে 'দেখোনি, নবীনবাবু' লিখে ফেললেও ('তুমি', মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াপদ ও '-বাবু' তাঁর গল্পে-নাটকেও পাওয়া যায়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'আপনি'-র সঙ্গে সেটি খাপ খায় না), বিশ্বভারতী-পাঠের সংশোধিত রূপটিই যথাযথ।

১৭-র ক্ষেত্রে 'দেশ' ও বিশ্বভারতী-পাঠে '...না...' থাকলেও, পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যে মনে হয়, 'ও নিজে জানে সে কথা।'—এই পাঠটিই ঠিক। 'শেষ কথা'-তেও আছে : 'ও জানে সে কথা।' ('শনিবারের চিঠি', পৃ. ৬৪০ ; বিশ্বভারতী-পাঠ, পৃ. ৮১১)। ৬, ১১, ১৫, ১৬ ও ২৭-এর ক্ষেত্রেও পাণ্ডুলিপির পাঠই গ্রাহ্য।

'ছোটো গল্প'-র দুটি খসড়ার মধ্যে শব্দ- ও বাক্য-গত তফাত প্রচুর। এখানে আর তার পুরো তালিকা দিচ্ছি না। শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকে পাঁচটি পরিবর্তন উল্লেখ করতে চাই।

ক. প্রথম খসড়ায় 'সোভিয়েটের দলে' ভেড়ার কথা ছিল না ; দ্বিতীয় খসড়ায় (ও 'দেশ'-এ ছাপা চেহারায়) তা এসেছে, 'শেষ কথা'-য় আবার বাদ গেছে।

খ. প্রথম খসড়ায় একবারই 'কচ ও দেবযানী বলে একটি কবিতা'-র কথা ছিল। পরে, সংশোধনের সময়ে (ওই খসড়াতেই) আরেকবার কবিতাটির কথা এসেছে। দ্বিতীয় খসড়ায় ও ছাপা চেহারায় দুবার কবিতাটির ('বিদায় অভিশাপ') কথা আছে ; কিছু পাঠভেদও লক্ষ করা যায়।

গ. প্রথম খসড়ায় খনি ধর্মঘটের উপাখ্যান প্রথমে ছিল না, পরে (ওই খসড়াতেই) আলাদা করে যোগ হয়েছে। কপি-তে পাতার মাথায় লেখা আছে : 'ঘুষ'। দ্বিতীয় খসড়ায় এই অংশে কিছু পাঠভেদ আছে।

ঘ. প্রথম খসড়ার শেষ অনুচ্ছেদের সঙ্গে 'শেষ কথা'-র শেষ অংশ অনেক বেশি মেলে (পুরো এক নয়)। লক্ষণীয় পরিবর্তন : প্রথম খসড়ার শেষ শব্দ 'বাজে', দ্বিতীয় খসড়ায় (ও ছাপা চেহারায়) 'বাজবে'।

ঙ. প্রথম খসড়ার শেষে (ও 'দেশ'-এ) রচনার তারিখ দেওয়া আছে : ৪।১০।৩৯।—দ্বিতীয় খসড়ার শেষে কোনো তারিখ নেই।

পরিশিষ্ট খ

'শেষ কথা' : আদি রূপ না পুনর্লিখিত রূপ ?

'শনিবারের চিঠি'-তে 'শেষ কথা'-র শেষে একটি সম্পাদকীয় টীকা ছিল বর্জাইস হরফে :

> [গত ৩০ অগ্রহায়ণ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় "ছোটগল্প" নামে রবীন্দ্রনাথের যে গল্পটি বাহির হইয়াছে "শেষ কথা" তাহারই আদি রূপ। কিন্তু আদি রূপ হইলেও ইহাতেই অচিরার স্বরূপ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সম্ভবত কবি বাংলা দেশের নীতিপরায়ণ পাঠকদের কথা মনে করিয়া বেচারাকে মেয়ে জ্যাঠা অপবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই পরে তাহার উক্তি ও কীর্ত্তির অনেক সংস্কারসাধন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু 'শেষ কথা'র অচিরাকেই অধিকতর লোভনীয় জ্ঞান করিয়াছি। একই বিষয়ের এই দুইটি শিল্পকার্য্যকে পাশাপাশি মিলাইয়া দেখিলে পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের কিছু রহস্যের আভাস পাইবেন। —স. শ. চি.] (পৃ. ৬৫৫)

বোধহয় এর দরুনই বিশ্বভারতী সংস্করণের সম্পাদকরাও দুবার 'ছোটো গল্প'-কে 'শেষ কথা'-র 'পাঠান্তর' বলেছেন (পৃ. ৮৫৫, ১০৪১)।

'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক, সজনীকান্ত দাস কি জানতেন : এই গল্পের দুটি খসড়া আছে ? জানলেও তিনি তার উল্লেখ করেন নি। মনে হয়, তাঁর মতে ব্যাপারটি নেহাতই সরল :

"শেষ কথা" (আদি রূপ—'শ. চি'-তে প্রকাশিত)
'ছোট গল্প' (পুনর্লিখিত রূপ - 'দেশ'-এ প্রকাশিত)

এই ভেবেই বোধহয় তিনি গল্পটির শেষে ৪। ১০। ৩৯— এই তারিখটি নিশ্চিন্তে ছেপে দিয়েছিলেন।

এটি মানতে একটু অসুবিধে আছে, কারণ প্রথম খসড়ার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় ওই একই তারিখ পাওয়া যায় (বিশ্বভারতী সংস্করণে 'ছোটো গল্প' ও 'শেষ কথা' দু-এর শেষেই ৪.১০.৩৯ ছাপা রয়েছে !)। অথচ প্রথম খসড়ার পাঠের সঙ্গে 'শেষ কথা'-র তফাত অনেক— শুধু শব্দে, বাক্যে ও অনুচ্ছেদ-ভাগে নয়, ভাববস্তুর দিক থেকেও। এক-এক করে সেগুলি দেখা যাক।

১. প্রথম খসড়ায় একটি সূচনা-অংশ আছে (যেমন আছে, কিছু পাঠভেদ সমেত, দ্বিতীয় খসড়ায় ও 'ছোটো গল্প'-য়), 'শেষ কথা'-য় তা আদৌ নেই।

২. প্রথম খসড়ায় সাঁওতালদের পার্বণের কথা আছে (দ্বিতীয় খসড়ায় ও 'ছোটো গল্প'-এও), 'শেষ কথা'-য় নেই।

৩. প্রথম খসড়াতেই খনি ধর্মঘটের কথা পরে যোগ হয়েছিল (দ্বিতীয় খসড়ায় ও 'ছোটো গল্প'-য় তা যথাস্থানে আছে), 'শেষ কথা'-য় নেই।

৪. 'সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর'—এরকম কোনো উক্তি প্রথম খসড়ায় নেই, যেমন নেই ইম্পার্সোনাল জ্ঞান ও ভালোবাসার আদর্শ-র কথা। নবীনমাধব-অচিরার শেষ কথোপকথনের অংশটি 'শেষ কথা'-য় একেবারেই আলাদা (মূল প্রবন্ধে তা দেখানো হয়েছে)। দুটি খসড়া ও 'ছোটো গল্প'-র ক্ষেত্রে এই অংশে সংগতি আছে।

৫. দুটি খসড়া ও 'ছোটো গল্প'-র মধ্যে পাঠভেদের মাত্রা ক্রমশ কমে আসে। প্রথম খসড়া ও 'শেষ কথা'-র মধ্যে পাঠভেদের মাত্রা অনেক বেশি। প্রায় প্রতি অনুচ্ছেদেই প্রচুর ছোটো-বড়ো তফাত চোখে পড়ে। তার পরিমাণ এত বেশি যে পুরো তালিকা করতে অনেক জায়গা লেগে যাবে। শুধু একটা ছোটো অনুচ্ছেদ (গল্পের শেষ অনুচ্ছেদ) নেওয়া যাক।

প্রথম খসড়ার পাঠ :

আমার ছোটো গল্প ফুরোলো, পরেকার কথাটা খনি খোঁড়া নিয়ে।

বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট আর রেকর্ডগুলো খুলে দেখলুম। ভারি একটা আনন্দ হোলো, সন্ধেবেলায় বারান্দায় এসে বসলুম। খাঁচা ভেঙে গেছে- পাখীর পায়ে আটকে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।

'শেষ কথা'-র পাঠ :

এইখানে আমার ছোটো গল্প ফুরল। তার পরেকার কথা জিয়লজিস্টের। বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল—বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল— খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।

'ছোটো গল্প'-র পাঠের সঙ্গে বড়ো তফাতটা থেকেই যাচ্ছে : 'মুক্তি'-র কথা প্রথম খসড়াতেও নেই। এই সবের ভিত্তিতে মনে হয় : 'তিন সঙ্গী'-তে সংকলন করার সময়ে 'শেষ কথা'-কেই বেছে নেওয়া হয়েছিল— 'আদি রূপ' বলে নয়, পুনশ্চিন্তার পরিণাম, অর্থাৎ অন্তিম রূপ বলে।

গল্পটির আদি রূপ কী ছিল তা এখনও বলা যাচ্ছে না, কারণ তেমন কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। আরও মুশকিল হচ্ছে, 'শেষ কথা'-র ছাপা চেহারার সঙ্গে মেলে এমন কোনো পাণ্ডুলিপি, কাটা প্রুফ বা ওই জাতীয় কিছুই রবীন্দ্রভবন-এ নেই। সজনীকান্ত দাসও স্পষ্ট করে বলেন নি ঠিক কী ধরনের পাণ্ডুলিপি (খাতায় লেখা খসড়া, না আলাদা করে তৈরি প্রেস কপি) থেকে তিনি গল্পটি তাঁর পত্রিকায় ছেপেছিলেন। তাঁর কথা স্বীকার করলেও বড়ো জোর এইরকম একটা ছক করা যায় :

আদি রূপ [পাওয়া যায় নি]

|

প্রথম খসড়া

|

দ্বিতীয় খসড়া

|

'দেশ'-এ মুদ্রিত পাঠ

'শনিবারের চিঠি'-তে মুদ্রিত পাঠ

|

'তিন সঙ্গী'-তে গৃহীত পাঠ

কিন্তু তাতে সমস্যা মেটে না। ৪।১০।৩৯-এর আগে আরো একটি পাঠ ছিল— এমন কল্পনার কি কোনো দরকার আছে? বরং দুটি খসড়া ও দুটি ছাপা চেহারার ভিত্তিতে আমরা এইরকম অনুমান করতে পারি :

প্রথম খসড়াটিকেই রবীন্দ্রনাথ দুবার পুনর্লিখন করেছিলেন— প্রথমে 'ছোটো গল্প' রূপে, পরে 'শেষ কথা'। ৪। ১০। ৩৯ তারিখ দেওয়া প্রথম খসড়াই 'আদি রূপ'। তার বিবর্তন হয়েছে এইরকম :

প্রথম খসড়া
|
দ্বিতীয় খসড়া
|
'দেশ'-এ মুদ্রিত পাঠ

'শনিবারের চিঠি'-তে মুদ্রিত পাঠ
|
'তিন সঙ্গী'-তে গৃহীত পাঠ
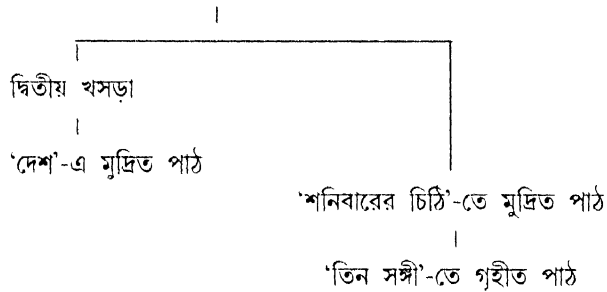
নতুন কোনো পাণ্ডুলিপি/ প্রেস কপি/ প্রুফ পাওয়া গেলে অন্য চিন্তা করা যাবে।

'শেষ কথা' বেরিয়েছিল পরে (ফাল্গুন ১৩৪৬), 'ছোটো গল্প' আগে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৬)। প্রকাশের ভিত্তিতে প্রথমটিকেই দ্বিতীয়টির 'ভিন্নতর পাঠ' বলা উচিত। অথচ 'তিন সঙ্গী'-র প্রথম সংস্করণ (পৌষ ১৩৪৭) থেকে বিশ্বভারতীর যাবতীয় বইতে ('রবীন্দ্র-রচনাবলী' খণ্ড ২৫, পৃ. ৪৩৫ ; 'গল্পগুচ্ছ', খণ্ড ৪, পৃ. ৮১৯, ৯০৮), মায় প্রমথনাথ বিশী-র 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প' [কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮ (প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১)]-য় 'পুলিনবিহারী সেন-কর্তৃক সংকলিত তথ্যপঞ্জী'-তেও (পৃ. [১৫) "ছোটো গল্প"-কেই "শেষ কথা"-র 'ভিন্নতর পাঠ' বা 'রূপান্তর' বলা হয়। এর পেছনে বোধহয় সজনীকান্ত দাসের 'আদি রূপ'-এর দাবিই কাজ করেছে।

আপাতত আমাদের সিদ্ধান্ত :

১. 'শেষ কথা' কখনোই আদি রূপ হতে পারে না, 'ছোটো গল্প'-র মতোই এটিও প্রথম খসড়ার পুনর্লিখিত, ও শেষের দিকে অনেকটাই পরিবর্তিত, রূপ। পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যে তা-ই প্রমাণ হয়।

২. 'শনিবারের চিঠি'-র পাঠ তৈরি হয়েছিল 'ছোটো গল্প' বেরনোর পরে, আগে নয়। ভাববস্তুর সংহতি ও প্রধান চরিত্রদুটির সংগতি রাখার জন্যেই বাদ পড়েছে সাঁওতালদের পার্বণ ও খনি ধর্মঘটের উপাখ্যান (মূল প্রবন্ধে তা দেখানো হয়েছে)। ইচ্ছে করে, সংহতি ও সংগতি নষ্ট করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ 'আদি রূপ'-এর সঙ্গে এগুলি যোগ করবেন— এমন কথা অবিশ্বাস্য।

'শনিবারের চিঠি'-র পাঠের সঙ্গে বিশ্বভারতী-পাঠে বানান ও ছেদচিহ্নের হেরফের ছাড়া বড়ো কোনো তফাত চোখে পড়ে না। ছোটোখাটো কিছু তফাত আছে। যেমন, বিশ্বভারতী-পাঠ, পৃ. ৮০৩, পঙ্ক্তি ১৮-য় 'ডিগ্রি', 'শ. চি.'-তে 'ডিগ্রীই' ; পৃ. ৮১৩, প. ৯-এ 'ছেলেমানুষের মতন', 'শ. চি.'-তে 'মতো'।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শঙ্খ ঘোষ, প্রণবকুমার দত্ত, সিদ্ধার্থ দত্ত, প্রশান্তকুমার পাল, তরুণ বসু, প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, সুতপা ভট্টাচার্য। চৈতন্য লাইব্রেরি ও বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরি-র গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের সহযোগিতাও স্মরণ করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ ও হুইটম্যান

কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়

শ্বেতাঙ্গ শাসনের প্রভাবে আমাদের কালচেতনা বিদেশী ধারণায় রঞ্জিত। সেই প্রভাবে আমরা দশকে শতাব্দীতে মহাকালকে মাপি, ইতিহাসের পারম্পর্য মানি ও ভবিষ্যৎকাল নিয়ে চিন্তাভাবনা করি। আমরা অধুনা এক নতুন শতাব্দীর আগমনের জন্য অস্থিরচিত্তে অপেক্ষমাণ। পত্রপত্রিকায়, রাজনৈতিক মঞ্চে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠছে, ওই আসে একবিংশ শতাব্দী। নতুন যুগের ভোর। একদা-গর্বিত বিংশ শতাব্দীর অমানিশায় দমবন্ধ এক প্রতীক্ষা। অথচ বঙ্গাব্দের হিসেবে আমরা কিন্তু এবছরই একটি নতুন শতাব্দী শুরু করেছি।* তার কথা কজন বলে ? কজন শুনতে পেয়েছে প্রায় একশোবছর আগের এক কবির কণ্ঠস্বর— 'আজি হতে শতবর্ষ পরে/কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি/কৌতূহলভরে--' ?

প্রতিদিনের কাজকর্মে আমরা এখন বঙ্গাব্দের তুলনায় খ্রিস্টাব্দের ব্যবহারই তো বেশি করি। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা ১৪০০ সালকে অমর করে রেখেছে। এই কবিতাটি আমাদের প্রজন্মকে মুগ্ধ করে রেখেছিল— কবে সেই কাল আসবে সেই অবাক বিস্ময়ে। কবিতাটির ছন্দ ও সংগীতময়তা, এর মোহময় চিত্রকল্প ও আবেগবিধুরতা আমাদের মনে জাদু বিস্তার করত। বঙ্গচেতনায় এ কবিতা অমর। মনে মনে বলতাম, স্কুল-কলেজের মঞ্চেও আবৃত্তি করতাম, এখনো মনে মনে বলতে ভালো লাগে, 'সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে, /কবি এক জাগে—'। একজন কবি ও তাঁর কাব্য একটি জাতিকে এমনভাবে মুগ্ধ করে রাখে নি কোথাও।

চৈত্র ১৩৯৯। হঠাৎ বিভাগে এলেন এক বিদেশিনী। হঠাৎ মনের মধ্যে যেন '১৪০০ সাল' কথা কয়ে উঠল। সেইসঙ্গে আর-একটি বিদেশী কবিতা— ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর 'Crossing Brooklyn Ferry'। অনবদ্য এই কবিতা, একটি গভীর কালচেতনা ও গণোপলব্ধির থেকে স্বতোৎসারিত। হুইটম্যান ছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়, 'পৃথিবীর কবি'। শ্রমিক, কৃষক, নারী, ব্রাত্য, গণিকার দরদী কবি। কিন্তু তিনি ছিলেন পাগলাটে, প্রগলভ, অশ্লীল ও আত্মোন্মাদ এবং প্রায়শই দারুণ একঘেয়ে, নীরস। সারাজীবন ধরে তিনি একটিই বই ক্রমাগত লিখে চলেন, শুধরে চলেন, বাড়িয়ে চলেন : *Leaves of Grass* ('Camerado, this is no book / Who touches this touches a man')। মিল, ছন্দ ও কাব্যের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ ছিল তাঁর মূল সাধনা। ভারতীয় ভাবচেতনায় বিমুগ্ধ, ছন্দোদীপ্ত, গীতিময় রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে এই ভিনদেশী কবির কী মিল থাকতে পারে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আর-একটি প্রশ্ন করতে হয় :

কবিতে কবিতে মিল কি শুধু দেশ ও জাতির, শুধু ভাষা ও রচনাশৈলীর ? না গভীরতর কোনো ভাবের যোগাযোগ ? কিন্তু সে প্রশ্ন তোলবার আগে 'Crossing Brooklyn Ferry'-তে ফিরে যাই আর সে কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিতে থমকে দাঁড়াই। সেখানে কবি বলছেন :

> And you that shall cross from shore to shore years hence ;

ক্রমেই এই পঙ্‌ক্তিটি ধুয়ো হয়ে দাঁড়ায় :

> A hundred years hence, or even so many hundred years
> hence, others will see them,

---

* প্রবন্ধটি বৈশাখ ১৪০০ সালে রচিত।

I am with you, you men and women of a generation, or
ever so many generations hence,

কবিদের মন প্রেইরির শুকনো ঘাসের মতো। সেখানে পূর্বসূরীর ঠিকরানো স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বালিয়ে তুলতে পারে। হুইটম্যানের উপরোক্ত কবিতাটি থেকে আরও কিছু স্ফুলিঙ্গ রবীন্দ্রমানসে ঠিকরে পড়েছিল :

Just as you feel when you look on the river and sky, so I
felt,...
These and all else were to me the same as they
are to you,

'১৪০০ সাল'-এর উৎস সন্ধানে আর বেশিদূর যাওয়ার দরকার নেই। এই কবিতাটি 'Crossing Brooklyn Ferry'-র রূপান্তর বা পুনঃপাঠ। একটি কবিতার জন্ম হয়েছে আর-একটি কবিতা থেকে। ভবিষ্যৎচেতনা হুইটম্যানের কাব্য জুড়ে আছে। আর-একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিই :

I myself but write one or two indicative words for the
future,
I but advance a moment only to wheel and hurry back in
the darkness. ('Poets to Come')

এই ভাবখানি শুধু যে '১৪০০ সাল'এ আছে তা নয়, অন্য কবিতায় ও গানেও আছে।[২] কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রদীপকে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছেন এই মার্কিন কবি ও দ্রষ্টা। এই প্রবন্ধে আমরা দেখব যে একটি নয়, আরও অনেক রবীন্দ্র-প্রদীপকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন হুইটম্যান।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ভাবচুরির হাস্যকর অভিযোগ আনছি না আমি। তিনি হুইটম্যানকে কোনো একটি বিশেষ পথের 'পূর্বসূরী' (হ্যারল্ড ব্লুম-এর ভাষায়) রূপে মেনে নিয়েছেন। কাব্য তো স্বয়ম্ভূ নয়, তার ইতিহাস ও পারম্পর্য আছে। মুশকিল এই যে আমাদের অহেতুক জাত্যভিমান বিদেশী প্রভাবকে কবুল করতে চায় না। যাঁরা সাহিত্যের ঐতিহ্য মানেন তাঁরা জানেন যে কবিতার জনক অন্তত আর-একটি কবিতা ; কবি নন। শেলি, কীট্‌স্, ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থ, টেনিসন থেকে রবীন্দ্রনাথ পাঠ নেন নি ? ঊনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যে ইংরেজি রোম্যান্টিক কাব্য সাব্‌টেক্সট হয়ে অহরহ বিরাজমান। এই প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের জোয়ারে ভেসে আসে। কিন্তু মার্কিন কবি হুইটম্যান রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ আবিষ্কার। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ সাম্রাজ্যকালে তো বটেই, এখনও আমরা মার্কিন সাহিত্যের সঙ্গে তেমন ওঠাবসা পছন্দ করি না, আর রবীন্দ্রনাথ সেই একশো বছর আগে হয়ে ওঠেন হুইটম্যানের সহমর্মী কবি-পাঠক।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তার বহু আগেই তিনি মনে মনে অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন। '১৪০০ সাল'-এর রচনাকাল ৪ ফাল্গুন ১৩০২ অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কবির ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে *Leaves of Grass* আছে, সেটি ১৮৮৮ সালের মার্কিন সংস্করণ। এইটি ছাড়া আরও অন্য সংস্করণও তিনি ব্যবহার করে থাকতে পারেন, কেননা রবীন্দ্রনাথ-পঠিত সব বই-ই তো আর সে সংগ্রহশালায় নেই।[৩] ধরা যাক, ১৮৮৮ সালের কয়েকবছর পরেই রবীন্দ্রনাথ *Leaves of Grass* পান ও 'Crossing Brooklyn Ferry' তখনই পড়েন অথবা পরে পড়েন অথবা তখনই পড়েন কিন্তু মনের মধ্যে লালন করতে থাকেন এবং তেরোশো সালের সন্ধিক্ষণে সে ভাব পুনঃপ্রকাশ পায়।

একটি বিদেশী কবির কাছে রবীন্দ্রনাথকে অকারণ ঋণবদ্ধ করছি, এই অভিযোগে অনেকেই উদ্‌বেল হয়ে উঠতে পারেন। এই মিথ্যা চেতনার যুগে তা অসম্ভবও নয়। রবীন্দ্রনাথের আর-একটি কবিতার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই কবিতাটি আরও সুপরিচিত, আরও উদাত্ত এবং দেশপ্রেমমূলক। 'ভারততীর্থ'-এর কথা বলছি। শিরোনামটির ইংরেজি অনুবাদ করতে গেলেই পৌঁছে যাই হুইটম্যানের কবিতায় : 'Passage

to India'-তে। মিলনতীর্থ ভারতের তথা মানবমৈত্রীর এই যে ওড, তা কি শুধু রবীন্দ্রনাথের ভারতপ্রেমজাত ? বিদেশীকাব্যের কাছে এই কবিতার জন্মের ঋণ নেই ?

'হে মোর চিত্ত'— প্রথম চরণের এই শব্দগুলি কি 'Passage to India' কবিতার 'O soul'-এর প্রতিধ্বনি নয় ? 'Lo, soul, seest thou not God's purpose from the first ?'— এই পঙক্তিটির পাঠ নিয়ে 'ভারততীর্থ' রচিত। শব্দচয়নের মিল ছাড়াও বলতে হয় যে দুটি কবিতাই বিশ্বমানবের এক মহাসংগমের চিন্তায় অনুপ্রাণিত, ঝংকৃত। বিরোধের মধ্যে বলতে হয় 'Passage to India' গদ্যকবিতা ; কিন্তু 'ভারততীর্থ' মধ্য ও অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস ও ছন্দের আরও নানান কলাকৌশলে হিল্লোলিত।

কবিদের মনে প্রভাব কীভাবে পড়ে, তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া দুরূহ। উপরন্তু আদি কবিতা ও উত্তরসূরীর কবিতায় তার রূপান্তরের মধ্যে যে-মিল, তা সাধারণ পাঠকের কাছে স্পষ্ট নয়। হ্যারল্ড ব্লুম বিস্তর ইংরেজ ও আমেরিকান কবির মধ্যে শেলির সুস্পষ্ট ছায়াপাত দেখেছেন, হুইটম্যানের মধ্যেও দেখেছেন। ব্লুম একজন পথিকৃৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত বহুক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত। আমরা এখানে কল্পনার ঘোড়া ছোটাচ্ছি না। 'ভারততীর্থ'-এর সেই অবিস্মরণীয় কলিগুলি উদ্ধৃত করি :

রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তারি বিচিত্র সুর।

হুইটম্যানের কবিতায় তুলনীয় স্তবকটি হচ্ছে :

Passage to India !
Struggles of many a captain, tales of many a sailor dead,
Over my mood stealing and spreading they come,

রবীন্দ্রনাথের 'হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওংকার ধ্বনি' যেন হুইটম্যানের 'Soundest below the Sanscrit and the Vedas?'-এর প্রায় সমান্তরাল।

দুটি কবিতার বিভিন্নতার কথা অনেক বলা যায়। যেমন : প্রথমটি আন্তর্জাতিক, ভারতের দিকে অভিযাত্রার আবাহন ; দ্বিতীয়টি দেশবরণ (তবে, বিদেশীর আহ্বান আছে : 'এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান !')। প্রথমটির মরমিয়াবাদ ও তান্ত্রিকতা দ্বিতীয়টিতে নেই। এ বিভিন্নতা দুটি কবির স্টাইল ও মানসিকতার বিভিন্নতা। এই প্রবন্ধের উপজীব্য : হুইটম্যানের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ কী পেয়েছেন বা নিয়েছেন। তবে এ কথা বলতেই হবে 'ভারততীর্থ' স্বয়ম্ভূ না হলেও স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ট্যময়। ব্লুম বলবেন এ কবিতাটি 'Passage to India'-র ভুলপাঠ ('misreading')। কিন্তু আমি বলব আত্মীয়তা, সহৃদয়তা। এক কবি আর-এক কবির গানে মুগ্ধ হয়ে সুর মিলিয়ে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ-পঠিত আর-একজন মার্কিন কবি ও প্রবন্ধকারের উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য :

Man is a stream whose source is hidden. Our being is descending into us from we know not whence.

(Emerson, 'The Over-Soul').

কাব্য স্বয়ম্ভু নয় ; কাব্য ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আশ্রয়ে লালিত হয়, ভাবের আদান-প্রদান কাব্যকে প্রাণোজ্জ্বল করে— আমার এই বিশ্বাস থেকে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক মহান কবিতার পিছনে আমাদের অজ্ঞাতসারে রয়েছেন কোনো-না-কোনো পূর্বসূরী, কোনো-না-কোনো সাব্‌টেক্সট। অত্যাধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচনাশাস্ত্রে এ বিশ্বাসের দার্শনিক সমর্থন মেলে, তবে সাবেককালের মনীষীদেরও এ কথা অজ্ঞাত ছিল না। আবার এমার্সনেই ফিরে যাই : ' 'Every man is a borrower and a mimic. He is theatrical and literature a quotation' ('Success').

এই প্রসঙ্গে বলাকার 'শঙ্খ' কবিতাটিতে আসি। এটিও রবীন্দ্রনাথের সর্বজনবিদিত কবিতা। কত উদাত্ত কণ্ঠে এ কবিতার আবৃত্তি শুনেছি আমরা, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়। কিন্তু তরুণদের পক্ষে এ কবিতার মর্মার্থ সহজে বুঝে ওঠা কঠিন। কবিতাটি কেমন যেন এক মানসিক দ্বন্দ্বে বিদ্ধ। এতে আছে এমন এক অন্তর্দ্বন্দ্ব যা জুডিও-খ্রিস্টান কাব্যের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বলাকার অন্য কবিতাগুলি পাখা মেলে কল্পনার আকাশে উড়ে যায়। কিন্তু 'শঙ্খ' কবিতাটিতে আছে কেমন যেন এক জটিলতা। এর দার্শনিক জীবনবেদ অবশ্যই রোম্যান্টিক কাব্যাশ্রয়ী।

অনেকে কবিতাটির ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রজীবনীর সাহায্য নিয়ে : সন্তানবিয়োগ ও অন্যান্য পারিবারিক যাতনা-পীড়িত আত্মাকে উদ্‌বুদ্ধ করবার জন্য কবি বিধাতার কাছে আত্মশক্তি ও পথের আলো চাইছেন। অন্যেরা বলেছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হিংস্রতা রবীন্দ্রনাথকে নৈরাশ্যের কুটিল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তাই তিনি বিধাতার বরাভয় চান, তাই বিধাতার ঘোষণার প্রতীক এই শঙ্খকে ধুলার থেকে তুলে নিয়ে আত্মিক বিজয়ের পথে এগিয়ে যেতে চান।

এই ব্যাখ্যাগুলির কোনো প্রমাণ নেই, যদিও তাদের আংশিক সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া যায়। শুধু আংশিক সত্যতাই, কেননা কবির আত্মজীবনী দিয়ে কবিতার ব্যাখ্যা এক ধরনের কুসংস্কার মাত্র। যে নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত বিয়োগ এ কবিতার পিছনে থাকুক-না কেন, এর ওপর প্রভাব বিচ্ছুরণ করেছে হুইটম্যানের আর-একটি কবিতা— 'The Mystic Trumpeter', আমরা যে রূপকার্থে 'শঙ্খ' কথাটি বুঝি প্রায় সেই রূপকার্থেই 'trumpet' কথাটার ব্যবহার আছে ইংরেজিতে।* রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বহুলোদ্ধৃত ও অনূদিত ইংরেজ কবি ডান-এর একটা সনেটে আছে এই পঙ্‌ক্তিটি : 'At the round earth's imagin'd corners, blow/Your trumpets, angels'। শেলির 'Ode to the West Wind' কবিতায় তো 'trumpet' দৈব ঘোষণার মূর্ত প্রতীক : 'The trumpet of a prophecy!' এই কবিতাগুলির ভাব রবীন্দ্রনাথের 'শঙ্খ'-এ আছে, কিন্তু আরও কাছের কবিতাটি হল 'The Mystic Trumpeter'। যেমন :

> I feel the measureless shame and humiliation of my race, it becomes all mine,
> Mine too the revenges of humanity, the wrongs of ages, baffled feuds and hatreds,
> Utter defeat upon me weighs—

এইভাবে 'শঙ্খ' ও 'The Mystic Trumpeter' পাশাপাশি রেখে পড়লে বিষয়বস্তু ও মানসিকতার ঐক্য

---

* লক্ষণীয় *Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore* (Macmillan, 1916)-এ শঙ্খ কথাটির অনুবাদ trumpet : 'The trumpet lies in the dust' ইত্যাদি। এই অনুবাদের আবৃত্তিও ধরা আছে রবীন্দ্রকণ্ঠে।

ধরা পড়ে। উভয় কবিতার মধ্যেই রয়েছে একদিকে নৈরাশ্য, লজ্জা ও মানবিক অধঃপতনজনিত ক্লেশ, অন্য দিকে আছে শঙ্খ অথবা trumpet যেটা উচ্চতর এক শক্তির প্রতীক এবং যার বাণী কবিকে নতুন সংকল্পে উদ্‌বুদ্ধ করছে। আবার উভয় কবিতার মর্মে আছে ডান ও শেলির উল্লিখিত কবিতা দুটির অনুরণন। সেইজন্যই বলি, কবিতার জন্ম কবিতা থেকে, জীবনী থেকে নয়। যখন বলি, হুইটম্যান রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছেন, তখন বলতে চাই যে একজনের কবিতা অন্যজনের হাতে নতুন কবিতার জন্ম দিয়েছে। এখানে একটি কথা না বলে পারা যায় না। 'The Mystic Trumpeter'-এর অষ্টম ও শেষ স্তবকের সুর 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'-র সুর :

O glad, exulting, culminating song!
A vigor more than earth's is in thy notes, ...
The ocean fill'd with joy— the atmosphere all joy!

এই ভাবটি ফুটেছে অন্যত্রও। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথায় :

কবির বীণায় বরাবর বাজিবে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না।

'মন্ত্র' কথাটির ব্যবহার লক্ষণীয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ এখানে কীট্‌স-এর 'Beauty is truth, truth beauty'-কে বোঝাতে চেয়েছেন, হুইটম্যানের কবিতা প্রায়ই মন্ত্রোচ্চারণের মতো শোনায়, যেমন তাঁর আলোচ্য কবিতার শেষে তিনটি পঙ্‌ক্তি :

Joy! joy! in freedom, worship, love! joy in the ecstasy of life!
Enough to merely be! enough to breathe!
Joy! joy! all over joy!

এরকম নাটকীয় উচ্ছলতা অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যে দুর্লভ। কিন্তু তার পরিবর্তে, তিনি তাঁর গানের সুরে ভাবের উচ্ছলতাকে প্রবাহিত করে দিয়েছেন। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'র সঙ্গে হুইটম্যানের আর-একটি কবিতা তুলনীয় 'Song of the Open Road.'।[৩] এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের পথ নিয়ে অনেক গান ও কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এতে আছে এই পঙ্‌ক্তিগুলিও :

The efflux of the Soul is happiness— here is
happiness,
I think it pervades the air, waiting at all times,
Now it flows into us— we are rightly charged.

এই কথাগুলির আদি জনক নিশ্চয় উপনিষদ। এই কারণেই থোরো (Thoreau) *Leaves of Grass*-কে 'wonderfully like the Orientals'* বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। থোরোর এই অনুভব আজ আর

* তুলনীয় : '...প্রাচ্যধর্ম ও দর্শনে দীক্ষিত বলে যেমন এমার্সন ও থোরো রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল জাগিয়েছিলেন, হুইটম্যান সেই একই কারণে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিলেন'— উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'হুইটম্যান ও রবীন্দ্রনাথ' (১৯৭০)। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। টীকা ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য।

অনুমানের পর্যায়ে নেই। হুইটম্যানের ওপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। সমালোচক ম্যালকম কাউলি (Malcolm Cowley) তো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে 'most of Whitman's doctrines, though by no means all of them, belong to the mainstream of Indian philosophy.'

'আনন্দধারা' গানটিও একইভাবে উপনিষদোৎসারিত হতেই পারে— হুইটম্যানের মাধ্যম বিনাই। কিন্তু উপনিষদ ও রবীন্দ্রকাব্য— এই জনক-তনয় সম্বন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুদূর মার্কিনমুলুকের একজন সতীর্থ। আরও বোধ হয় যে, ভারতীয় দর্শনের প্রচ্ছায়া হুইটম্যানের ভিতর দেখতে পেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে জনক-তনয়ের সম্বন্ধ পেতেছিলেন। হুইটম্যান গীতা, উপনিষদ, বৌদ্ধশাস্ত্র ইত্যাদি পণ্ডিতদের মতো পড়েন নি— কিন্তু গত শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে ওরিয়েন্টালিজম্-এর যে প্লাবন বয়ে যায়, তা তাঁর চিত্তে কল্পনাশক্তির উদার দ্বারপথ দিয়ে প্রবেশ করে। কবিরা এইভাবে ভাব আহরণ করেন— তাঁরা পাতা উলটে উলটে অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে পড়েন না। তাঁদের মনের চুম্বকে একসঙ্গে অনেক কথা তাৎক্ষণিকভাবে গেঁথে যায়। তাই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ যখন *Leaves of Grass* হাতে পান তখন তাঁর চিত্ত ও কল্পনা যেন পরিচিত আকাশের আশ্রয় পায়। তাঁরও মনের চুম্বকে হুইটম্যানের অনেক কথা একসঙ্গে গেঁথে যায়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম মার্কিন ভ্রমণের কিছুদিন পূর্বে, লণ্ডন শহরে গীতাঞ্জলির অনুবাদ সাড়া জাগায়। কবিকে সংবর্ধনার জন্য এক নৈশ ভোজসভায় মিলিত হন তখনকার দিনের কয়েকজন দিকপাল সাহিত্যিক ও সমালোচক। সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং ইয়েট্স। গীতাঞ্জলি পাঠে মুগ্ধ ইয়েট্স সেই সভাতে বলেন যে, 'কোনো একজন শিল্পী যখন হঠাৎ এমন একজন প্রতিভাকে আবিষ্কার করেন যাঁর কথা আগে জানতেন না তখন সে আবিষ্কার শিল্পীর জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা'। ইয়েট্স-এর এই কথাগুলিতে কীট্স-এর 'On First Looking into Chapman's Homer'-এর ধ্বনি আছে, নতুন সাগরাবিষ্কারের বিস্ময় আছে। এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের হুইটম্যান আবিষ্কারের পক্ষেও প্রযোজ্য। সেই সময় আমেরিকান সাহিত্য ভারতীয় চেতনায় ইংরেজি সাহিত্যের পর্দার আড়ালে ছিল। 'মার্কিন মুলুক' কথাটির উৎপত্তি কী ? কথাটিতে কি একটা অবজ্ঞা নেই ? এ অবজ্ঞা আমরা একদা বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের শাসক ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছি, ফরাসিদের কাছ থেকে শিখেছি। ইংরেজি শিক্ষার এই অভিমান কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ওপরে বর্তায় নি। ভূ-গোলকের উলটোদিকের একজন কবিকে আবিষ্কার করার জন্য হঠাৎ আলোর ঝলকানি তো লেগেছিলই, কিন্তু বোধ হয় ইংরেজ প্রভাব থেকে মুক্ত হবার বাসনাও ছিল। ভারতীয়ত্বের সম্মান দেয় এমন কবি-দাশনিকদের দিকে ঝুঁকে পড়ার কামনাও ছিল।

১৯১২ সালে আমেরিকা প্রবাসের অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথকে দেখি হুইটম্যানের আবিষ্কারক হিসেবে এবং এমার্সন, থোরো, পো প্রমুখের অনুরাগী পাঠক রূপে। এমার্সনের অনেক প্রবন্ধে, যেমন : 'The Over-Soul', 'The Poet' প্রভৃতিতে, রবীন্দ্রচেতনার কিছু উৎসনদীর কল্লোল শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথের নদী ও সাগরের কথাই ভাবা যাক-না। 'মানুষের ধর্ম' নামক প্রবন্ধমালায় তিনি বলছেন, 'সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান ও বিরাট সমুদ্রের দিকে'। এই কথাগুলির সঙ্গে এমার্সনের 'The Over-Soul'-এর চমকপ্রদ মিল আছে :

> It is an ebb of the individual rivulet before the flowing surges of the sea of life.... A thrill passes through all men at the reception of new truth.

শুধু যে এই ভাবটি তা নয়। বিশ্বজীবন, বিশ্বচেতনা, বিশ্বমানব প্রভৃতি উচ্চাদর্শমূলক ভাব ও ভঙ্গি,

এমার্সনের আলোচ্য প্রবন্ধটিতে তো বটেই, অন্যত্রও আছে। এ কথা ঠিক যে কোনো মহৎ কবিতা কখনো প্রবন্ধের পরিবর্তে লেখা হয় না। প্রবন্ধের আছে দর্শন, কবিতার আছে প্রাণ। কিন্তু ভাব থেকেই রূপ হয়। উৎসমুখে বর্ষণ হয়, তুষার গলে স্রোত হয়। তখন নদী আপন বেগে ছোটে।

'The Universal mind' কথাটি এমার্সনের ('The Over-Soul')। এই ভাব হুইটম্যানে পূর্ণভাবে প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য, হুইটম্যান কাব্যজগতে আসার আগেই এমার্সন এমন সব কথা বলতেন যেন মনে হয় ভবিষ্যদ্‌বাণী করছেন। তিনি বলতেন, 'আমাদের চোখে আমেরিকা একটি কবিতা। এর ভৌগোলিক সম্ভার আমাদের কল্পনাকে মোহিত করে এবং অচিরেই তা ছন্দে ঝংকৃত হবে' ('The Poet')। এর কিছুকাল পরেই আমেরিকান রেনেসাঁসের অন্যতম কাব্য *Leaves of Grass*-এর আবির্ভাব, যার একটি বহুশ্রুত কবিতা হল 'I Hear America Singing'। কিন্তু সব কবিতাতেই আছে আমেরিকার গণজীবন ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের সংগীত। আমেরিকান ও ভারতীয় রেনেসাঁস সমসাময়িক, দুটি দেশেই তখন ইংরেজি সাহিত্যের কর্তৃত্বমূলক প্রভাব অতিক্রম করে নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ দেখার জন্য আর্তি ওঠে। দেশবন্দনা, ভৌগোলিক কল্পনা ও গণজীবনের যুগপৎ সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' ভারতীয় জাতীয় চেতনার অনির্বচনীয় সংগীত। এই মহান গীতটির মধ্যে আছে দেশের ভূ-প্রকৃতি, দেশের ঐতিহাসিক গৌরব, দেশকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা, দেশের জনজীবনের মধ্যে এক দেবতাকে দর্শন। এই ভাবগুলি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সরাসরি এমার্সন, হুইটম্যান হতে সংক্রামিত হয়েছে তা হলফ করে বলা যায় না, তা বলার দরকারও নেই। তবে এক দেশের কবি, অন্য দেশের কবিকে জাগালে বিশ্বচেতনারই প্রসার বাড়ে। রবীন্দ্রনাথও এ কথা প্রকারান্তরে বহুবার বলেছেন।

বর্তমানে, বিশেষ করে পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির প্রকোপে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক চিড় খেতে খেতে দুরধিক্রম্য ফাটলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু রাজনীতি, জাতিবিদ্বেষ প্রভৃতির ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে কাব্যচর্চা নেহাতই ভান মাত্র। আর বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব ? সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কত কথাই না আছে। যেমন, 'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধে বলেছেন, 'সাহিত্যের জাতবিচার নেই, সেখানে আর সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে হবে'। তিনি আরও বলেছেন, 'আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা'। মজার কথা এই যে তিনি শরৎচন্দ্রের ওপরে যতখানি বিদেশী প্রভাব দেখেন, নিজের সম্পর্কে সে বিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ মন্তব্য করেন না (তবে সেটা ধরে নিতে হবে) : 'শরৎ চাটুজ্যের গল্প, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই, গোলেবকাওয়ালি অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের ছাঁদে, তাতে করে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণ হয় না, তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা'। কোনো কবিই তাঁর ঋণ-কর্জের ফিরিস্তি দেন না, আর বড়ো কবিরা তো করেন আত্মসাৎ। তা ছাড়াও বলতে হয় যে, ভারতীয় দর্শনের সেতু দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হুইটম্যানের সঙ্গে লেনদেন করেন। আবার বলি, জীবনীবিচার বর্তমান প্রবন্ধের থেকে তফাতে রাখছি। কবিতার থেকে কবিতার জন্ম আমার কাছে কবির একমাত্র প্রাসঙ্গিক জীবনী। কী করে একজন অন্যজনের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যায়— সাহিত্যেতিহাসের সেই নাটকীয় মুহূর্তগুলির মধ্যে পড়ে এই হুইটম্যান-রবীন্দ্রনাথ উপাখ্যান। যে-কথা মনে হলে, 'আমার ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা; /দেউটি তব হেথায় রাখো বালা'— এই কাব্যোক্তি স্বীয় প্রসঙ্গ থেকে মুক্তি পেয়ে যেন আমাদের মনে অনুরণন তোলে।

বিশের দশকের শেষ দিক থেকে রবীন্দ্রকাব্য এক নতুন মোড় নেয়, অথবা বলা যায় তার আগেই সেই পথ-বদল শুরু হয়। আসে গদ্য-কবিতা, গণচেতনা এবং বিদায় ও শেষোক্তির সুর। ছন্দোবদ্ধতা থেকে মুক্তি। লাইনগুলি খাপছাড়াভাবে হ্রস্ব ও দীর্ঘ। কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে। যেমন : অমিত রায়ের বেনামে লেখা কবিতাগুলি। রোম্যান্টিক একাত্মতা থেকে মুক্ত এক গভীরতর দর্শন এই কাব্যে প্রতিফলিত। এখন শুধু আর গীতরসসিক্ত ছন্দ নয় ; হুইটম্যানের ছায়াপাত হয় এখানেও। এ ছায়াপাত গভীরতর— ভাবে তো বটেই, ভঙ্গিতেও। শুধু 'জন্মদিন' কবিতার উক্তিগুলিই নয়, শুধু 'ঐকতান' কবিতার গণচেতনাও নয় ('আমি পৃথিবীর কবি' ইত্যাদি) ;

একালের অন্তত একটি সম্পূর্ণ কবিতা বঙ্গচেতনায় হুইটম্যানকে অভিষিক্ত করে নিল। কবিতাটির নাম 'পৃথিবী'। প্রথম ছত্রেই হুইটম্যানের 'Salut au Monde!'-এর ছায়া। এই ফরাসি শীর্ষনামের মানে 'পৃথিবীকে আমার প্রণতি'। তবে দুটি কবিতার মর্মার্থ ভিন্ন তো বটেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিদায়-বেদনার সুর, হুইটম্যানের কবিতায় এই সুরের পরিবর্তে আছে আনন্দ ও উল্লাস। অর্থাৎ শব্দের, ভাবের মিল আছে, কিন্তু সুরের মিল নেই। আবার 'Salut au Monde!'-এর শেষ স্তবকটিতে হুইটম্যান বলছেন :

> My spirit has pass'd in compassion and determination around the whole earth, ... I think I have blown with you you winds;

এই কথাগুলি আক্ষরিকভাবে 'পৃথিবী'র কোথাও নেই, তা হলেও তাদের সুরটি যেন সমস্ত কবিতাটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।*

হুইটম্যানের 'Song of the Open Road'-এর উল্লেখ পূর্বেই করেছি। পথ-বিষয়ক আর-একটি রত্ন 'মহুয়া' থেকে আহরণ করি যার প্রথম ছত্র 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি'। কবিতাটির প্রথম প্রকাশ 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে অমিত রায়ের বকলমে। কবিতাটির আর-একটি কলি— 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত'। এই বিদেশী কবিতারই ঝলকানি হঠাৎ আলোকপাতের মতো রবীন্দ্রমানসে রেখাচিত্র এঁকে দিয়ে গেছে। অমিত রায় ওরফে নব-রবীন্দ্রনাথ ডান, কীট্স ইত্যাদি ইংরেজ কবি থেকে অনর্গল উদ্ধৃতি ও ভাবানুবাদ দিয়ে চলেছেন এবং হুইটম্যান থেকেও :

> For we are bound where mariner has not yet dared to go,
> And we will risk the ship, ourselves and all.**

উপন্যাসটিতে এই কলিগুলির অনুবাদ একেবারেই সাদামাটা, হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবেই, কিন্তু সমকালীন 'নির্ভয়' কবিতায় এই ভাব নতুন রূপ পেয়েছে বা পুনঃসৃষ্ট হয়েছে :

> পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
> ছিন্ন পালের কাছি,
> মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
> তুমি আছ, আমি আছি।

'শেষের কবিতা'য় নিবারণ চক্রবর্তী, ওরফে অমিত রায়, ওরফে কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, কপট রবীন্দ্রবিরোধিতার মারফত যে নতুন স্টাইলের অবতারণা করেছেন তা যে বিদেশী ভাবপ্রসূত, বাঙালি পাঠকের কাছে এইটে অজ্ঞাত থাকা উচিত নয়। তবে আমাদের জানা-অজানা আরও অনেক সমান্তরাল আছে, যা একমাত্র নিষ্ঠাবান গবেষকই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার করতে পারেন। কিন্তু এ কথা মনে হয় যে হুইটম্যান-নামক তীরে রবীন্দ্রতরণী বার বার নোঙর ফেলেছিল। এই তীর ছাড়াও সে তরণী অন্য তীরেও নোঙর ফেলেছে এ কথাও সত্য ;

---

* উজ্জ্বলকুমার মজুমদারই বোধ হয় প্রথম লেখক যিনি তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে (টীকা ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য) রবীন্দ্রনাথের ওপর হুইটম্যানের প্রভাব সবিস্তারে দেখান। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর একটি উক্তি স্মরণীয়— 'আর হুইটম্যান খুললে রবীন্দ্রনাথকে যাঁর মনে না পড়ে, তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েননি' ('রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি', সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬২)। সূত্রনির্দেশের জন্য শঙ্খ ঘোষ ও তুষার সিংহর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

** এই লাইন দুটি হুইটম্যানের বলে শনাক্তকরণের জন্য ঋণ স্বীকার করছি শ্রীসুজিত মুখার্জির কাছে (*Passage to America : The Reception of Rabindranath Tagore in the United States, 1912-1941*, Calcutta, 1964).

নতুন জোয়ারে নতুন গঞ্জে ভেসে গেছে নতুন ফসল তোলার আশায়। কিন্তু এ ইতিহাস কবির সাগরযাত্রার ইতিহাস। এ সাগরযাত্রা বিনা গাঁয়ের কবিকে গাঁয়ের ডোবাতেই ডোঙা ভাসাতে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জগৎ-পারাবারের তীরে জেগে উঠেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় সাগর, স্রোতস্বিনী, পারাবার প্রভৃতি ভাবচ্ছবি ঘুরে ঘুরে আসে। ওইসঙ্গে আরও একটি বিশেষ ভাবচ্ছবি— পূর্বসূরীর বাঁশি বা বীণার সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়া। এই ভাবচ্ছবি তিনি অন্য কবির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতেন যেমন, 'কবিজীবনী' নামক প্রবন্ধে (আষাঢ় ১৩০৮) টেনিসনের জীবনীর সমালোচনায় বলেন : 'আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয়সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশীতে অভ্যাস করিয়া লইলেন' [নিম্নরেখা আমার]। বলা বাহুল্য, এ মন্তব্য অন্য কবিতে আত্মদর্শনের একটি দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উজ্জ্বল, স্মরণীয় ক্যানভাসে হুইটম্যানের তুলির আঁচড় লেগেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু হুইটম্যানের প্যালেটেই তুলি ডোবান নি। তা ছাড়া এ কথাও বলা যায় যে দুটি ভিন্ন দেশের দুই পৃথক প্রজন্মের কবির মধ্যে সেতু রক্ষা করেছিল এক দিকে ভারতীয় শাস্ত্র ও দর্শন অন্য দিকে রেনেসাঁস-চেতনা। হুইটম্যান রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন নতুন চেতনা, নতুন ভাবরাজ্য, নতুন ভঙ্গিমা। কিন্তু দুই কবির প্রকৃতি এত ভিন্ন ছিল যে এই লেনদেনের ব্যাপারটা সহজে বোধগম্য হয় না। হুইটম্যান ছিলেন ভাবে বিভোল বোহেমিয়ান কবি ও মিস্টিক। কাব্যকে তিনি তন্ত্র বলে মেনেছিলেন ; প্রায়ই এ কাব্য কর্কশ, বিসদৃশ। একটি উন্মাদ অহংবাদ তাঁর সারা কাব্য জুড়ে আছে। আবার সেইজন্যই তাঁকে নীটশে-এর মতো একজন দ্রষ্টা বা প্রফেট হিসেবে দেখা খুবই সহজ। সারা জীবন ধরে তিনি একটিই কাজ বেছে নিয়েছিলেন— *Leaves of Grass*। তা-ই ছিল তাঁর বাইবেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'ভদ্রলোক' কবি। উপরন্তু তিনি গুরু, আচার্য, কবিগুরু। এই রাজবেশ থেকে বার হয়ে শেষ বয়সে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর কাব্য সর্বত্রগামী হয় নি। তখন তিনি হুইটম্যানের বাইবেল থেকে আর-একটি ছত্র তুলে নিয়ে ঘোষণা করেছেন : 'আমি পৃথিবীর কবি।'

এই নোবেল পুরস্কারোত্তর রবীন্দ্রনাথ, পাশ্চাত্যের চোখে কবিদ্রষ্টা (Poet-Seer), প্রাচ্যের অন্যতম 'মেজাই' (Magi)। তবে এ কথা মানতেই হবে যে শেষ পর্বের কবিতায়, যেমন পুনশ্চ-পত্রপুটের কবিতায়, নতুন ও একান্ত স্বকীয় কাব্য সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু সেখানেও একটি অবিস্মরণীয় কবিতা হুইটম্যানের ভাবাক্রান্ত— 'পৃথিবী', যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আধুনিকতাবাদীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা স্বীকৃতি পেয়েছিল। এখানে ভাষা ও বিষয়ের মুক্তি আছে। এখানে মেহনতী মানুষের কথা ভাবা হয়েছে। এ এক নতুন রবীন্দ্রনাথ— 'কৃষাণের জীবনের শরিক'। কিন্তু এই ভাব হুইটম্যানেও তো প্রকট। তাঁর 'I Hear America Singing'-এর ছায়াপাত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ওরা কাজ করে' নামক কবিতাটির মধ্যে ; দুটি কবিতা তুলনা করলেই তা বোঝা যায়। মিস্ত্রি, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, মাঝি, মুচি, কাঠুরে, মা-স্ত্রী-বালিকারূপী শ্রমিক— এঁদের গানই হুইটম্যানের কবিতাটির বিষয়। হুইটম্যানের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ গণচেতনার প্রেরণা পান, এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের আরও অসংখ্য কবিতায় যে হুইটম্যানের ছায়া আছে তা এই প্রবন্ধে আলোচিত কবিতাগুলি থেকে অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু অধিক প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। তবে রবীন্দ্রনাথের ১৯৩৭ সালের (৩০ আষাঢ় ১৩৪৪) একটি চিঠি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি। চিঠিখানি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে লেখা : 'তোমাদের হুইটম্যানের কাব্যালোচনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক, এই ইচ্ছা করি। প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছুর নির্বিচারে মিশাল আছে, এ রকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন— আদিম কালের বসুন্ধরার সেটা ছিল— তার কারণ তখন তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড— এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিষ গলে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন যা তা কাণ্ড করে বসেছে।'[৪] বলা বাহুল্য, জহুরীর মতো রবীন্দ্রনাথ সে খনি থেকে প্রয়োজনমতো রত্ন আহরণ করেছিলেন, সে অরণ্যে ভ্রমণ করেছিলেন।

আর কোনো বিদেশী কবিকে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এত অধ্যবসায় নিয়ে পড়েন নি। হুইটম্যান্‌ প্রসঙ্গ এ কথা আবার প্রমাণ করে যে বিদেশীকাব্যের সাগরতীরে রবীন্দ্রনাথ জেগে উঠেছিলেন। সেখানেই তাঁর হৃদয় বিশ্বের সঙ্গে কোলাকুলি করেছিল।

টীকা

১. Harriet Smith, 'Walt Whitman and Rabindranath Tagore : Precursors of Universal Man', *Visva-Bharati Quarterly*, vol. 29, No. 1. 1963-64, pp. 4-14.
এই প্রবন্ধে লেখিকা 'Crossing Brooklyn Ferry' ও 'Passage to India'-র ছায়াপাত দেখতে পেয়েছেন ইংরেজি গীতাঞ্জলির গদ্যে। মূল প্রবন্ধের অংশমাত্র মুদ্রিত হয়েছিল *Visva-Bharati Quarterly*-তে। লেখিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুই কবির মানবমৈত্রী ও বিশ্বমানবতার আদর্শের ঐক্যটিকে দেখানো।

২. বর্তমান প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে যাবার পর উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের বহুদিন আগের লেখা 'হুইটম্যান ও রবীন্দ্রনাথ' আমার হাতে আসে। প্রবন্ধটিতে যে জীবনীমূলক তথ্য পাই তাতে আমার অনুমানের সমর্থন মেলে :
ক. 'আশির দশকে' প্রকাশিত *Lyra Heroica* নামক কাব্যসংকলনে হুইটম্যানের অনেক কবিতা ছিল। বইটি লেখক বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে দেখেছিলেন। তাতে 'রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে নাম ও তারিখ লেখা আছে'।
খ. রবীন্দ্রনাথ-সখা প্রিয়নাথ সেন হুইটম্যান-প্রেমিক ছিলেন ও রবীন্দ্রনাথকে হুইটম্যান পাঠে নিশ্চয় প্রণোদিত করেছিলেন। দ্রষ্টব্য উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'হুইটম্যান ও রবীন্দ্রনাথ', এ মণিহার, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১৭০-৭৫।

৩. উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে আর-একটি জীবনীমূলক তথ্য পাই : অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা একটি পত্রে (১১ চৈত্র ১৩১৪) রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'Song of the Open Road'-এর উল্লেখ করেন। দ্রষ্টব্য উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, এ মণিহার, পৃ. ১৭১।

৪. প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৪, পৃ. ৭৪৯।

আলেখ্য

‘ওঁরা যখন থাকবেন না, আমিও থাকব না...’

পাঁচের দশকে ‘ময়ূখ’-নামে একটি দ্বিমাসিক কবিতার কাগজ বেরোত। কাগজটি যাঁদের হাতে ১৯৫২-তে প্রথম বেরোয়, তাঁদের অধিকাংশ ডাক্তারির ছাত্র ছিলেন ; এঁদের অনেকের আগ্রহ অল্প কয়েক মাসের ভিতরেই স্বাভাবিক কারণে মরে যায় ; এবং শেষ পর্যন্ত কাগজটি যাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তাঁরাও কেউ সাহিত্যের লোক ছিলেন না, এবং সৌভাগ্যবশত হয়ে উঠতেও পারেন নি। ফলত যা হবার তা হয়েছিল, কাগজটি কোনো বিশেষ গুণপনার দাবিদার হয়ে উঠতে পারে নি ; জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর জীবনানন্দ-স্মৃতি ময়ূখ নামে বিশেষ সংখ্যাটি যদি না বেরোত, তা হলে কাগজটিকে নির্বিশেষ ভুলে যেতে বাংলা কবিতা-পাঠকের কোনোই অসুবিধে হত না।

তা হলেও, এই পত্রিকাটির মধ্যস্থতায় ‘ময়ূখ’ কাগজ যাঁরা ঘটিয়ে তুলেছিলেন, সেই তৎকালীন একটি নব্যযুবাগোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে জীবনানন্দর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল ; সেই যুবাগোষ্ঠীর আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলুম। জীবিত জীবনানন্দর সঙ্গে এই পরিচয় দুবছরের। তিনি বাইশে অক্টোবর ১৯৫৪-তে পরলোকগত হন।

‘ময়ূখ’-এর আমরা চক্রবেড়ে রোডের একটা মেয়ে-ইস্কুলের চিলেকুঠিতে ভূতে-পাওয়া ঘরে আস্তানা গেড়েছিলুম, কেননা ইস্কুল-কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন যে, তাঁদের শিক্ষক-কর্মচারী সমর চক্রবর্তীর বাউণ্ডুলে বন্ধুদের যদি ওই চিলেকোঠাঘরে থাকতে অনুমতি দেওয়া হয়, তা হলে এক ঢিলে দুটো পাখি মারা যাবে: রাতের বেলা গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী মেয়েটির বাড়িময় একা-একা ঘুরে-ঘুরে নানা সুরের শোককান্না যেমন শাসিত হতে পারবে, তেমনি অনিচ্ছুক ভীতু দারোয়ান ব্যতিরেকেই বাড়িটার পরোক্ষ পাহারার কাজটাও চলতে পারবে। অপরপক্ষে, চিলেকোঠার যাঁরা বাসিন্দা হয়েছিলেন, তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারটা সহজেই অনুধাবনযোগ্য : পাশেই জগন্নাথ ওড়িয়া-ঠাকুরের হোটেল, সেখানে মেঝেতে পাত পেড়ে সামান্য খরচে ফুরনে খাওয়া যেত, এবং খাওয়া শেষে লেখক দাদাবাবুদের সম্মান-দক্ষিণা হিসেবে ফাউ একটি করে গুল্ডি-দেওয়া পান এবং কখনো-সখনো ঝিম ধরাবার বিখ্যাত বায়বীয় পদার্থ কলকেফুলের আকারের কাপড়-জড়ানো মৃৎপাত্রে বিনামূল্যে পরিবেশিত হত।

এই আস্তানার বাসিন্দারা সকলেই বেকার বা প্রায়-বেকার। যাঁরা ছাত্র তাঁরা জানতেন, ভালো ছাত্র হয়ে ওঠার ব্যাপারটা তাঁদের ধাতের অনুকূল নয়। প্রত্যেকেই যথেষ্ট ঘরকুনো, সিনেমা দেখতে যেতেও আলস্য, ‘পথের পাঁচালী’ প্রথম ধাক্কায় দেখাই হল না ; ‘ময়ূখ’ পত্রিকাটা আছে বলেই না লেখা, এ-রকম ভাব, এবং লেখা জিনিসটাও যে কোথাও যাচ্ছে না, সে-বিষয়েও বিশেষ তাপ-উত্তাপ ছিল না ; কলকাতায় তখন যে একটা নতুন কবিতা-আন্দোলন বেশ পেকে উঠতে যাচ্ছিল, তার পক্ষে-বিপক্ষেও এই যুবকদের করণীয় কিছু ছিল না ; জীবনযাত্রাপ্রণালীতে ঔজ্জ্বল্য সংযোজিত করার প্রতিভাশালী রকম-সকম তাঁদের ধারণাতেই হয়তো ছিল না। কাগজ তো দু মাসের পরিবর্তে চার-ছ মাসে বেরোত ; এই প্রয়োজনের বিধানে এবং কলেজের ও ওড়িয়া-হোটেলের খরচ মেটাতে সবাইকেই কোনো-না-কোনো উঞ্ছবৃত্তির পরিপোষকতার জন্য সময়াতিপাত করতেই হত, তবু, তার পরেও, অপব্যয়ে ফুরোবার মতো অনেক সময় হাতে থাকত। সেই সময়টা অবশ্যই আড্ডার সময়, এবং আড্ডাটাকে যথেষ্ট আঠালোও হয়ে উঠতে হত, নইলে পাঁচ-ছয় বছর, কোনো রকম উদ্‌বেলিত উচ্চকিত জীবনযাপনে না গিয়েও তো এই সাধারণ মাপের যুবাদের গোষ্ঠীটি একরকম সুষম সমবায়ে থেকে গিয়েছিল !

ছাতের দিকে চোখ তুললেই চোখে-চোখে তাকাত সেই চিলেকোঠার ছাতের আংটা-জড়ানো কোনো একটি আত্মঘাতী মেয়ের গলার ফাঁসের পাকানো শাড়ির ভগ্নাংশটি, যেটি পুলিশ শবদেহের সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। স্নেহাকর বলত, ওটি থাকবেই, নইলে ঘরটির চরিত্রই মার খাবে ; হয়তো একদিন মেয়েটি ওই শাড়ির টুকরোটির মায়াতেই আমাদের কাছে চলে আসবে, মানুষ মায়াবদ্ধ জীব তো ; এই মায়াটুকুই তার সমাজসচেতনতা, সময়ানুবর্তিতা এবং জীবন-ও-মৃত্যু-অনুভাবনাও বটে। এই উৎকৃষ্ট মায়ার অনুধ্যান সন্ধান ও বাস্তবায়নের জন্যই তো তার নানা রকম ছোটো-বড়ো আত্মত্যাগ কষ্টসহিষ্ণুতা প্রেমে-পড়া এমন-কি বেঁচে-থাকতে-চাওয়ায় রক্তাক্ত হওয়া, নির্বিশেষ মরে-যাওয়া বা আত্মহনন। আমরা স্নেহাকরের সঙ্গে একমত হতুম, কেননা তখনই স্নেহাকরের ফুসফুসে যক্ষ্মা হয়েছিল বা হব-হব করছিল। আর সে-যুগে যক্ষ্মা রোগের একটা ভয়াবহ রাজকীয়তা ছিল : ডেকেছে, যেতে হবে।

আমার নিজের ডেন্ট-প্রকাশিত নীল মলাটের একখণ্ড ডিলান টমাস ছিল, স্নেহাকরকে দিয়েছিলুম। সুতরাং এর পরেই ডিলান টমাস এসে পড়তেন, যিনি জরায়ু-অন্তর্গত মাংসপিণ্ডের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন, যিনি অকারণে মৃত্যুপরায়ণতার কথাও বলতে পারতেন। সঙ্গে-সঙ্গে অনিবার্যভাবে জীবনানন্দ এসে পড়তেন। আমরা মেডিকেল কলেজের লাশকাটা ঘরের কথা বলাবলি করতুম। স্নেহাকর লাশকাটা ঘর দেখবার বায়না ধরত ; আমি বলতে পারতুম না, চিকিৎসা-বিজ্ঞান জীবনবাহনের বিজ্ঞান যদিও, উদ্‌বোধন তার লাশকাটা ঘরে। আমরা জীবনানন্দর জীবনসংলগ্নতা বুঝে নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠতুম।

আমাদের যে তাঁর অনেকানেক কবিতা মুখস্থ করে ফেলতে হত তা নয় ; বেশ যে উত্তম শৈলীতে আবৃত্তি করতে হত, তাও নয় ; একটি-দুটি কবিতা নিয়েই সারা-রাত সারা-দিন— হয়তো সাতদিন— কাটিয়ে দেওয়া যেত। আশাবোধ যেমন নিরাশাবোধও তেমনি সমান ভাবেই জীবনমনস্ক মানুষের মস্তিষ্কপ্রণোদিত— সমাজ-সংসার-অচেতনতা নির্বিশেষ বেঁচে-থাকার এবং তার জন্য আরোপিত উদ্দীপনের শর্ত— এ-রকম ধারণা ক্রমাগত গাঢ় হয়ে উঠতে-উঠতেই জীবনানন্দর শরীর থেকে 'নির্জনতম কবি'র পোশাকটা আমরা স্বতঃ খসে পড়তে দেখলুম। সঙ্গে-সঙ্গে এই সহমত গড়ে উঠল যে আমরা আমাদের প্রবীণ কবিদের কাছে 'ময়ূখ'-এর জন্য ভিক্ষে করতে যাব না ঠিকই, কিন্তু জীবনানন্দর নিকট না গিয়ে চলবে না। 'ময়ূখ'-এর যুবারা জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছাড়া আর কোনো অভিভাবক কবির কাছে সরাসরি লেখা চাইতে যান নি।

*

ল্যান্সডাউন রোডে জীবনানন্দর বাড়ির হদিশ জানা ছিল, আমাদের আস্তানাটাও প্রায়-দক্ষিণ কলকাতায়, সুতরাং সহজেই যে-কোনো ছুটির দিনের সকালে বা বিকেলেই লেখা চাইতে চলে যাওয়া চলে। কিন্তু কারোর পক্ষে একা-একা চলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ; আমরা সকলেই গাঁয়ের ছেলে— এবং পূর্ববঙ্গের গাঁয়ের ছেলে— আমাদের বাল্যাবধি পইপই করে বলা হয়েছে যে, ভয়সংকুল পথে-ঘাটে দল বেঁধে চলাই উচিত। সুতরাং স্নেহাকর সমর আমি এবং কদাচিৎ জগদিন্দ্র দল বেঁধে জীবনানন্দর বাড়ির সামনের রাস্তার ফুটপাথে কয়েক কিস্তিতে এ-মাথা ও-মাথা ঘোরাঘুরি করলুম, 'ময়ূখ'-এর কয়েকটি সংখ্যা হাতে নিয়ে, কিন্তু গন্তব্যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছুনো গেল না ; প্রমাণ হল, দলে ভারী হওয়ার অর্থই সম্মিলিত ভয়ে ভারী হয়ে থাকা, যা প্রায় অলঙ্ঘ্য।

এই ঘোরাঘুরির সময়ে কখনো-কখনো লক্ষ করেছি যে একজন ছোটোখাটো চেহারার মাঝারি মাপের ভদ্রমহিলা, চোখে পুরু চশমা, ব্যক্তিত্বদীপ্ত পোশাকে-আশাকে সুরুচিশোভন, বাঁ দিকে ঘাড় একটু কাৎ ক'রে হাঁটেন, সোজা এসে সাবলীল জীবনানন্দর বাড়ি ঢুকে যান, এবং জীবনানন্দও, সুস্বাস্থ্যবান, তত লম্বা নন, দৃঢ় এবং স্নেহশীল, তাঁকে ফিরবার সময় গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেন, কখনো-বা সঙ্গে ক'রে একটু এগিয়েও দেন। আমরা ভাবতুম, মহিলাকে জীবনানন্দ বিষয়ে পাকড়াও করলে কেমন হয়।

মহিলাটি নিজেই একদিন আমাদের আবিষ্কার করলেন। বললেন, আপনারা এখানে মাঝে-মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন, দেখেছি, কী ব্যাপার বলুন তো!

আমরা প্রায় ঐকতানে বলে উঠেছিলুম, জীবনানন্দর সঙ্গে দেখা করব, ভাবি, কিন্তু পেরে উঠি না।

উনি বললেন, নিশ্চয়ই কোনো কবিতার কাগজ করেন?

'ময়ূখ'। আপনি হয়তো জানেন না। আমরা 'ময়ূখ'-এর সঙ্গে আছি।

'ময়ূখ' আমি দেখেছি। আপনারা দাদার কবিতা চান তো? আসুন।

যা কী ভাবে ঘটে উঠবে, আকাশ-পাতাল চিরুনি চালিয়েও নির্ধারণ করা যায় নি, তাই শেষ পর্যন্ত ঘটল। সুচরিতা দাশ, জীবনানন্দর ছোটো বোন, আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে জীবনানন্দর সঙ্গে আলাপ করালেন; একেবারে ঘরের ভিতরে ঢোকা গেল না যদিও, জীবনানন্দ বাইরে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন; আমরা কে কী করি জানতে চাইলেন না; 'ময়ূখ' হাতে নিলেন; এবং জানালেন যে এত সমীহ-সংকোচ করার তো কিছু ছিল না; এখন হাতে লেখা নেই, লেখা হলেই কোনো এক দিন দেবেন।

আমরা নিদারুণ সংকুচিতভাবে নিবেদন করলুম, আমাদের কাগজটা যদি প'ড়ে দেখেন, পরে একদিন বলেন, কেমন লাগল।

এক ফর্মার তো কাগজ, তিনি তাড়াতাড়ি উলটে দেখে বললেন, আপনারা বুঝি অগ্রজ কবিদের কবিতা পছন্দ করেন না?

আমরা অসহায় নিরুপায়ের মতো বললুম, তা কেন, আপনার লেখার জন্য দাবি জানাতে এত দিন ঘোরাঘুরি করছি, দিদি এগিয়ে না দিলে তো আপনার কাছে পৌঁছুতেই আরও কত দিন লেগে যেত।

তিনি খুব উদারভাবে হেসেছিলেন, মনে আছে। তাঁকে তাঁর বরিশালের কলেজের ছাত্ররাও বেশ ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা করত, নানা গল্পে শুনেছি; সেই ভয়সংঘটিত দূরত্বটি কি তিনি এমনই উপভোগ করতেন; অথবা ভয়টা দ্বিপাক্ষিক? কেননা, এর পরই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর একতলার ঘরে ঢুকে গেলেন। খুব কি বেশি খোলামেলা হয়ে পড়েছিলেন?

খুব সহজেই সুচরিতা আমাদের দিদি হয়ে গেলেন।

এবং কালক্রমে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা খুব নিকট হয়ে উঠল।

*

জীবনানন্দর বাড়িতে আমি কোনোদিন চা খেয়েছি, মনে করতে পারি না। জীবনানন্দর স্ত্রীকে দেখেছি, ব্যস্ত মানুষ, দেখা হতেই সামনে থেকে সরে গেছেন; তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দর মৃত্যুর আগে কোনো দিন কথা বলা হয় নি। মেয়ে মঞ্জুশ্রী আমার বয়সী বা আমার চাইতে সামান্য বড়ো, পরে কথঞ্চিৎ মৃদু আলাপ-পরিচয় হলেও, সে-পর্যায়ে, দেখা হলে পারস্পরিক সামান্য হাসিবিনিময়ের চেয়ে বেশি কথাবার্তা তাঁর সঙ্গেও আমার হয় নি। ছেলে রঞ্জু নিজের মনে একা; তাঁর চলায়-ফেরায়, হঠাৎ ক'রে ঘরে ঢুকে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ায়, হঠাৎ বাবার বা পিসির কাছে এসে কথা বলতে শুরু ক'রে কথা শেষ না করতে পারায় বোঝা যেত যে, তাঁর কৈশোর-যৌবন-গ্রন্থি-সমাবৃত পৃথিবীতে কোথাও একটা অচিরাচরিত গিঁট পড়ে গেছে, তাঁর মানিয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে।

দিদি চাইতেন না, আমি এইসব একান্ত ব্যক্তিগততায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ি। বলতেন, চলো, আমরা কোথাও চা খেয়ে নেব। তিনি সাহেবপাড়ার ট্রিংকা-তে চা খেতে ভালোবাসতেন।

আস্তে-আস্তে এমনি দাঁড়াল যে, বেশির ভাগ সময়ে, যখন ইস্কুল-কলেজে কোনো-না-কোনো ছুতোয় ছুটি চলত, তখন দিদির সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ ক'রে নিয়ে তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দর কাছে যেতুম। 'খুকি'র সঙ্গে এসেছি বলে হয়তো নিজেকে তিনি একটু বেশি খুলে দিতে পারতেন, একটু বেশি আশ্বস্ত মনে

হত তাঁকে, এবং তিনি সহসা এত সহজে কথা বলতে পারতেন যে সে-রকমটা অন্যান্য সময়ে কেন যে হত না, ভেবে আশ্চর্য হতে হত। স্বভাবতই এমন কথা বলতেন না, যাতে তাঁর পারিবারিক পরিপার্শ্বের ছায়া পড়ে ; দিদিকে— এবং মঞ্জুকে— যে অত্যন্তই পছন্দ করতেন, বোঝা যেত, দিদির অবিবাহিত একাকিত্ব তাঁকে একাধারে পীড়া ও শান্তি দিত, মঞ্জুর পড়াশোনার বিষয়ে অস্বস্তির আবছা আভাস কথাবার্তায় ধরা পড়ে যেত, তিনি তাঁর বিদ্যাচর্চায় সহায়ক-শিক্ষকের কথা ভাবতেন ; কিন্তু জীবনসংগ্রামে সর্বাংশে বিজয়ীই বলতে হবে যে-অনুজ— অশোকানন্দ দাশ— তাঁর কথা তিনি কখনো উল্লেখ করেছেন, মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে জেনেছি, অশোকানন্দও তাঁর বিশেষ পছন্দের মানুষ ছিলেন।

দিদির মধ্যবর্তিতাহীনতায় যখন স্নেহাকর আমি সমর চক্রবর্তীরা তাঁর কাছে কখনো-কখনো গিয়েছি, তখন যে-জীবনানন্দ এসে দরজায় দু-চৌকাঠে প্রসারিত হাত রেখে দাঁড়াতেন, তিনি প্রতিরোধপরায়ণ এবং অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের প্রতি কথঞ্চিৎ সন্দিহান। লেকে যখন বেড়াচ্ছেন, তখন হয়তো বুদ্ধদেব একই রকম বেড়াতে-বেড়াতে জীবনানন্দকে পিছন থেকে ডেকেছেন, তিনি শুনতে পেয়েছেন মনে হয় নি, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেছেন। ততদিনে, কেন জানি না, কবিতা যাচঞা করার ব্যাপারটা কেমন এক পাশে সরে গেছে।

আমরা বলতুম, আমাদের কাগজটা সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?

তিনি বলতেন, ভালোই তো। কিন্তু আপনারা প্রধানত কাকে সামনে রেখে এগোতে চান ? আমাদের সময় তো নজরুল ছিলেন, সত্যেন দত্ত ছিলেন, হয়তো মোহিতলালও ছিলেন।

আমরা বলতুম, যে-কোনো কারণেই হোক, আপনার কবিতা আমাদের নিমগ্ন করে।

স্পষ্টত বোঝা যেত, তিনি একরকমভাবে আশ্বস্ত বোধ করছেন। কিঞ্চিৎ উদ্দীপ্তভাবে বলতেন, কারণটা একদিন জেনে ফেলবেন ; কিন্তু আপনারা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের থেকে দেখবেন ; ওখানে একটু বেশি অগোছালো হয়ে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু...'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আপনারা দেখেছেন কি ? এখন আর পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর কথা এগোত না। আমরা আমাদের মনের কথাটা তাড়াতাড়ি বলে ফেলতুম, আপনাকে বুদ্ধদেব ইস্তক সবাই প্রায়শই যে-ভাবে বোঝেন, আমরা সে-ভাবে বুঝতে পারি না ; মনুষ্যজীবনের ও তার ইতিহাসের দুটি প্রান্ত, আমাদের কেন যেন মনে হয়, আপনাকে ব্যস্ত করে।

এবার তাঁর অস্বস্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ত। বলতেন, আরেক দিন আসবেন, কথা হবে। কিন্তু বড়ো অসুবিধেয় আছি, আমাকে মোটামুটি ভাড়ায় একটা বাসাবাড়ি দেখে দিন-না, এটা কিন্তু বাস্তবিক জরুরি।

আমরা বলতুম, আমরা নিজেরাই তো একটা ভুতুড়ে চিলেকোঠায় থাকি—

তিনি বিস্মিত হবার মতো গলায় বলতেন, সে কী রকম ! আচ্ছা, আরেক দিন হবে। আজ হাতে একটু কাজ আছে।

*

তখন জীবনানন্দর সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। সজনীকান্ত তো তাঁর নিজের মতো করে পিছনে লেগে ছিলেনই, বুদ্ধদেবও তাঁকে আর আগের মতো নিতে পারছিলেন না, কেননা তাঁকে আর 'নির্জনতম কবি' 'প্রকৃতির কবি' ইত্যাদি অভিধায় তেমন সহজে ধরাতে পারা যাচ্ছিল না ; কবিতাকে আয়ুধের মতো ব্যবহার ক'রে যাঁরা সমাজের আমূল পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর, সেই 'প্রগতিশীলরা'ও তাঁকে পলায়নপর সমাজসংসারবিমুখ পরাজয়পরায়ণ বলে স্থিরনিশ্চয় শনাক্তকরণ সমাধা করেছিলেন, এবং পলায়নপরদের পিছনে, কে-না জানে, বীরপুরুষরা তো বটেই বালখিল্যরাও হৈ-হৈ করে তাড়া করে ফেরে। কিন্তু 'ময়ূখ'-এর অল্পশিক্ষিত বাতিল যুবাদের দীর্ঘায়ত আড্ডাগুলির ফলশ্রুতিতে এমন একটা সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হয়েছিল যে, জীবনানন্দ তাঁর লেখায়

চিন্তায় সর্বাধিক সমাজসংসার দ্বারা যন্ত্রণাবিদ্ধ, ইতিহাসপুরুষের স্বেচ্ছাচারে উৎপীড়িত, জীবনধারণপ্রক্রিয়া নিবন্ধন ব্যতিব্যস্ত ; এবং তাঁর নিদ্রা প্রেম মৃত্যুচিন্তা জীবনসংলগ্ন থাকার সনির্বন্ধ প্রয়াসেরই নিজস্ব মুকুরপ্রক্ষিপ্ত আলোয় কালোয় মেশানো ছবি। সুতরাং স্থির করা হল যে, এই সমস্ত উপলব্ধি প্রতিবাদের আকারে লিপিবদ্ধ ক'রে 'ময়ূখ'-এ প্রকাশ করা হবে। অনেক মুসাবিদা মার্জনা-পরিমার্জনার পরে লেখাটা তৈরি হল। এবং এও ভাবা হল যে, জীবনানন্দকে একবার লেখাটার সংক্ষিপ্তসার দেখিয়ে নিলে হয়, কেননা তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মূল্যায়নে তাঁর অভিমতটা যদি জানা যায়, তা হলে লেখাটার সুষম অবয়ব তৈরিতে একপ্রকার সাহায্য হবে।

দল বেঁধে লেখাটা নিয়ে এর পর আমরা যে-দিন তাঁর বাড়িতে গেলুম, সে-দিন দিদিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন ; দিদিকে বেশ উদ্দীপ্ত মনে হয়েছিল। সেদিন আমরা ঘরে ঢুকতে পেয়েছিলুম, কেউ-কেউ এমন-কি তাঁর তক্তপোশে বসতেও পেয়েছিলুম।

তিনি আমাদের কথঞ্চিৎ উত্তেজিত, যদিও বিনীত, নিবেদন শুনলেন। তার পর বেশ নিভন্ত কণ্ঠস্বরে বললেন, এ-সব ছেপে কী হবে ? ওঁরা যখন থাকবেন না, আমিও থাকব না, এবং আপনারাও নির্ঘাৎ বুড়ো হয়ে পড়বেন, তখন হয়তো ব্যাপারটার এক রকমের যাথার্থ্য নির্ণীত হবে, হয়তো হবে না। এ-সব ছেপে কিছু হয় না। ছাপাবেন না। এ-রকম অসহিষ্ণুতা আমাকেও কখনো-কখনো পেয়ে বসতে চাইত!

এর পর কোনো কথা চলে না। আবহাওয়াটাও বেশ অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে পড়ল, আমরা একে-একে বেরিয়ে এলুম। শুধু দিদিই রয়ে গেলেন। স্নেহাকর সব চাইতে উদ্যোগী ছিল, তাকে বিমর্ষ দেখাতে লাগল, আমরা আমাদের আস্তানায় ফিরে সব চুপচাপ হয়ে গেলুম।

এই লেখাটাই বড়োসড়ো করে স্নেহাকর জীবনানন্দ-স্মৃতি ময়ূখ-এ পেশ করেছিল, তার ঘোষণাটা ছিল এই রকম : জীবনানন্দর 'নির্জনতম কবি' শিরোপাটা যথেষ্টই পলকা, এবং বেশ অপমানকরও বটে।... 'তাঁদের সামনে থেকে এই লক্ষ্যবিন্দুটি সরিয়ে নিলে যে অপার শূন্যতার হাহাকার উঠবে, তা কি কোনো দিন পূর্ণ হবে ?...'

*

দিদিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে হয়তো কোনোদিন দুপুরবেলা গিয়েছি, তিনি হাতের কাজ এইমাত্র শেষ করেছেন (জীবনানন্দ দুপুরবেলা ও বেশি রাত্তিরে লিখতেন, পড়তেন), তাই বেশ নির্ভার হয়ে আছেন, কথায়-কথায় বরিশালের কথা উঠে পড়ত। বলতেন, তোমার মতো অরবিন্দও আমার কাছে সময় পেলেই হুটহাট, চলে আসত, এমন নিষ্পাপ ভালো-লাগছে-জানান-দেওয়া কথাবার্তা বলত যে কী বলব, তার সঙ্গে আমার খুব বনত ; এখন খুব ভালো লিখছে ; তখন ডিম ফুটছিল ; তা ছাড়া শামসুদ্দীন ছিল, যেমন ঝকঝকে হাতের লেখা তেমন সে নিজে ও তার লেখা ; বেশ ছিল ; এই সেদিনও কলকাতাতে দেখা হত। আমি যখন জানাতুম, অরবিন্দ গুহ ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন— দুজনকেই আমি নামে চিনতুম জানতুম, বরিশালের কলেজে-পড়া আমার কাকা-মামাদের পরিচয়ের সূত্রে, তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন : তোমরা এখনকার কলকাতার ছেলেরা এখন বড়ো ব্যস্তবাগীশ হয়ে উঠেছ, খালি সমালোচনা-টোচনায় মজা পাও! তার পর বলতেন, তোমার মামা-কাকা যাঁদের কথা বলছ, তাঁরা তো ওদের সঙ্গে পড়তেন ?

বলতুম, তাঁরা জে. ডি. বলতে ভয়ে কাঁপতেন, তাঁদের হয়তো আপনার নিকটবর্তী হবার গুণপনা ছিল না।

কেন, কেন, আমি তো তেমন কড়াধাতের মানুষ ছিলুম না!

আমি বলতুম, তাঁরা আপনাকে তাঁদের ছকে ধরতে পারতেন না।

দিদি এ-সব কথার মধ্যে ঢুকে পড়তেন, বলতেন, দাদা, তুমি তো কারুর সঙ্গে মিশতে-টিশতে না,

একা থাকতে, সবার থেকে আলাদা থাকতে, সন্ধেবেলা একা হেঁটে জাহাজঘাটা ধরে কোথায়-কোথায় চলে যেতে, ফিরতে রাত হয়ে যেত, বাড়ির সবাই প্রথম-প্রথম ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত।

উনি সেই সূত্র ধরে বলে উঠতেন, তুমি বরিশালের জাহাজঘাটা দেখেছ ? আলেকান্দা হয়ে হেঁটেছ কখনো ? কালীবাড়ি রোড ? বগুড়া রোড ?

আমি ফিকে-হয়ে-আসা স্মৃতি হাতড়ে বলতুম, কালীবাড়ি রোডে আমাদের একটা বাড়ি ছিল, কাঠের, দোতলা। ছুটি-ছাটায় বেড়াতে যেতুম, একবার কী একটা সিনেমা দেখেছিলুম, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে শেষমেশ গান করতে-করতে হাত ধরাধরি করে দূরে কোথায় চলে গেল, তখন সেই দূরে বেশ বড়ো করে সূর্য উঠছে।

তিনি বলতেন, হ্যাঁ, এ-রকম জোরাজুরি করে সূর্য ওঠাবার ব্যাপারটা আজকালকার সাহিত্যে-শিল্পেও আছে বটে, যেমন ছিল তখন।

আমি বরিশালের কথা টেনে এনে বলতুম, আমি 'সর্বানন্দ ভবন'-এর পাশ দিয়ে গিয়েছি, আমাদের কমলেশকাকা বলে এক কাকা ছিলেন, তিনি যেন দূরের পিরামিড দেখাচ্ছেন, এমনি অবাক আঙুল তুলে দেখাতেন, ওইটে জে. ডি.-র বাড়ি। আমি আপনাকে দ্রুত পায়ে নদীর ধারে ঝাউগাছের সারির পাশের রাস্তা ধরে সরষেফুলের মাঠের দিকে বেড়াতে যেতে দেখেছি। কাকা বলতেন, এ-রকম হারিয়ে-যাওয়া আপনার স্বভাব, যত হাসি-ঠাট্টা-মস্করা তাই নিয়ে, আর আপনাকে তত দূরে ঠেলে দেওয়া। বঙ্গবাসী কলেজে পড়বার সময়ে হেরম্ব চক্রবর্তীর আপনার ওপর বিতৃষ্ণা প্রকাশ হয়ে পড়ত ; শুনেছি, 'শনিবারের চিঠি'কে তিনিই আপনার সব হাঁড়ির খবর জোগাতেন !

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে সহসা বলে উঠতেন, তেমন বড়ো আকাশ জল মাঠ প্রান্তর শাদা হাওয়া কালো বন তুমি আর কোথায় পাবে এখানে ! সে-সব জীবনের একটা বিশাল উন্মুক্ততা ছিল।

দিদি বলতেন, কাছেই তো লেক আছে, লেকে তুমি তো বেড়াতেও যাও, সঙ্গে কেউ-কেউ থাকেন অবশ্য, একা যাও না। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপায়ই বা কী !

যাই, কিন্তু ট্রাম বাস ! হরেক কিসিমের গাড়িঘোড়া ! এ-সব এড়িয়ে চলা যে কী হ্যাপা ! আমার দারুণ দুর্বোধ্য লাগে।

*

একদিন ঠিক হয়েছিল, দিদি, দিদির-আত্মীয়াস্থানীয়া এক বান্ধবী, জীবনানন্দ ও আমি মেট্রোতে কী-একটা বিখ্যাত ছবি দেখতে যাব, দিদিরাই জোরাজুরি করে ব্যবস্থা করেছিলেন। জীবনানন্দকে এসে গাড়িতে তুলে নেওয়া হবে, তিনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

দিদিরা এসে পৌঁছুবার অনেক আগেই পৌঁছে গেলুম। রঞ্জু জানাল, বাবা তো বেরিয়ে গেছেন। অনেকক্ষণ।

দিদিরা এলেন। তাঁরাও একই খবর পেলেন। এবং অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়লেন। এই ঘটনাসংঘটনে আমার মতো বাইরের লোকের কী যে কর্তব্য, জানতুম না, কিছু-একটা বলতে হয় বলেই বলেছিলুম, মনে হয় কাছে-পিঠে কোথাও গিয়েছেন, এখুনি এসে পড়বেন।

কিন্তু পিসিমণির উৎকণ্ঠার জবাবে রঞ্জু নির্বিকার জানিয়েছিল, বাবা তো তৈরি হয়েই বেরিয়েছেন।

অগত্যা গাড়ি চেপে জীবনানন্দ-ব্যতিরেকেই মেট্রোতে পৌঁছুতে হল, ম্যাটিনি শো, ছবি শুরু হতে আর বিশেষ দেরি নেই। মেট্রোর বাঁ-পাশের বিশাল ঝকঝকে সিগারেট-জানালার সামনে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ, তিনিও সমান উৎকণ্ঠিত। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, তোরা এত দেরি করলি কেন বল্ তো ! ছবি তো প্রায় শুরু হতে যাচ্ছে, ঘণ্টা বেজেছে। যাতে দেরি হয়ে না যায়, সেইজন্যে সেই কখন আমি হেঁটেই চলে এসেছি,

আর তোদের গড়িমসির কথা ভাবছি।

*

রবিবার সকালবেলাটা সঞ্জয় ভট্টাচার্যর গণেশ অ্যাভিন্যুর বাসাবাড়িতে সময় কাটানো একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল। শ্রদ্ধা জিনিসটার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভয়ের মিশোল না থাকলে যে আকর্ষণটা তেমন জোরালো হয়ে ওঠে না, রবিবারের এই সকালটা তা বেশ ভালো করে বোঝার সুযোগ করে দিত। সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে কথা বলতে শোনাটাই একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতার জিনিস, প্রতি মুহূর্তে জানান দিতে থাকত যে, লেখাটেখার স্বনির্বাচিত দায়িত্বে শিক্ষিত হবারও নিজস্ব দায় থাকে, এবং সে-দায় সামলানো অত্যন্তই গতরে-মগজে পরিশ্রমের বিনিময়ে সাধ্য। ব্যাপারটা নিতান্তই নিরুৎসাহজনক হলেও মানুষ নিজেকে কষ্ট দিয়ে একরকম নির্মল আনন্দ পায় : এবং সেই কারণেই হয়তো রবিবারের সকালের ভিড়টা ছোটোখাটো হলেও পরবর্তী কোনো-কোনো বিখ্যাতকে তখন সেখানে নিবিষ্ট দুর্বলতায় দেখেছি।

একদিন জীবনানন্দ ছিলেন। ঘরে ঢুকেই দেখি জীবনানন্দ চেয়ারে আসীন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর হলুদ চাদরে ঢাকা জানালার পাশের খাটে। ঘরে রোদ এসে পড়েছে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য আবেগে উত্তপ্ত হয়ে আছেন। তিনি জীবনানন্দর কাছে জীবনানন্দর কবিতা ব্যাখ্যা করছেন। প্রসঙ্গটা : তাঁর কাব্যের সঙ্গে শেলি-কীটস-হুইটম্যান থেকে শুরু করে ইয়েটস-রিলকে-এলিয়ট পেরিয়ে ডিলান টমাস পর্যন্ত কবিদের কবিতার আত্মীয়তা।

সাত কথাতে জীবনানন্দর একটি কথা নেই। তিনি শুনতেই ভালোবাসেন, তাঁর চোখের কৌতুকাভাসিত একাগ্রতায় তা তিনি বুঝিয়ে দিতে থাকলেন। তবু একবার সামান্য উসখুস করে উঠে ক্ষীণ বললেন, একজন সচেতন কবিকে এতজন অগ্রজ বা সমসাময়িক কবি একই সঙ্গে প্রভাবান্বিত করতে পারেন ?

সঞ্জয় ভট্টাচার্য দারুণ রেগে গেলেন। তাঁর পুরু চশমার আড়ালে তাঁর বড়ো চোখ দুটি আরও ধক-ধক করে উঠল, মনে হল, দু চোখের শাদা বলয় দুটি এক্ষুনি ছিটকে পড়বে। প্রভাব ? প্রভাবের কথা আমি বলেছি কি ? আপনি ঠিক ধরেন নি, জীবনবাবু। আমি আত্মীয়তার কথা বোঝাতে চেয়েছি। আমি কি এঁদের আত্মীয় ? না। অন্য অনেকেই কি এঁদের আত্মীয় ? না। আপনি এঁদের বংশপরম্পরার, এঁরা আপনার উত্তরাধিকার, আমি তাই বলতে চাইছি।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য কথার ঝোঁকে ছিলেন, জীবনানন্দ অন্য কথায় গেলেন, আমি যে-জিনিসটা মনে পড়াতে এসেছিলুম...

সঞ্জয় ভট্টাচার্য অত্যন্তই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। কী আশ্চর্য, আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। আমরাও যে খুব একটা সুবিধের মধ্যে আছি, তা নয়, 'পূর্বাশা'র রকম দেখেই বুঝতে পারছেন, আপনি যে... কী আশ্চর্য, কালকের মধ্যে সত্যবাবু একটা-কিছু বিহিত করবেনই।

তার পর খাট থেকে নেমে গিয়ে পাশের রান্নাঘর থেকে প্লেটে করে পায়েস নিয়ে এলেন, তাঁরই হাতে তৈরি হয়তো-বা, জীবনানন্দকে ডায়াবেটিসের কথা বলে না-না করেও ছুঁতে হল, আমার তো প্রায় প্রতি রবিবারের রুটিন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য জানেন, জীবনানন্দ অল্প হলেও আমাকে চেনেন। সুতরাং তাঁকে দক্ষিণগামী বাসে তুলে দেবার দায় আমার উপর বর্তাল।

সেসব সময়ে কলকাতায় ছাতখোলা সবুজ রঙের দোতলা বাস একটি-কি-দুটি চলত। তেমন একটা বাস এসে পড়ল। শুধু তুলে দেওয়াই নয়, জীবনানন্দকে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য বিবেচনা করলুম।

বাসে সেসব কালে সাধারণত বসার জায়গা পাওয়া যেত। পাশাপাশি বসে পড়তেই তিনি বললেন,

তুমি কোথায় যাবে, দক্ষিণে কোথাও তোমার কাজ আছে ?

আমি বললুম, আমি জগুবাবুর বাজারের কাছে নামব, ওখানেই আমাদের ভুতুড়ে আস্তানা।

উনি বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে বললেন, ভুতুড়ে ? কী রকম ?

আমি সেই আত্মঘাতী মেয়েটির ফেলে-রেখে-যাওয়া শাড়ির ভগ্নাংশর কথা বললুম, সারা রাত তার বাড়িময় একা-একা ঘুরে-ঘুরে কেঁদে ফেরার কথা বললুম, যদিও আমরা সে-রকম কখনো শুনি নি, আমাদের বন্ধুবান্ধব— বিশেষ ক'রে স্নেহাকরের— কথা বললুম, যার ফুসফুসে যক্ষ্মা হব-হব করছে বা সত্যি-সত্যি হয়েইছে, যে তার নিজের ধনী ভাইদের ছেড়ে চলে এসেছে, কী ক'রে সেখানে আমরা সময় কাটাই, কী-সব ভেবে-প'ড়ে-ঝগড়া ক'রে-চেঁচিয়ে, সে-সব বললুম, কিন্তু ওড়িয়া-বামুনের হোটেলের কথাটা বললুম না।

তিনি বললেন, তোমরা কোথায় খাওয়া-দাওয়া কর ?

নিজেরা রান্না ক'রে, ইকমিক কুকারে, অম্লান নিরীহ কণ্ঠে মিথ্যে কথাটা বললুম।

কিন্তু মেয়েটি আত্মহত্যা করল কেন, তোমরা খোঁজ করেছ ? খোঁজ করলে দেখতে, লোকে যা বলবে, পুলিশে যা বলবে, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা বলবে, তার থেকে কারণটা হয়তো অনেক বেশি আবছা।

আমি ঠিক মানতে পারলুম না, ও-রকম বয়সী মেয়েদের আত্মহত্যার কারণ হাত গুণে বলে দেওয়া যায়।

কথাটা মেয়েদের বা ছেলেদের নয়, কোন্ বয়সের সেটাও হয়তো নয়, মৃত্যু তো তোমার জানাশোনা নিজের জীবনের মধ্যে একমাত্র একটাই শাশ্বত ও নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা, যা নিজে থেকে ঘটবে বা তুমি নিজে ঘটাবে। কেন ঘটাবে, তুমি জীবনকে— মোটা কথায় সদর্থক বেঁচে-থাকাকে— ভালোবাস ব'লে, রোগেশোকে সুখে-দুঃখে সার্থকতা-অসার্থকতায় ক্রমাগত বেঁচে-থাকতে চাও ব'লে, এইসবে তোমার ধরাছোঁয়ার বাইরের কোনো চিড় তুমি সহ্য করতে পার না ব'লে ; তোমার ভালোবাসার জিনিসটাকেই তুমি তখন ভেঙে ফ্যালো, শিশুরা প্রগাঢ়, সৎ ভাবাবেগে যা ক'রে ফ্যালে, কেন করে, না জেনেই করে।

আমি অনুতপ্তের মতো বললুম, মেয়েটিও তা হলে এ-রকম কোনো ফেরে পড়ে গিয়েছিল।

খুব সম্ভব। তুমি তো ডাক্তারি পড়, মানুষকে জন্মাতে-মরতে দ্যাখ, তোমার এ-রকম মনে হয় না ? এ-সব ক্ষেত্রে মৃত্যু ঠিক জীবন-লালসার উলটো পিঠ। মৃত্যু যথেষ্ট আগ্রাসীও হতে পারে হয়তো !

উনি কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। চুপ করে গেলেন। বেশি কথা বলার লোক তো ছিলেন না, সংকুচিত বোধ করতে লাগলেন।

আমি অন্য কথায় গেলুম। সঞ্জয়বাবু আপনার লেখার বিদেশী আত্মীয়তার কথা কী বলছিলেন। কেউ-কেউ কিন্তু 'বনলতা সেন'-এর সঙ্গে পো'র 'টু হেলেন'-এর সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। অন্যান্য কবিতায় ইয়েটস বা অন্যের— আবছাভাবে বা তেমন আবছাভাবে নয়—

তিনি নিরুত্তাপে বললেন, তোমরা নিজেরা কীভাবে এইসব প্রসঙ্গে কথা বল বা ভাব ? এই যে তুমি বললে, তুমি সঞ্জয়বাবুর আত্মীয়তার কথা বললে না, স্পষ্টতই কুম্ভিলকবৃত্তির কথা বললে। আমি এ-বিষয়ে কিছু ভাবি না। এ-প্রসঙ্গে পড়াশোনার কথাটা এসে পড়ে। তুমি পড় কেন, তোমার কোনো-কিছু পড়াটা তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের যে-একটা বস্তুপিণ্ড আছে, অথবা তোমার বেঁচে থাকার বৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে যে-বস্তুপিণ্ড তৈরি হয়ে ওঠে, তাকে একরকমভাবে আহত করে ; সঙ্গে-সঙ্গে তোমার অভিজ্ঞতাগুলি বিশ্লিষ্ট হয়, চরিত্র পায়, লিখতে জানলে তুমি লেখ, আঁকতে জানলে আঁক, সেই নবনির্মিত অভিজ্ঞতার কথা লেখ বা আঁক। এটা একটা ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যাপার। তা ছাড়া যেসব সাহচর্য তোমাকে ঘিরে থাকে, তারা তোমার চারিত্র্যও কোনো-না-কোনোভাবে কাটে-ছাঁটে ; তুমি যে সমাজে বাস করতে শুরু কর, তার কথ্যভাষার টানটাও তোমার জিভে এসে যায়।

দেশপ্রিয় পার্ক এসে পড়ল। আমরা দুজনেই নেমে গেলুম। আমি গোপনে ভিতরে-ভিতরে উত্তেজিত

হয়ে পড়তে লাগলুম, তাড়াতাড়ি চক্রবেড়েতে পৌঁছোনো দরকার। এই দুপুরবেলা সবাই যে সেখানে জড়ো হয়ে নেই, আন্দাজ করা যায়, কিন্তু স্নেহাকর ও সমর নেই, হতেই পারে না।

*

জীবনানন্দ লেকে বেড়াতে যেতেন বিকেলে। সঙ্গে প্রায়ই তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু সুবোধবাবু থাকতেন। দিদি ও আমিও ক্বচিৎ জুটে গেছি তাঁদের পিছনে-পিছনে। আমার আগাগোড়া কেমন মনে হত, সুবোধবাবু জীবনানন্দর নিকট-বন্ধু পরিগণিত হবার জন্যে যতটা উৎসাহী ছিলেন, ততটা ছিলেন না তাঁর লেখাপড়ার চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার বিষয়ে। অরবিন্দ গুহ জানিয়েছেন, আমার ধারণাটা অমূলক না হতেও পারে, কেননা তাঁর কাছে জীবনানন্দর কবিতা বুঝবার কথা অনেকবার সুবোধবাবু বলেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি।

যে-দিনের কথা হচ্ছে, সে-দিন বিকেলে কোনো কারণে এতই বিমর্ষ হয়ে ছিলেন তিনি যে, ব্যাপারটা বেশ চোখে পড়ার মতো হয়ে উঠেছিল। সুবোধবাবু অফিসফেরত চলে আসতেই জীবনানন্দও পাঞ্জাবি গলিয়ে তৈরি হয়ে নিলেন। দিদি আমাকে বললেন, চলো, আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

ওঁরা পাশাপাশি এগিয়ে, আমরা একটু পেছিয়ে। দিদি বললেন, দাদার দুপুরবেলায়-পড়া কোনো-একটা লেখা তাঁকে খুব আহত করেছে। চোখে দেখলুম যখন, সঙ্গে চলে এলুম।

পিছনে যেতে-যেতে শুনলুম জীবনানন্দ বলছেন, আশ্চর্য, এমন একটা লেখাও কি লিখি নি যা পাঁচ-সাত বছর পরেও পড়া যেতে পারবে! কাকে যে বলছেন, বলার অনতিব্যক্ত মন্থরতায় সেটা তেমন স্পষ্ট হল না, সুবোধবাবুকে কি?

সুবোধবাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কী যে বলেন, আপনার কোন্ কবিতাটা যে সে-জাতের নয়, তা তো আমি জানি না।

জীবনানন্দ হাত তুলে দ্রুত নেড়ে হাওয়া কাটাবার ভঙ্গিতে বললেন, না, না, ঠিক সে-কথা তো হচ্ছে না।

দিদি বললেন, দাদা ঠিক এ-ধরনের বন্ধুদের নিয়েই-বা কেন যে বেড়াতে বেরোন!

আমি বলেছিলাম, ওঁর মতো লোকেরা এ-ধরনের সঙ্গীই হয়তো সর্বদা পছন্দ করেন, তাতে ঠকে যাবার কষ্ট ঢের কম।

সে-দিন সন্ধের পর জীবনানন্দ কথায়-কথায় বলেছিলেন, আমি অনেক সময় ভেবেছি আমার কবিতা সম্বন্ধে আমি নিজে কিছু লিখি। সজনীবাবুর কোনো-একটি লেখার উত্তরে লিখেও ফেলেছিলাম, 'ক্যাম্পে' কবিতাটার শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গে। পরে ভেবে দেখেছি, এসব করে কিছু হয় না, পাঠক তার নিজের অভিজ্ঞতার উদ্দীপনেই এক-এক রকমভাবে নিজে থেকে বুঝে নিতে থাকেন, সেখানে এসব লেখার কোনো মানে নেই। তাই ছাপতে দিই নি কোথাও। সঞ্জয়বাবু অবশ্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কোনো সময়।

আমি সাগ্রহে বলেছিলুম, আমরা লেখাটা পেতে পারি না?

দিদি বলেছিলেন, লেখাটা ভূমেনকে দাও।

জীবনানন্দ সতর্কতার সঙ্গে বলেছিলেন, লেখাটা নিয়ে কী করবে?

আমি নিখাদ সরলতায় বলেছিলুম, হয়তো কোথাও কোনোদিন ছাপব না, আপনি যখন চান না, কিন্তু 'ক্যাম্পে' কবিতাটাকে আঁচ করতে আমাদের সুবিধে হবে; লেখা হয়ে যাবার পরে লেখক তো লেখক থাকেন না, একজন সাধারণ পাঠক হয়ে ওঠেন, সে-দিক থেকে লেখাটা দারুণ একটা ব্যাপার। তার চাইতেও প্রধান, লেখাটা আমার কাছে থাকবে!

পাতলা হলুদ-হয়ে-ওঠা কাগজে তাঁর প্রথম বয়েসের জড়ানো হাতের-লেখায় আবছা হরফের সেই লেখাটা তিনি আমায় পরে একদিন দিয়েছিলেন।

কিন্তু বসতে পেলে লোকে শুতে চায়। আমিও দুঃসাহসী হয়ে উঠছিলাম। একবার বায়না ধরলুম, আপনার পড়া কোনো কবিতার বই, যাতে পড়ার সময় মার্জিনে নানা কথা লিখেছেন-টিখেছেন, লাল নীল পেন্সিলে হয়তো কোনো-একটা লাইন আন্ডারলাইন করেছেন, কিছুই হয়তো করেন নি, শুধু আপনার নামটা মুখপত্রে সই করা আছে, এই রকম কোনো-একটা বই আমার চাই। সেই একই প্রয়োজন, আমার কাছে থাকবে!

তিনি হাঁ-না কিছুই বলেন নি, কিন্তু খুব যে রাগ করেছেন বা বাড়াবাড়ি ভেবে বিরক্ত হয়েছেন, তাও মনে হল না, বললেন, সে পরে এক সময় দেখা যাবে।

তিনি আমাকে ম্যাকমিলান-প্রকাশিত ১৯২৮ সালের ইয়েটসের 'দ্য টাওয়ার' বইটি দিয়েছিলেন।

আমি 'ক্যাম্পে'-র উপর লেখার বিষয়ে ফিরে আসি। লেখাটা নিয়ে সে-দিন রাত্রে সে কী উত্তেজনা আমাদের ডেরায়, কী অবিশ্বাস্য দুঃসহ অস্থিরতা, মনে হতে লাগল আমাদের সবার শরীরে এখুনি দুদ্দাড় জ্বর এসে পড়বে। সবাই নিদারুণ অভিযোগ করতে লাগল যে, আমি নিরেট হীনবুদ্ধির মতো কাজ করেছি, কেননা লেখাটা ছাপাব না, এ-রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া মোটেই ঠিক হয় নি। শেষ পর্যন্ত এ-রকম একটা রফা হল যে, ছাপা হবে, এবং জীবনানন্দর অনুমতি নিয়েই 'ময়ূখ'-এর পরবর্তী কোনো এক সংখ্যায় ছাপা হবে, তবে সেই সংখ্যাটি হবে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির উপর একটি সেমিনার, এবং এই লেখাটি যাবে সবশেষে সামিং-আপের ভঙ্গিতে।

অবশ্য সে-সেমিনার আর বেরোয় নি, লেখাটিও অনেক দিন আমার কাছে পড়ে থেকেছে, এবং অবশেষে 'শতভিষা' কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

*

জীবনানন্দ উপন্যাস লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, এবং সেই বরিশালে থাকার সময় থেকেই লিখেছেন, দিদির কাছে জানা গেছে। আমি তাঁকে বলেছিলাম, তুমি পড়েছ? কেমন লেগেছে তোমার?

দিদি বলেছিলেন, তুমি তাঁর কবিতা পড়, মুখস্থও বলতে পার নানান প্রসঙ্গের সঙ্গে মানানসই ক'রে, তুমি কেমন হতে পারে আন্দাজ করতে পার না?

আমি বলতুম, তুমি ঠিক বল নি। জীবনানন্দর গদ্য বাংলায় যে-রকম গদ্য লেখা হয়, তার থেকে মহনীয়তায় আলাদা তো হবেই, তাঁর প্রবন্ধে দ্যাখ নি? কিন্তু তাঁর কবিতার ধাঁচে লেখা হবে, তা হতেই পারে না।

আমি পড়ি নি, পড়তে দেন নি, কিন্তু এক নাগাড়ে লিখে যাবার সময় লুকিয়ে রাখা তো যায় না। দিদি বলতেন, তুমি বলো-না, আমিও বলব, দুজনে পড়ে দেখি।

আমি বলতুম, আমাকে পাত্তা দেবেন কেন তোমাদের যখন দেন নি? তবু লেখাগুলি ছাপাবার জন্য তোমাদের চাপাচাপি করা উচিত। কে বলতে পারে, এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবে হয়তো, যাতে বাংলা গদ্য একেবারেই নতুন একটা মাত্রা পেয়ে যাবে!

তবু একদিন নানারকম ইনিয়ে-বিনিয়ে কথাটা বলেই ফেললাম। তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন, খুকি বলেছে বুঝি? ও ঠিকই বলেছে, কিন্তু সেসব লেখা তো আর বেঁচে নেই।

যা বলেছেন, তা যে একেবারে হাড়ে-মজ্জায় সত্যি, তা প্রমাণ করবার জন্যই যেন নিজে থেকেই চোখে হেসে আবার বলেছেন, আমি তো এককালে গানও লিখেছিলাম, জানো?

গান? আমি প্রায় আঁৎকে উঠেছিলুম। দিদিও বিস্ময়ে হতবাক। অবিশ্বাসের সুরে বলেছিলেন, তুমি

নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ, তুমি গান লিখতে পার না, তোমার হাতে বাংলা আধুনিক গান খুলতেই পারে না। হঠাৎ এসব করতেই বা গেলে কেন ?

আমি খুব সাহস-টাহস সঞ্চয় করে যথেষ্ট নম্র গলায় বলেছিলুম, আপনার লেখা কেউ তবলা ঠুকে হারমনিয়ম বাজিয়ে গলা নেড়ে-নেড়ে গাইছে, বা মঞ্চে দাঁড়িয়ে দারুণ বানানো আবেগে গলা উঁচু-নিচু করে হাত নেড়ে আবৃত্তি করছে, এ ভাবতে গেলেই নির্ঘাৎ আমার শরীর খারাপ হবে।

কেন, আমার কবিতা আবৃত্তি করা যাবে না কেন ? ওগুলোর কোনোটাই কি আবৃত্তিযোগ্য নয় ? খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি বলে থাকবেন।

আমি আমার নবাবিষ্কৃত আত্মপ্রত্যয়ে বেশ স্থিরতা আঁচ করে বললুম, নয় কেন, আপনি নিজে আবৃত্তি করলে গ্রহণীয় হবে হয়তো, আপনি তো কবিতা-লেখার সময়টাকে ছুঁয়ে যাবেন, কমা-সেমিকোলন-কোলন-ড্যাশ-দাঁড়িগুলোকে হারিয়ে যেতে দেবেন না। পড়বার সময় কবিতাটা নতুন একটা অবয়বও পেয়ে যাবে হয়তো...

দিদির মাথায় তাঁর গান লেখার বিষয়টা ঘোরাঘুরি করছিল, তিনি বাধা দিয়ে বলেছিলেন, কিন্তু তুমি গান লিখতে গেলে কেন ? তুমি উৎসবের গানের আসরেও যে খুব সহজ হতে পার, তা তো মনে হয় নি।

সুবোধবাবু আমাকে তাতাতে লাগলেন যে, গান লিখলে সিনেমায়-টিনেমায় চলতে পারে, তাতে টাকাও বেশ আসে, টাকার তো প্রকৃতই খুব দরকার ; প্রেমেন তো কতই সিনেমার গান লিখেছে ! তা, ও আমার আসবে না, নষ্ট করে ফেলেছি।

আমি সেই হালকা সুরে আবার বললুম, সিনেমার নায়িকা চাঁদের দিকে তাকিয়ে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে আপনার লেখা গান গাইছে, সে যে কী একটা দৃশ্য হত না !

জীবনানন্দ মুখ বন্ধ রেখে সারা গা কাঁপিয়ে দারুণ হেসেছিলেন, মনে আছে। বলেছিলেন, এসব কথা গল্প করতে-করতেও কারুকে বলবে না যেন। এমন-কি সঞ্জয়বাবুকেও না।

*

এক পুজো গিয়ে আরেক পুজো এসে পড়ল প্রায়, জীবনানন্দর কবিতা আর জোগাড় করা হল না, বৃথাই তাঁর বাড়িতে আসছি-যাচ্ছি, দিদির সঙ্গে এখানে-সেখানে যাচ্ছি, এ-কথা সে-কথা বলছি। এবার জীবনানন্দর লেখাটা না পেলে আর চলছে না ; হেন কাগজ নেই, যেখানে তাঁর লেখা না বেরোচ্ছে। আমাদের ভুতুড়ে ডেরায় বসে জীবনানন্দ বিষয়ে নতুন-নতুন গল্প বলাবলি করে আর তাঁর কবিতা নানা রকম মনোনিবেশে পড়ে-পড়ে সময়টা কেটে গেল ; যখনি কাগজ বেরিয়েছে, ওঁর হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু কবিতা নিয়ে আর জোরাজুরি করা হয় নি।

ধনুর্ভঙ্গ পণ করে একদিন স্নেহাকর ও আমি নিঝুম দুপুরবেলায় গিয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির হলুম। তাঁর ঘরে দুজনে ঢুকতেও পেলুম। তক্তপোশে বসতেও বললেন। লেখা চাই-ই।

আমরা নিবেদন করলুম, 'আট বছর আগের একদিন'-এর সমসাময়িক কোনো পুরোনো লেখা যদি থেকে থাকে, আমাদের সে-রকম লেখা পছন্দ।

আমাদের ভিতরে জীবনানন্দর কবিতার কোনো-কোনো সাম্প্রতিক মূল্যায়নের হঠকারিতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ কাজ করছিল, চাপা থাকল না।

তিনি বললেন, কেন, ও-ধরনের লেখা তো অনেকের কাছেই এখন বেশ নিন্দিত, আপনাদের পছন্দ কেন ?

স্নেহাকর ঝটিতি কথা লুফে নিয়ে বলেছিল, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কেউ-কেউ মৃত্যুর কাছাকাছি বসবাস করছি এখন। মৃত্যুই আমাদের জীবনবিষয়ে বেশি মনোযোগী করে তুলছে।

আপনি হয়তো ঠিক। তিনি বলেছিলেন, কিন্তু সে-সময়কার লেখা আর কোথায় পাব, এখন কি আর ও-রকম লেখা গড়ে উঠবে, না, ওঠা উচিত? লেখাটেখা তো মুহূর্তের অভিজ্ঞতা-অনুরণন সাপেক্ষ।

আমার চাইতেও বেশি হতাশ হয়েছিল স্নেহাকর। ও কী রকম চুপসে গেল।

উনি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেন। বললেন, আমার এখনকার লেখা আমার বন্ধুদেরই অনেকের পছন্দ নয়, তা কী আর করা যাবে!

আমি তাড়াতাড়ি বলেছিলুম, আপনি জানেন, আমাদের কিন্তু দারুণভাবে টানে। হয়তো তিন-চার বছর আগে পড়েছিলুম, বোধ হয় 'মাসিক বসুমতী'তে, এখনও মনে করতে পারি—

ডুবল সূর্য; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।
এমনতর আঁধার ভালো আজকে কঠিন রুক্ষ শতাব্দীতে।
রক্ত ব্যথা ধনিকতার উষ্ণতা এই নীরব স্নিগ্ধ অন্ধকারের শীতে
নক্ষত্রদের স্থির সমাসীন পরিষদের থেকে উপদেশ
পায় না নব; তবুও উত্তেজনাও যেন পায় না এখন আর;
চারদিকেতে সার্থবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাঙ্ক মিনার জাহাজ— সব,
ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা,
প্লাসিয়ারের যুগের মতন আঁধারে নীরব।...

উনি সহসাই থামিয়ে দিয়ে বললেন, বুঝেছি। আপনারা দিন তিনেক পরে আসুন, লেখা আমি তৈরি করে রাখব।

আমরা তাঁর বাসা থেকে বেরিয়ে এলুম। রাস্তায় পৌঁছুতেই স্নেহাকর তো ভীষণ খাপ্পা, আপনি ওই কবিতাটা না বললেই পারতেন, 'বনলতা সেন' থেকে কোনো-একটা বললেই উনি বেশি খুশি হতেন—

কিন্তু আমি তাঁর মৃত্যুর পর দিদির কাছে শুনেছিলুম যে, 'ময়ূখ'-এর ছেলেদের তাঁর একটু অন্যরকম মনে হয়েছিল বলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন। কেন যে বলেছিলেন, তা কখনোই আমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি; স্নেহাকর, সমর বা জগদিন্দ্রর কাছেও হয়েছিল বলে জানা যায় নি। তবে আমরা অনন্যোপায়ের মতো উপলব্ধি করেছিলুম যে, আমরা আমাদের সাধ্যের অতীতে গিয়েও ঐকান্তিকতা ও সততার সঙ্গে 'জীবনানন্দ-স্মৃতি ময়ূখ' বার করব, তাতে আমাদের বই-পত্তর হাতঘড়ি পেন উপহারে-পাওয়া আংটি বা অন্য-কিছু— হয়তো সব-কিছু বেচে দিতে হবে, পরীক্ষার ফি জমা পড়বে না, 'ময়ূখ'-এর জীবনেরও ইতি ঘটবে, তবু বার করবই, এবং তাতে স্নেহাকরের কলমে 'নির্জনতম কবি' 'প্রকৃতির কবি' ইত্যাকার শিরোপাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে।

তিনি 'রাত্রিদিন' শীর্ষক যে-কবিতাটি দিয়েছিলেন, তা শারদীয় ১৩৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি আলাদা ছোটো কবিতা মিলিয়ে কবিতাটি তৈরি হয়েছিল, চাক্ষুষ করেছি; দুটি কবিতার মাঝামাঝিতে একটি তারা-চিহ্ন কবিতাটির এইভাবে গড়ে ওঠার ইতিহাসটি বলছে।

*

'শারদীয় ময়ূখ' তাঁকে খুশি করেছিল, স্মরণ করতে পারি। আপনারা বেশ যত্ন করে ছাপেন, যত্ন করে সাজান-গোছান, এটা প্রশংসার, তিনি বলেছিলেন।

পুজোর পরে-পরেই সেবার রেডিয়োতে একটা কবিসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিমন্ত্রিত ছিলেন, তাঁর কাছেও ঘটনার কথাটা শুনেছি। প্রধান কবিরা— আধুনিক এবং যাঁরা 'আধুনিক' অভিধাভুক্ত নন, তাঁরা— সবাই নিমন্ত্রিত। সেইসব দিনে রেডিয়োতে টেপ করে রেখে পরে তা সম্প্রচার

করার নিয়ম ছিল কিনা জানা নেই, তবে কবিসম্মেলনের দিন দুপুরবেলা তাঁর বাসায় গিয়ে পড়ে তাঁকে খুব অনিশ্চিত ও চিন্তান্বিত দেখা গিয়েছিল ; কারণটা আমার পক্ষে আঁচ করার চেষ্টা করাই বাতুলতা। আমার সাধ ছিল, দিদির ত্রিকোণ পার্কের অতিথি-বাড়িতে তাঁর সঙ্গে বসে রেডিয়োর অনুষ্ঠানটি শোনা। আমাদের ডেরায় রেডিয়ো ছিল না ; আর আজকের দিনের মতো রেডিয়ো-টেডিয়ো প্রায়-সকলেরই হাতের নাগালের মধ্যে সে-যুগে এসে পড়তে পারে নি। ত্রিকোণে যাবার আগে ল্যান্সডাউনে একটা চক্কর মারা যেতেই পারে।

প্রেমেন-সুধীনবাবু আসবেন তো, আমাকেও তো যেতে হবে, দেখ তো ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেল, তিনি নানা রকমভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এ-রকম সব কথা বলছিলেন। বেশ অস্থির। রঞ্জু একবার দুবার উঁকি মেরে গেল, কিন্তু সে-ও সমস্যাটা ধরতে পেরেছে, তেমন বোঝা গেল না।

আমি তাড়াতাড়ি ত্রিকোণ পার্কে ছুটলুম। দিদি এলেন। বেশ তাড়াতাড়ি করেই ঘরে ঢুকলেন, এবং একটু পরেই বেরিয়ে এলেন। আমি ঘরে ঢুকি নি, বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলুম, একান্তই পারিবারিক কোনো ব্যাপার কি-না কী করে জানব। তিনিই বেরিয়ে এসেই বললেন, চলো, একটু বাজার ঘুরে আসি।

কাছেই গড়িয়াহাট। অর্থাৎ বাজার। যা কেনা হল, তা এক জোড়া সাত নম্বর বাটার পাম্প-শু জুতো। জীবনানন্দর কাপড়ের জুতোর এক পাটির কড়ে আঙুলের কাছটা ছিঁড়ে গিয়েছিল ; পরলেই কড়ে আঙুলটি বেরিয়ে পড়ত।

জীবনানন্দ মোটামুটিভাবে আশ্বস্থ হয়ে কবিসম্মেলনে গেলেন। তিনি রেডিয়োতে তাঁর কবিতা এত নিমগ্ন আত্মানুভবে পড়েছিলেন যে, সেই থেকে এই অপরিবর্তনীয় ধারণাটা আমার হয়ে গেছে, কবিতার আবৃত্তি করা একমাত্র কবির নিজেকেই মানায়, তা তিনি উত্তমভাবে নাটুকে হোন আর নাই হোন ; তিনি কবিতার জন্মে-ওঠা ব্যাপারটা শ্রোতার কাছে বাহিত করেন, কবিতাটির বেঁচে-বর্তে থাকার বেদনাটিকেও তিনি শ্রোতার অভ্যন্তরে সঞ্চারিত করে দেন ; তা আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি কখনো পারেন না। একজন শ্রোতার পক্ষে এই ব্যাপারটি সমূহ জরুরি।

*

এর পর জীবনানন্দর সঙ্গে আমার এবং আমার বন্ধুদের আবার দেখা হল শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ১৫ অক্টোবর সকালে।

দিদির বোধহয় তমলুক থেকে কলকাতায় আসতে একটা রাত্রির সময় লেগেছিল. তিনি সকালে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে আমাকে জানাতে এলেন ; সঞ্জয় ভট্টাচার্য সকালেই ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমরা বন্ধুবান্ধব মিলে সেবা-শুশ্রূষার জন্য একটা দলমতো করো ; সকালের খবর-কাগজের মারফত তার আগেই খবরটা জানা হয়ে গিয়েছিল : ট্রাম-অ্যাকসিডেন্ট—হয়তো, হয়তো— ১৪ অক্টোবর সন্ধেয়। আমি পরে অরবিন্দ গুহকে জিজ্ঞেস করেছিলুম ; তিনি বলেছিলেন, প্রকাশ্য অথবা নেপথ্য— কোন্ মত ? আমি বলেছিলুম, নেপথ্য : তিনি বলেছিলেন, হয়তো।

কয়েকটি ডাক্তারি-পড়া ছেলে, পাশে বসে রাতজাগা, ওষুধপত্তর খাইয়ে দেওয়া, রোগীর সুবিধেমতো তাঁর ভারী শরীরটিকে নানান ভঙ্গিতে সাজিয়ে দেওয়া, মুখ ধুইয়ে দেওয়া, কাপড়চোপড় পালটে দেওয়া, বড়ো ডাক্তারবাবুদের হুকুম তামিল করা, (আর এখন জানি, তাঁদের নির্বিবেক অবহেলার চিকিৎসার সঙ্গী হওয়া) সজনীকান্তর তারাশঙ্করের কাছে সঞ্জয় ভট্টাচার্যর চিঠি বহন করে নিয়ে গিয়ে বিধান রায়কে দিয়ে চিকিৎসা-পদ্ধতি অনুকূলে প্রভাবান্বিত করার প্রয়াসের সঙ্গে প্রকারান্তরে জুটে-পড়া— এ-সব ছাড়া বিশেষ কী-ই বা করার ছিল ! আর-একটা কাজ ছিল, ধুম জ্বর ধেয়ে এসে জ্বরের ঘোরে কত জনের সঙ্গে কত কথা যে তিনি বলতে থাকতেন— যার প্রায় কিছুই ধরবার ছোঁবার নাগালের মধ্যে পাওয়ার মতো নয়— সেইসব কথা গভীর

অভিনিবেশে শুনে যাওয়া, যেন ভয়, আমরা যে অমনোযোগী হয়ে পড়ছি, তা জেনে ফেললেই তিনি বড়ো দুঃখ পেতে থাকবেন। তাই যদি হয়ে ওঠে, তা হলে আর কী করতে এখানে বসে আছি!

এমনি করেই ২২ অক্টোবরের রাত এসে পড়ল। তিনি মারা গেলেন। বেঁচে উঠবার সাধ ছিল, কিন্তু গলায় তেমন জোর টেনে আনতে পারতেন না। দিদি বলতেন, ভাবছ কেন, এই তো আজ তুমি অনেক ভালো আছ, জ্বর নেই, ভালো হয়ে উঠবে। আর পাঁচজন শুভাকাঙ্ক্ষী আর পাঁচজন মৃত্যুপথযাত্রীকে যেমন বলেন আর-কী। তিনি বলতেন, তাই বুঝি, হবে হয়তো—

আমরা তাঁর স্বজন-পরিজনের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করে তাঁর শবদেহ সেই রাত্রেই ত্রিকোণ পার্কে অশোকানন্দ-নলিনী দাশের দোতলার ফ্ল্যাটে নিয়ে এলুম। সিঁড়ির গোড়ার ঘরটিতেই দরজার দিকে মুখ করে তাঁকে পুষ্পাচ্ছাদনে সাজিয়ে শুইয়ে রাখা হল। ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপারগুলো আমাদের বোধগম্য হবার কথা নয়, তবে হয়েছিল যে, তাতে কোনো ভুল নেই। আমরা কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে থাকলুম, নীচে বকুলতলায় তা-বড়ো তা-বড়ো সাহিত্যিক-অধ্যাপক-সমালোচক-চিন্তাবিদরা যেমন, তেমনি বিখ্যাত ও অনতিবিখ্যাত তরুণ লেখক-কবিরা সব এসে পড়েছেন, মাঝে-মধ্যে কেউ-কেউ উপরে উঠে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ একগুচ্ছ রজনীগন্ধা শেষশয্যার পাশের লোকদের হাতে গুঁজে দিয়ে যাচ্ছেন, এঁদের কাউকেই প্রায় চিনি না। লজ্জায় হীনতাবোধে সারা রাত্রির ধকলে রাতজাগায় নোংরা জামাকাপড়ে অস্নানে অভুক্তে এমনভাবে উন্মার্গ ও সামান্য হয়ে আছি যে, তেতলায় যাবার সিঁড়ির গোড়ায় বসে থেকে-থেকে প্রায় লুকিয়ে রইলুম বলা চলে। দিদি মাঝে-মধ্যে এসে আমাদের চা জুগিয়ে সান্ত্বনা জানিয়ে যেতে লাগলেন, যদিও তাঁরও যে চা পানের সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হচ্ছিল না।

দুটো বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। খুব সকালে সবার চাইতে আগে এসেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শোওয়ার পোশাকেই মোটামুটি, পায়ে হালকা চটি, হাতে রজনীগন্ধার একটি গুচ্ছ, শবদেহের পাশে শুইয়ে দিয়ে এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কাউকে একটি কথা না বলে যেমন এসেছিলেন তেমনি ধীরপায়ে জুতোর শব্দ না তুলে চলে গেলেন। সেই গাম্ভীর্য সেই শোক আর ছোঁওয়া গেল না।

অন্য সবাই গল্প করলেন, গুলতানি করলেন, বকুলতলাকে রীতিমতো জমিয়ে তুললেন।

আর, এক সময়ে জীবনানন্দর স্ত্রী লাবণ্য দাশ আমাকে ঝুল বারান্দার কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, অচিন্ত্যবাবু এসেছেন, বুদ্ধদেব এসেছেন, সজনীকান্ত এসেছেন, তা হলে তোমাদের দাদা নিশ্চয়ই বড়ো মাপের সাহিত্যিক ছিলেন ; বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি অনেক-কিছু রেখে গেলেন হয়তো, আমার জন্য কী রেখে গেলেন, বলো তো!

তার পর তাঁকে শেষ দেখলাম, কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে বিকেলের নিভন্ত আলোয় চিতার লেলিহান শিখায়।

তার পরও তাঁকে দেখেছি, কিন্তু সে অন্যভাবে অন্য দেখা, অন্য প্রসঙ্গ।

ভূমেন্দ্র গুহ

'গীতাঞ্জলি'র ভাষাতাত্ত্বিক সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এরকম একটি বই যে বাংলা ভাষায় তৈরি হয়ে গবেষকদের হাতে পৌঁছোতে পারল, তার জন্য তোকিয়ো ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজ-এর ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ল্যাঙ্গোয়েজেস অ্যান্ড কালচারস্ অব এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা (সংক্ষেপে ILCAA ইলকা) এবং কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটকে কী বলে ধন্যবাদ দেব তা জানি না। যে-কাজ কোনো ব্যক্তিগত, এমন-কি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যমে এখানে করা সম্ভব হল না, জাপান ও ভারতের দুটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে তা সমাধা করলেন, এ অবশ্যই বিশেষ উল্লাসের বিষয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ দেওয়ার মতো অর্থহীন ভাবনার কোনো দরকার নেই। আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পৌঁছোক সেইসব ব্যক্তির ঠিকানায়, যাঁদের কল্পনা, কাজ এবং যোগ্য নেতৃত্ব এ বইটিকে প্রকাশ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন পরিচালকমণ্ডলীর তিন প্রমুখ ব্যক্তি— ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, ৎসুয়োসি নারা এবং নিখিলেশ ভট্টাচার্য। সম্পাদকমণ্ডলীতে এ তিনজন ছাড়াও ছিলেন নির্মল দাশ, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, করুণাসিন্ধু দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, ওয়াই সাকামাতো এবং তন্দ্রা রাও। এঁদের নির্দেশে কাজ করেছেন এক সমৃদ্ধ গবেষকমণ্ডলী। আমরা সকলকেই সম্মান ও সাধুবাদ জানিয়ে সমালোচনার গুরুদায়িত্ব পালনে অগ্রসর হব।

এ বই বাংলায় গবেষণার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে এখনও একমাত্র বলেই আমরা এই কাজটিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করতে চাই। যদি কখনো পাঠকের মনে হয় গ্রন্থের ত্রুটি-নির্দেশের পরিমাণ একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ আর কিছু নয়, সে কারণ হল, এ বইয়ের সাফল্য দেখাতে গেলে প্রায় পুরো বইটাই পুনরুদ্ধার করার দরকার হয়ে পড়ে, সমালোচনায় যা সম্ভব নয়। বাংলায়, বিশেষত বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে এ বই একটি মডেল ধরে নিয়েই আমাদের সন্দেহ সংশয় ও মতান্তর আমরা প্রকাশ করব। এ মডেল সাধারণ গবেষকের আয়ত্তের বাইরে, কিন্তু যদি এরকম একটি কাজ করে ফেলা যায় তা হলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা, অর্থাৎ তাঁর শব্দ ও শব্দবন্ধ, তাঁর ছন্দ ও মিল, কবিতায় তাঁর বাক্যপ্রকরণ, এমন-কি তাঁর রচনার মুদ্রণ-নীতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার, বা আগেকার অস্পষ্ট বা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সংশোধন করার কিছু শক্ত ভিত্তি গবেষকেরা পাবেন। কাব্যিক স্টাইলিস্টিকসের সেই ভিত্তি হিসেবেই এ বইটি বরণীয় হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার বাংলা ভাষার কিছু আভ্যন্তর চরিত্রও এ বইটি থেকে ফুটে উঠছে, সেগুলিও গবেষকেরা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করবেন।

বাংলায় এ ধরনের এটি প্রথম বই হলেও, রবীন্দ্র-গবেষণার আন্তর্জাতিক প্রকল্পে এটি-যে প্রথম বই নয়, তা আমরা জানি। তোকিয়োর ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত 'সন্ধ্যাসংগীত'-'প্রভাতসংগীত'-'গীতাঞ্জলি' (একসঙ্গে), 'গীতাঞ্জলি', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'মানসী', 'সভ্যতার সংকট' এবং 'কথা ও কাহিনী'-র শব্দপরিসংখ্যানের ছটি বই প্রকাশিত হয়েছে নারা, সাকামোতো ও মল্লিকের সম্পাদনায়। এ ছাড়া এ পর্যন্ত সেখানে এঁরা রবীন্দ্রনাথের তেত্রিশটি কাব্যগ্রন্থের ভাষাতথ্য ম্যাগনেটিক টেপ্ আর ফ্লপি ডিস্কে আধৃত করেছেন। কিন্তু বর্তমান বইটির পরিকল্পের পরিসর অনেক ব্যাপক। সে বইগুলিতে দু-একটি যা আমরা দেখেছি তার ভিত্তিতে বলতে পারি, কেবল শব্দসংখ্যা ও তার বারংবারতার উপরেই মনোযোগ বেশি ছিল সেখানে বক্ষ্যমাণ বইটিতে মোট 14টি সারণীতে এবং VI-টি পরিশিষ্টে এত বহুবিচিত্র তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে যে, এতে তাঁদের গবেষণার লক্ষ্যেরও অনেকটা সম্প্রসারণ এবং বহুমুখিতা ঘটেছে। এই বিস্তার ও বিভিন্নতার চরিত্রটি বোঝানোর জন্য সূচিপত্রটির বিষয় প্রায় হুবহু পুনরুদ্ধার করে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়েছে।

দুই

1 থেকে 97 পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে সারণী 1-এর দখলে। এখানে নির্বিচারে 'গীতাঞ্জলি'-তে যত কিছু শব্দ আছে প্রণেতারা তার প্রত্যেকটির বর্ণানুক্রমিক তালিকা করেছেন এবং তার বারংবারতা দেখিয়েছেন। এ শব্দগুলির উৎসগত শ্রেণী— সংস্কৃত, বাংলা, মিশ্র, না বিদেশী— তা নির্দেশ করেছেন, আর সেইসঙ্গে সমাসবদ্ধ পদের ক্ষেত্রে সমাসটিও দেখিয়ে দিয়েছেন। যেসব ক্রিয়াপদ এসেছে এই তালিকায়, সেগুলি সাধু, না চলিত, না সাধারণ (অর্থাৎ দুইই), না কাব্যিক— তাও জানিয়েছেন। দু-একটি ক্ষেত্রে এই শ্রেণীবিভাগ নিয়ে একটু সংশয় জাগে। তাঁদের হিসেবমতো সাকুল্যে 3091টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে। এখানে আমাদের মনে হয়েছে, শব্দের এই সামগ্রিক গণনার চেয়েও যদি 157টি গানে-কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের একটা গড় সংখ্যা আমরা পেতাম তা হলে অন্তত এ বইয়ে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার আকৃতির একটা সাধারণ আদল আমাদের কাছে খানিকটা ধরা পড়ত। বস্তুতপক্ষে অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তুলনায় 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'— এই তিনটি গানের বইয়ে গানের আকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অভিপ্রায় ফুটে উঠতে দেখি। অন্যান্য সাধারণ কবিতার বইয়ের সঙ্গে, ধরা যাক 'মানসী' বা 'নবজাতক'-এর সঙ্গে, তুলনা করলে বুঝতে পারি, গানের চার তুক-এর ধ্রুপদী সংগঠনের পূর্বনির্ধারিত ফ্রেম রবীন্দ্রনাথের গানগুলির গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে, 'গীতাঞ্জলি'-তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মান্য করা হয়েছে। সাধারণ কবিতার বইয়ে কবিতার আকারের যে অনির্ধারিত সম্ভাবনা থাকে, ছোটো ও বড়োর অসংখ্য ধাপের মধ্যে, তা 'গীতাঞ্জলি'-তে এবং পরবর্তী দুটি বইয়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি, এক ধরনের স্বেচ্ছাবৃত শাসন মেনেছেন— ধরা যাক, সনেটে যে-ধরনের শাসন কবিকে মানতে হয়। যদিও 'গীতাঞ্জলি'তে 106 নম্বর ('হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে') বা 108 নম্বরকে ('হে মোর দুর্ভাগা দেশ') ব্যতিক্রম বলে মানা যাবে, তবু এগুলি ব্যতিক্রম বলেই চিহ্নিত হবে, নিয়ম বলে নয়। কবিতা ও গানের শৈলীর পার্থক্যনির্ণয়ে ওই রচনাশরীরের শাব্দিক গড় কার্যকর হত। ফলে এই অংশে ভাষাতাত্ত্বিক বা ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ যতটা পাই, কাব্যশৈলীর চরিত্রনির্ণয়ে সহায়তা সেই পরিমাণে পাই না। অবশ্য সারণী 6·10-এ ছত্রসংখ্যার একটা হিসেব দেওয়ায় এই ত্রুটির আংশিক অপনোদন ঘটেছে।

সারণী 2-এ সম্পাদকেরা নিবদ্ধ করেছেন মূলশব্দের তালিকা, যার বিস্তার 101 থেকে 109 পৃষ্ঠা। মূলশব্দ, ইংরেজিতে যাকে *lexeme* বলা হয় তা হল পদরূপান্তর-নির্বিশেষে গৃহীত আভিধানিক শব্দটি, অর্থাৎ সম্পাদকেরা 'অকূল' 'অকূলে' 'অকূলের' 'অকূলযাত্রী' 'অকূলপাথার' ইত্যাদির মধ্য থেকে শুধু 'অকূল'-কে বেছে নিয়ে বর্ণানুক্রমে তালিকাবদ্ধ করেছেন। 'যাত্রী' আর 'পাথার'-ও অবশ্য যথাস্থানে রেখেছেন। শুধু তা-ই নয়, কোন্‌গুলি সমাসে বদ্ধ হয়েছে, সমাসের আগে আছে, না পরে, না মাঝখানে আছে— তাও চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়েছেন। সেইসঙ্গে যেগুলির সঙ্গে অনুসর্গের লেজুড় আছে সেগুলিকেও অন্যভাবে চিহ্নিত করেছেন।

এই অংশের বিচারে 'ভূমিকা'য় সম্পাদকীয় দাবির সঙ্গে তুলনা করলে দেখি, তাতে কয়েকটি অসংগতি জেগে উঠছে। প্রথমত 'সমাসবদ্ধ শব্দ ভাঙা হয়েছে, যেমন নিত্য-অনুগতা। নিত্য-র জায়গায় নিত্য ও অনুগতার জায়গায় অনুগতা' (xxii)। কিন্তু 'চির' শব্দযুক্ত সমাসের ক্ষেত্রে তা করেন নি— বরং 'চিরকাল' 'চিরকেনা', 'চিরজনম', 'চিরজীবন' 'চিরদিন' 'চিরদিবস' ইত্যাদি শব্দকে আস্ত চেহারাতেই তালিকায় ঠাঁই দিয়েছেন সম্পাদকেরা। অথচ 'নিত্য' ও 'চির'-র চরিত্রগত তফাত খুব বেশি আমাদের চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়ত, সর্বনাম আর ক্রিয়া— এই দু শ্রেণীর শব্দ এ তালিকায় দেন নি বলে ওঁরা জানিয়েছেন, কিন্তু সর্বনাম শ্রেণীতেও ফেলা যায় এমন অন্তত 3টি শব্দ— 'অনেক', 'আর-কেহ' (এটিকেও ভাঙা হয় নি), 'আরেক'. আর ক্রিয়াশ্রেণীতে ফেলা যায় এমন প্রচুর শব্দ এই তালিকায় এসে গেছে। এমন হতেই পারে যে, ক্রিয়াবিশেষ্যরূপী 'আনা' 'খোঁজা' 'খোলা' 'গাওয়া' 'ঝরা' 'দেওয়া' ইত্যাদিকে অন্তর্ভূত করার একটা যুক্তি আছে— যদিও সে যুক্তি কী তা সম্পাদকেরা বলেন নি। কিন্তু বিভক্তিযুক্ত 'দেবার' 'পাবার' 'হবার' 'হারাবার'-কে মূলশব্দের তালিকায় কেন গ্রহণ করা হল

তার যুক্তিও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

সারণী 3 (113-19) তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি আলাদা করে লক্ষ করছে কেবল প্রতিটি কবিতাকে— এক-একটি কবিতায় সংস্কৃত বাংলা বিদেশী কোন্ ধরনের শব্দ কী অনুপাতে ব্যবহৃত হয়েছে তার মূল্যবান নির্দেশ দিচ্ছে। শব্দ-শ্রেণীর মধ্যে তাঁরা আগের মতোই এখানে রেখেছেন সংস্কৃত, বাংলা, মিশ্র ও বিদেশী। এখানে যে-তথ্যটি চমৎকার বেরিয়ে আসে তা হল, প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় বাংলা শব্দের পরিমাণ সংস্কৃত বা তৎসমের চেয়ে অনেক বেশি, দুটি-একটি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও। এবং মোট 157টি কবিতার গোটা হিসেবে দেখি, তৎসম শব্দের সংখ্যা যেখানে 31.5 শতাংশ, সেখানে বাংলা শব্দের পরিমাণ 66.8 শতাংশ। মিশ্র ও বিদেশী শব্দ যথাক্রমে মাত্র 1.3 আর 0.4 শতাংশ। এইরকম হিসেব যদি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি কবিতার বইয়ের ক্ষেত্রে করে ফেলা যায় তবে তাঁর শাব্দিক আসক্তি ও প্রবণতার একটা ধারাবাহিক গ্রাফও তৈরি করে ফেলা সম্ভব। আশা করি এ বইয়ের সম্পাদকেরা তাঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকেই তার একটা মোদ্দা ছক আমাদের জন্য মজুত করে রাখবেন।

এ সারণীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। শতকরা হিসেবের দশ-দশ একক ধরে সংস্কৃত ও বাংলা শব্দের প্রয়োগ কোন্ কবিতায় কত দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, 1 থেকে 10 শতাংশ মাত্র সংস্কৃত শব্দ আছে— এমন কবিতার সংখ্যা মাত্র একটি (65)। কিন্তু মোট 114টি কবিতায় এই সংখ্যা 20 থেকে 40 শতাংশের মধ্যে। আবার 40 থেকে 50 শতাংশ তৎসম শব্দ মাত্র 17টি কবিতায়। 50 শতাংশের উপরে তৎসম শব্দ আছে মাত্র ন-টি কবিতায়। অন্য দিকে বাংলা শব্দ 60 থেকে 90 শতাংশের মতো আছে মোট 145টি কবিতায়।

সারণী 4-এ (123-25) আছে শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের হিসেব অনুযায়ী তাদের ক্রমনির্দেশ। তাতে দেখি, 1740টি শব্দ 1 বার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু 467, 238, 139 ও 100টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে 2, 3, 4, ও 5 বার। একটিমাত্র শব্দ, যার *rank* হল 1, তার ব্যবহার 205 বার। পল জিফ (Zipf) -এর সূত্রের উপর ভিত্তি করে এ বইয়ে এই শব্দব্যবহারের একটি রেখাচিত্রও দেওয়া হয়েছে, যা পরিসংখ্যান-বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগবে।

সারণী 5-এ আছে ছয় অক্ষর (সিলেব্‌ল অর্থে 'অক্ষর' ব্যবহৃত) শব্দ পর্যন্ত কোন্ ধরনের সিলেব্‌ল শব্দের কোন্ অবস্থানে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার হিসেব। একটি ভাষার শব্দাবলির শারীরিক নির্মাণভিত্তি বুঝতে এ কাজ মূল্যবান, কিন্তু আমার মতে একজন কবি বা লেখকের শব্দনির্বাচনে শব্দের অক্ষর-সংখ্যা ছাড়াও এত রকমের বিবেচনা ক্রিয়াশীল থাকে যে, সেই অনুপাতে অক্ষরসংখ্যা গণনার গুরুত্বের হেরফের ঘটে। কবি নিশ্চয়ই ছন্দ-মিলের তাগিদে অক্ষরপরিমাণের নিয়ন্ত্রণ খানিকটা মেনে নিতে বাধ্য হন, কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, একদিকে যেমন সমসংখ্যক অক্ষরে তৈরি একাধিক শব্দের ভাণ্ডার ভাষা তাঁর হাতে তুলে দেয়, তেমনই পাশাপাশি শব্দগুলির নির্বাচন চালাচালি ক'রে, অর্থাৎ নানা অক্ষরগঠনের শব্দ পাশাপাশি নির্বাচন ক'রে, বা পাশাপাশি শব্দগুলির অক্ষরমাত্রা হেরফের ক'রে, সেই কারণে কখনও শব্দের চেনা চেহারা ভেঙেচুরে বদলে দিয়ে— ছত্রের মোট মান্য অক্ষরের ছক খাড়া করার মধ্যে অনেকটাই স্বাধীনতা তাঁর থাকে। ফলে কবি শব্দনির্বাচনের প্রাথমিক ধাপেই অক্ষর গুণে শব্দ বাছেন, ঘটনা হয়তো এমন নয়। এই সারণী থেকে বাংলা শব্দের অক্ষর-বিন্যাসের একটা হিসেব পাওয়া যায়, যার একটা প্রাথমিক চেষ্টা ছিল সরকার (1979)-এ।[1] তবে এই সারণীতে স্বর ও অর্ধস্বরকে পৃথগ্‌ভাবে চিহ্নিত না করায় একটা অসুবিধে হতে পারে। বাংলা ভাষার গবেষকমাত্রেই জানেন এর লিখিত রূপে শব্দের প্রথমে ছাড়া অন্যত্র যে V(-owel) বা স্বরবর্ণ থাকে, ব্যঞ্জনলগ্ন স্বরচিহ্ন না হয়ে তা যদি আস্ত স্বরবর্ণ হয় তবে তা অধিকাংশত অর্ধস্বর, যেমন 'ভাই', 'লইব'-এর ই, বা 'পোলাও'-এর ও। এই সারণী থেকে সত্যি সত্যি বোঝা

---

1. 'সিলেব্‌ল-তত্ত্ব ও বাংলা ভাষায় সিলেব্‌লের গঠন', দ্রষ্টব্য সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত -সম্পাদিত 'বিভাব' 10, বর্ষা 1979, পৃ.33-54।

যায় না যে, এখানকার V অক্ষরটি আসলে পূর্ণস্বর না অর্ধস্বর। বলা বাহুল্য, যদি অর্ধস্বর হয় তা হলে তাকে সিলেব্‌ল হিসেবে গণ্য করাই কঠিন। 'নাচিয়ে'-তে শেষ এ (= য়ে) নিশ্চয়ই অক্ষর, কিন্তু 'তাহাই'-এ ই নয়, তা-'হাই' অক্ষরের অন্ত বা কোডা। ধরে নিচ্ছি, সম্পাদকেরা এ ব্যাপারে শ্রুতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন, বর্ণের দ্বারা হন নি। ভূমিকায় তো বলাই হয়েছে যে, কলকাতার 'শিষ্ট' উচ্চারণ তাঁরা মেনেছেন। তবু 'অরূপরতন' ও 'মেঘদূত'-এর 'অরূপোরতন আর 'মেঘোদূত' উচ্চারণ তাঁদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের ভরসা দুর্বল করে দেয়। এ ধরনের কিছু শব্দের ক্ষেত্রে সম্পাদকেরা অন্তত গানের উচ্চারণ মেনেছেন, এমন দাবি করাই বোধ হয় ভালো হত। এ বইয়ে 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি' গানে 'অরূপরতন'-এর উচ্চারণ 'অরূপ্‌রতোন্‌'-ই আছে। অর্থাৎ সম্পাদকেরা উচ্চারণে রাবীন্দ্রিকতা বলতে যা বুঝেছেন এবং সেই অনুযায়ী অ-রাবীন্দ্রিকতা বর্জন করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার ভিত্তি সম্বন্ধে সংশয় থেকেই যায়। 'গীতাঞ্জলি'-তেও সর্বত্র ছন্দ বা সুরের দাবিতে একই শব্দ একইভাবে উচ্চারণ হচ্ছে না— এমন দৃষ্টান্ত দেওয়াই যেতে পারে। যেমন : 37 নম্বর কবিতায় 'নয়নজলে' 'চরণতলে' 'প্রভাত-আলো' শব্দগুলিতে ন, ণ আর ত-এ অ (ও) উচ্চারণ করতে গেলে ছন্দদূষণ ঘটবে। আবার 13 নম্বরে 'নয়ন-ভুলানো' ছন্দেরই কারণে 'নয়নো-ভুলানো' পড়তে হবে। 'সাধু'ত্ব ও 'কথ্যতা'র হেরফেরেও উচ্চারণে হেরফের ঘটবেই। 50 নম্বর কবিতায় 'জীবনপ্রদীপ' 'জীবনোপ্রদীপ' হতেই পারে, কিন্তু 59-এ 'জীবন-মরণে' কে 'জীবনো-মরণে' পড়লে উচ্চারণগত অঘটন ঘটবে। দলবৃত্ত ছন্দের উচ্চারণমাত্রা একরকম, অন্য ছন্দের উচ্চারণমাত্রা আলাদা। সুতরাং রাবীন্দ্রিক উচ্চারণের একটা সরল ছক তৈরি করে তা থেকে সিদ্ধান্ত টানা একটু হঠকারী কাজ হয়েছে বলে মনে হয়।

সারণী 6-এ আছে দশটি পৃথক নির্দেশিকা, যার মূল পাঠ 133 থেকে 148 পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত। প্রথম নির্দেশিকায় a b c ইত্যাদি সংকেত দিয়ে প্রতিটি কবিতার অন্ত্যমিল ও অন্তর্মিলের পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশিকায় প্রতি কবিতার প্রথম ও শেষ ছত্র এবং তার পর স্তবকের শেষ ছত্রের অন্ত্যমিলের ছক প্রদর্শিত। 6.5-এ ধ্রুবপদের প্রকারভেদ, 6.6-এ ধ্রুবপদ ছাড়া অন্যান্য মিলের বৈচিত্র্য, এবং 6.7-এ 'অসমমিল'-এর সম্পূর্ণ তালিকা করে দিয়েছেন এঁরা।

এই 'অসমমিল' প্রসঙ্গে আমাদের একটা প্রশ্ন আছে। বাংলা কবিতার মিলের চরিত্র খুঁটিয়ে দেখলে 'অসমমিল' কথাটা খুব একটা সুপ্রযুক্ত বলে মনে হয় না। শেষ ব্যঞ্জনটির ক্ষেত্রে মিলের জন্য হুবহু একই ধ্বনি দরকার হবে, এবং সেখানে অল্পপ্রাণের জায়গায় মহাপ্রাণ হলে, বা কম্পিত ধ্বনির জায়গায় তাড়িত ধ্বনি (র~ড়) হলে 'অসম' মিল হবে— এ বড়ো বেশি জুলুম হয়ে যায়। হ্যাঁ 'তরী-পাড়ি'-র মিল নিশ্চয়ই অসম, কারণ সেখানে *assonance* বা স্বরধ্বনির পার্থক্য ঘটেছে। কিন্তু প্রণেতারা একে অসমমিলেরই অন্তর্ভুক্ত করলেন যে, সেটাই আশ্চর্য লাগছে, কারণ রবীন্দ্রনাথ আদৌ 'তরী-পাড়ি'-কে মিল হিসেবে আনেননই-নি ও কবিতায় (9 নম্বর কবিতা)। যদি তার চতুর্থ স্তবকটি লক্ষ করেন তাঁরা, তা হলে দেখবেন 'দোষে-বসে-কষি'— এই তিনটি শব্দ এসেছে পরপর ; আমাদের ধারণা, তৃতীয় শব্দটি মিলের পরিকল্পনায় আসে নি। কাজেই প্রথম স্তবকেও 'করি-তরী'-ই মিলপ্রকল্পের অন্তর্গত, 'পাড়ি' নয়।

অন্য সব 'অসমমিল' হয় অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ, না হয় কম্পিত র আর তাড়িত ড়-এর পার্থক্য লক্ষ করে 'অসম' বলে পরিগণিত হয়েছে। আমরা মনে করি, এইসব মিলে 'অসম' কিছু নেই। বাংলা কবিতার মিলের বিষয়ে যেটুকু আমরা সমীক্ষা করতে পেরেছি,[2] তাতে দেখেছি যে আমাদের মিলকল্পনায় অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ আর কম্পিত-তাড়িতর যুগ্মক এত বেশি যে পাঠকের তাতে কোনো বিষমতার বোধ জাগে না। সেটা বাংলা মিলের স্বাভাবিক প্রত্যাশারই অন্তর্গত। 'ভূমিকা'-তে যথার্থই বলা হয়েছে 'অন্ত্যঅসমমিল গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থে প্রভূত'— তার কারণই এই যে, বাঙালির বোধে এই মিলগুলি 'অসম' বলে মনেই হয় না। অন্য দিকে ভূমিকাতে

---

2. এই লেখকের 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি' (1985) গ্রন্থে 'বাংলা কবিতার মিল : তার ব্যাকরণ' অধ্যায়টি (পৃ. 59-81) দেখা যেতে পারে।

(xxxii) যে আকস্মিক মিলের কথা বলা হয়েছে 66-সংখ্যক কবিতায়, তাও এ কবিতার মিল-প্রকল্পের অন্তর্গত ছিল না বলেই মনে হয়। তাই তাকে 'মিল' বলে গণ্য করব কেন ? আর-একটা কথা—'তাড়িত দন্তমূলীয় মূর্ধন্য : র-ড়' (xxx) বিষয়টা ঠিক বুঝতে পারলাম না। 'র' সাধারণভাবে কম্পিত দন্তমূলীয় ধ্বনি বলে আমরা জানি, আর 'ড়' তাড়িত মূর্ধন্য। এ ক্ষেত্রে কোন্ বিশেষণটা কার এবং কেন— এমন জবাবদিহির একটা দায় থেকে গেল।

যাই হোক, 6.8, 6.9-এ এই অন্ত্য 'অসমমিলের' সংখ্যা ও ঘটনার নানা হিসেব আছে ; আর 6.10-এ কবিতার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে দামি পরিসংখ্যান আছে। দেখা যাচ্ছে 10 থেকে 20 পঙ্ক্তির মধ্যে পড়ছে 137-টি কবিতা, আর মাত্র 20টি কবিতার দৈর্ঘ্য তুলনায় বেশি। 21 থেকে 30 পঙ্ক্তির মধ্যে পাই আরও 14টি ; আর 32, 36, 40, 42, 48 আর 84 পঙ্ক্তির কবিতা মোটে একটি করে।

সারণী 7 (7.1-7.4, পৃ. 151-55)-এ আসছে ছন্দের পরিসংখ্যান। এও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার সার্বিক ছন্দ-প্রয়োগের একটা হিসেব এইভাবে করা গেলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ বিষয়ে গবেষকদের নিরতিশয় উপকার হবে। কিন্তু দুঃখ লাগল সম্পাদকেরা প্রবোধচন্দ্র সেনের নিজেরই বাতিল করা পরিভাষা 'অক্ষরবৃত্ত' 'স্বরবৃত্ত' ও 'মাত্রাবৃত্ত' ব্যবহার করেছেন বলে। ভূমিকার একটি সিদ্ধান্তও (xxxii) বেশ বিভ্রান্তিকর-- 'অক্ষর (syllable) উচ্চারণের তিনটি সাধারণ নীতি বাংলা কবিতার ছন্দ ও তার বৈচিত্র্যের ভিত্তি।' আমাদের প্রশ্ন— তিনরকমের ছন্দে অক্ষরের 'উচ্চারণের' নীতি কি আলাদা ? অর্থাৎ তিনরকম ছন্দে আমরা প্রতিটি সিলেব্‌লকে তিনভাবে উচ্চারণ করি কি ? এ তো বড়ো অদ্ভুত প্রস্তাব ! না, আমরা সিলেব্‌লকে তিনভাবে উচ্চারণ করি না তিনরকম ছন্দে, বরং আরও বিজ্ঞানসম্মত কথা হল, ছন্দ-বিশেষে শব্দের অক্ষরবিন্যাস আলাদা হতে পারে। সম্পাদকদের বলা উচিত ছিল, একই সিলেব্‌ল-এর মাত্রা-পরিমাপের বিভিন্নতাই বাংলা কবিতার ছন্দ ও তার বৈচিত্র্যের ভিত্তি। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলি।

দলবৃত্তের ছত্র, 'জননী গো, গাঁথব তোমার', সরল কলাবৃত্তের ছত্র 'গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার' আর মিশ্রবৃত্তের 'তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে'— এই তিন জায়গাতেই 'তোমার' কথাটি পাই ; তার দুটি সিলেব্‌ল 'তো' আর 'মার'। এ দুয়ের উচ্চারণ কি আলাদা হচ্ছে তিনরকমের ছন্দে ? তা কেন হবে ? যা আলাদা হচ্ছে তা হল রুদ্ধদলের (closed syllable-এর) মাত্রাগত 'ওজন'— যা কোথাও একমাত্রা, কোথাও দু-মাত্রা হচ্ছে। আর মুক্তদলের (open syllable) উচ্চারণ দূরে থাক, মাত্রামানও কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই তিন ছন্দে আলাদা হয় ; সাধারণত হয়ই না। এ ধরনের কাজে তাই এ জাতীয় অসতর্ক কথাবার্তা বাঞ্ছনীয় ছিল না।

এ বইয়ের ছন্দ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের আরও একটি-দুটি সমস্যা আছে। 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতার প্রতি ছত্রের মাত্রাবিন্যাস এঁরা দেখিয়েছেন 8/4/6 হিসেবে, যা আমাদের মতে হওয়া উচিত ছিল 8/10 ; বেশি খুঁতখুঁতে হলে 8/8/2। পরের 109 নম্বর কবিতাতে এঁরা ছত্র ভাগ করেছেন 4/6 মাত্রার পর্বে, 131 নম্বর কবিতার ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের মতে এ দুটিরই ছত্রে স্বাভাবিক পর্বভাগ হবে 8/10 এবং 8/2। 109 নম্বর কবিতার ছত্র রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভেঙেছেন তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, আমরা যদি লাইনগুলিকে এভাবে সাজাই—

ছাড়িস নে, ধরে থাক্ এঁটে, ওরে, হবে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে, ওরে, আর নেই ভয়।
ওই দেখ্ পূর্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
শুকতারা হয়েছে উদয়, ওরে, আর নেই ভয়।

তা হলে চমৎকৃত হয়ে লক্ষ করি এতে 'দুর্ভাগা দেশ'-এর অর্থাৎ 8/10-এর প্যাটার্নটিই যেন ফুটে উঠছে। তখন আর 'ওরে'-কে অতিপর্ব হিসেবে গণ্য করার যুক্তি থাকছে না। ছন্দের অন্তর্লীন ফ্রেম আর পঙ্ক্তিবিন্যাসে বিষমতা এনে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে একটি আততি নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন, তা মান্য করলেও ছন্দের

ওই মূল কাঠামোটি যেন আমাদের আড়ালে না পড়ে যায়। 131-সংখ্যক কবিতায়ও 8 মাত্রারই প্রভুত্ব দেখি। অবশ্যই প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর বইগুলিতে দ্বিমাত্রাভিত্তিক নানা মাত্রার পর্বের কথা বলেছেন মিশ্রবৃত্তের ক্ষেত্রে, তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে— কিন্তু ঐতিহ্যাগতভাবে মিশ্রবৃত্তের স্বাভাবিক পূর্ণপর্ব 8/6, 8/10 মাত্রার— এটাই আমরা আপাতত মানি। এ নিয়ে তর্ক চললে ক্ষতি নেই।

7.5 -এ 28-সংখ্যক কবিতাটি সম্বন্ধে ('প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে') এঁরা বলেছেন, সেটি দলবৃত্ত মিশ্রবৃত্ত দুরীতিতেই পড়া যায়। কিন্তু যার উল্লেখ করেন নি তা হল তৃতীয় স্তবকের 'তোমায় চাই' ছত্রটি— যা দুরীতিতেই একটু ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এ ছত্রের মাত্রা মিশ্রবৃত্ত এবং সরল কলাবৃত্ত দু ছন্দেই পাঁচ হওয়া উচিত, কিন্তু পাঁচের পর্ব এ কবিতার ছন্দের ছকে কোথাও নেই।

ওই সমস্যাকীর্ণ ছত্রটির কথা বাদ দিলেও আমাদের মনে হয় কবিতাটি মূলত ছ-মাত্রার সরলকলাবৃত্ত— তার পর্ববিভাগ এইরকম হবে—

প্রভু] তোমা লাগি আঁখি | জাগে 2-6-2
দেখা নাই পাই 6
পথ চাই, 4
সেও মনে ভালো | লাগে। 6-2

ধুলাতে বসিয়া | দ্বারে 6-2
ভিখারি হৃদয় | হা রে, 6-2
তোমারি করুণা | মাগে 6-2
কৃপা নাই পাই 6
শুধু চাই 4
সেও মনে ভালো | লাগে। 6-2

অর্থাৎ সরল কলাবৃত্তে 6 মাত্রাভিত্তিক পাঠই এ কবিতার স্বাভাবিক পাঠ।

এই ছন্দ প্রসঙ্গেই সম্পাদকদের গ্রন্থনির্দেশ সম্বন্ধে একটা কথা মনে হয়েছে। আমরা লক্ষ করি, ছন্দ সম্বন্ধে তাঁদের তথ্য মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠার হলেও নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জিতে দেখি ছন্দের বইয়ের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। অভিধান বাদ দিলে গ্রন্থপঞ্জিতে ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে মোট 24টি বইয়ের ও রচনার তালিকা আছে, তাতে আটটিই ছন্দের বই। পঞ্জিতে ছন্দ-গ্রন্থের এই পরিসংখ্যানগত (33.3%) গুরুত্ব কিন্তু ছন্দ-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণকে উজ্জ্বলতা দেয়নি। দ্বিতীয়ত, প্রবোধচন্দ্র সেন ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ছাড়া তাঁদের সমীক্ষায় অন্য কারও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় নি, কাজেই রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তারাপদ ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য ও মোহিতলাল মজুমদারের বইয়ের উল্লেখ করার কোনো অজুহাত এ কাজে তৈরি হয় নি। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রবোধচন্দ্র সেনের একটু প্রাচীন তত্ত্বভূমিকা যদিও এখানে মান্য করা হয়েছে, তবু তাঁর ছন্দ-বিষয়ক যে দুটি তাত্ত্বিক গ্রন্থ— 'ছন্দ-পরিক্রমা' ও পরে 'নূতন ছন্দ-পরিক্রমা'— তার উল্লেখ করেনই নি, কেবল 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'-কেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী' নিয়ে অন্যান্য ছোটোখাটো সমস্যাও আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে পরে বলব আমরা।

সারণী 8-এর (159-64) চারটি অংশ— শব্দদ্বৈতের তালিকা, শব্দত্রিত্বের তালিকা, বিপরীতার্থক শব্দগুচ্ছ এবং সমার্থক শব্দগুচ্ছ। এ অধ্যায়টি মূল্যবান। দু-একটা প্রশ্ন জাগে এঁদের অবলম্বিত পরিভাষা সম্বন্ধে, কিন্তু তা আমরা এখন নিরস্ত রাখছি। 'গুরুগুরু' 'ছলছল' 'ঝরঝর'— এই কথাগুলিকে আমরা শব্দদ্বৈত বলব কিনা সেও এক সমস্যা। এগুলিতে দুটি শব্দের বদলে কখনও কি একটা শব্দ পাই আমরা ? অর্থাৎ 'গুরু' 'ছল' বা 'ঝর' কি এককভাবে অনুরূপ অর্থ, বা মৃদুতর অর্থ প্রকাশ করে ? কাজেই মনে হয়, এগুলির দ্বৈততাই হল

মৌলিক রূপ। আর সমার্থক শব্দযোগে শব্দদ্বৈতের দৃষ্টান্ত এঁরা দিয়েছেন 'ভাঙাচোরা' (161)। একে কি 'শব্দদ্বৈত' বলা যাবে ? 'শব্দদ্বৈত' তো একই শব্দের পুনরাবৃত্ত সংগঠন, খানিকটা প্রতিধ্বনিত রূপের মতো। 'ভাঙাচোরা' কি তাই ? বিপরীতার্থক শব্দবিন্যাসের তালিকায় 'আমি-তুমি' 'আমার-তোমার' (বা 'আমায়-তুমি' ইত্যাদি প্রাতিপদিক-মিশ্র রূপ) অন্তর্ভূত করা গেলে 'গীতাঞ্জলি'-র একটি মূল জায়গা ধরা সম্ভব হত। কেন জানি না সম্পাদকেরা এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বনামকে এঁদের বিপরীতার্থক শব্দের তালিকায় বিশেষ প্রশ্রয় দেন নি।

পরবর্তী সারণী 9-এ বাক্যাংশের দ্বিত্ব ও ত্রিত্বও গবেষকদের সহায়ক হবে। এখানে হয়তো আর-একটু সূক্ষ্মভাবে বলা যেত যে, কোথাও কোথাও বাক্যাংশের হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটে নি, বরং ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বাকি অংশ নতুন এসেছে, ফলে প্রতিধ্বনি-অনুকরণ না হয়ে সমান্তরালতা (*parallelism*) তৈরি হয়েছে। তার ফলে এক ধরনের বিরোধ-সংঘট্টও তৈরি হয়। ফলে 'এই করেছ ভালো, নিঠুর, / এই করেছ ভালো' হয়তো নিছক আবেগপ্রাবল্যজনিত পুনরাবৃত্তি, কিন্তু 'জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ, / গর্জি উঠুক সকল বাতাস' -এ অন্বয়গত সমান্তরালতা সত্ত্বেও ক্রিয়া এবং কর্মপদে সম্পূর্ণ নতুন সংবাদ এসেছে। এগুলিকে সাদাসিধে দ্বিত্ব বা ত্রিত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিলে কবিতার ভাবগত বিন্যাস ও অগ্রগতির বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে যাবে।

সারণী 10 (171-91) তিনটি অংশে বিশেষণ-বিশেষ্য, সংখ্যাবাচক বিশেষণ-বিশেষ্য এবং বিশেষণসদৃশ (*adjectivals*)-বিশেষ্য সমন্বয়গুলিকে তুলে ধরেছে। এও গবেষণার দিক থেকে সম্পাদকদের সহৃদয় উপহার। সম্বন্ধবিভক্তিযুক্ত যেসব সর্বনাম ও বিশেষ্যপদ বিশেষণের মতো ব্যবহৃত হয় সেগুলির তালিকা এই সারণীতে পরবর্তী বিশেষ্যটির সঙ্গে থাকলেই ভালো হত। যেমন : 'জীবনের স্রোত' 'অমৃতের (কত) রসবরষন', 'সুরের জাল', 'সুরের আলো' 'সুরের হাওয়া', 'সুরের সুরধুনী' এমন-কি 'তোমার আনন্দ' 'তোমার দান'— সবই। অনেকগুলিতেই ভাঙা রূপকের দেখা পাই, এবং রবীন্দ্রনাথের মেটাফর-নির্মিতির এ এক বিশেষ রূপতাত্ত্বিক উপায়। এ বৈশিষ্ট্যটি সারণী 11-তে দেখিয়েছেন সম্পাদকেরা। তাতে কিছু বাদও পড়েছে বলে মনে হল, কারণ 'অতি-ইচ্ছার সংকট' আর 'আধা-ইচ্ছার সংকট' (কবিতা 2)—এ দুটি প্রয়োগ তাঁদের সারণীতে খুঁজে পেলাম না। এইরকমভাবে বাদ পড়েছে 'চিরজীবনের পরিচিত' (3), 'অলস আঁখির আবরণ' (6), 'সুদূরের ধন' (12), 'হাসিকান্নার ধন' (12), 'অরূপের (কত) রূপদরশন' (21), 'অমৃতের (কত) রসবরষন' (21) ইত্যাদি। কবিতাগুলি ভালো করে খুঁজলে নিশ্চয়ই এধরনের আরও কিছু ছাড় চোখে পড়বে। এখানে একটু সতর্কতার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। তবু গবেষকরা এই দুটি সারণী থেকে মূল্যবান সহযোগিতা লাভ করবেন।

সারণী 12 ও 13-তে আছে যথাক্রমে উপসর্গ ও 'সাপেক্ষ রূপমূল'-এর (*bound morpheme*) তালিকা। উপসর্গগুলিও অধিকাংশ যে তথাকথিত সাপেক্ষ রূপমূল সে কথা সম্পাদকেরা কেন বললেন না জানি না। তবে অন্যান্য সারণীর তুলনায় এ দুটির গুরুত্ব যথেষ্টই কম। তার কারণ, কবি মূলত পদ নির্বাচন করেন তাঁর কবিতার জন্য, তিনি 'বদ্ধ রূপ' বা *bound morpheme* আলাদা আলাদা করে বাছেন বলে মনে হয় না। কাজেই কবি কোন্ উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি ব্যবহার করবেন, এটা খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁর সজ্ঞান বাছাইয়ের বিষয়। কোনো সময়েই নয় তা অবশ্য বলি না— ছন্দ ও মিলের জন্য কখনও কখনও তাও বেছে নেওয়ার দরকার হতেও পারে। কেবল সেগুলি দেখালেই হয়তো হত।

সারণী 14-র বিষয় সর্বনামের তালিকা। নিছক তালিকা হিসেবে এর উপযোগিতা সংশয় জাগায়, কিন্তু সর্বনাম-বিশেষের বারংবারতার তথ্য জরুরি। যেমন 'আমি' এবং 'আমি'-সংক্রান্ত সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে 351 বার, আর 'তুমি' এবং তার কারকাশ্রিত সর্বনামের ব্যবহার হয়েছে 292 বার। এইজন্যই 'গীতাঞ্জলি'তে 'আমি-তুমি'-র বিরোধাভাসের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

সারণী 15-কে মোট ছটি অংশে ভাগ করে সম্পাদকেরা যৌগিক ও যুক্তক্রিয়ার তালিকা দিয়েছেন। এটি বাংলা ভাষার গবেষকদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান, রবীন্দ্র-গবেষকদের পক্ষে ততটা নয়। এখানে মূল ক্রিয়া ও সহক্রিয়ায় যে বিপর্যাস (inversion) ঘটেছে বাংলা কাব্যভাষার নিয়মে, সেটি এঁরা আলাদা করে দেখান নি, অর্থাৎ 'উঠব

জেগে'-কে এইভাবেই তালিকাভুক্ত করেছেন, 'জেগে উঠব' হিসেবে দেখান নি। পরে 16.2-4-এ কেবল তার সাকুল্য পরিসংখ্যান দিয়েছেন। ক্রিয়াবিশেষণসূচক যৌগিক ক্রিয়াতে কয়েকটি তালিকাভুক্ত গুচ্ছ আসলে যৌগিক ক্রিয়া কি না, সে সম্বন্ধেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, যেমন 'এনেছিলাম তুলি', 'জেগে দেখি', 'চলে (গগন) বেয়ে', 'ধরব কষি', 'পড়বি ঘুরে', 'যাবি ছুটে', 'রাখলি এনে' 'লুটিয়ে পড়ুক' ইত্যাদি। এগুলিতে যৌগিক ক্রিয়ার যা সাধারণ লক্ষণ, অর্থাৎ সহক্রিয়াটির (তথাকথিত *vector verb*-এর) নিজস্ব অর্থের নিষ্কাশন হয়ে ব্যাকরণগত অর্থের সঞ্চার বা প্রাহার ভাষাপণ্ডিত পোরিজ্‌কার ভাষায় 'grammaticalization' —তা ঘটতে দেখছি না। এ ক্ষেত্রে সহক্রিয়ার মূল অর্থ অব্যাহতই আছে। '—তে' যুক্ত অসমাপিকা-বদ্ধ যৌগিক ক্রিয়ার (এগুলির যৌগিক ক্রিয়াত্ব নিয়ে অন্য ধরনের প্রশ্ন আছে) তালিকায় অন্তত দুটি দৃষ্টান্ত অসম্পূর্ণ— 'দেখিয়া লইতে' এবং 'শুনিয়া লইতে'। পুরো দৃষ্টান্ত হবে 'দেখিয়া লইতে সাধ যায়' এবং 'শুনিয়া লইতে চাহ'। অর্থাৎ 'সাধ যা-' এবং 'চাহা-' ক্রিয়ার কর্ম হিসেবে আসছে 'দেখিয়া লইতে' 'শুনিয়া লইতে' ; এগুলি নিজেরা পুরো যৌগিক ক্রিয়া নয়।

সম্পাদকেরা '-তে' সংক্রান্ত তথাকথিত যৌগিক ক্রিয়ার তালিকা করলেও '-বারে' দিয়ে যে একই ধরনের যৌগিক ক্রিয়া কাব্যিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয় তা কেন লক্ষ করেন নি বুঝলাম না। যেমন 'ফিরিছে (মরাল) ডানা পাতিবারে', 'চাহ করিবারে পান', '(হেথায় সবারে) হবে মিলিবারে' ইত্যাদি। হয়তো এধরনের প্রয়োগ বেশি নেই, তবু এদের হিসেবের বাইরে রাখা উচিত হয় নি। 15.4-এ সংযোগমূলক ক্রিয়ার তালিকাটিতে 'জীবনধারা বেয়ে'-তে (127 নম্বর) আদৌ কোনো ক্রিয়া আছে কি না সন্দেহ, কারণ 'জীবনধারা বাওয়া'— এরকম কোনো সংযোগমূলক ক্রিয়া বাংলায় থাকাটা বেশ আশ্চর্যের। তালিকার 182 - 184 আইটেমে 'না যেন করি প্রচার' 'না যেন করি ভয়', এবং 'না যেন মানি ক্ষয়' -এ 'না যেন' অংশটা প্রথম ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়া উচিত ছিল। তাঁরা 'পাই (নে) দেখা'-তে 'নে'-কে ঠিকভাবেই ব্র্যাকেটবদ্ধ করেছেন, কিন্তু 'পাই না অধিকার', 'পাব না ছাড়া', 'পায় না নাগাল'-এ 'না'-কে দিব্যি স্বাধীনতা দিয়েছেন। এইরকম আরও দু-এক জায়গায় ঘটেছে। আবার 'নির্বাসন দিলে অবহেলে'-কে (15.5) সংযোগমূলক যৌগিক ক্রিয়া বলা যাবে কিনা সন্দেহ, কারণ সাধারণ বোধে 'অবহেলে' 'অবহেলিয়া'র রূপান্তর নয়, 'অবহেলায়'-এর কাব্যিক রূপ। তবু এই সারণীটি বাংলা ভাষাতত্ত্বের জন্য অপরিহার্য।

সারণী 16-রও মোট চারটি অংশ, এর মূল নজর বাক্যের পদক্রমের উপর। এই পদক্রমে ক্রিয়াপদের অবস্থান কাব্যভাষায় যে নানাভাবে বিচ্যুত হয় তা বিশেষভাবে দেখিয়েছেন এঁরা— ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য বিশেষ্য ও ক্রিয়াবিশেষণ পদের আপেক্ষিক অবস্থান দেখিয়ে। এটিকে ব্যবহার করে গবেষকেরা বাংলা কাব্যভাষার পদক্রম-বিপর্যাসের কয়েকটি সূত্র নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে পারবেন। যদিও শুধু বর্ণের— যার মধ্যে া, ি, ী, ে-ও বর্ণ হিসেবে গৃহীত— হিসেব খুব জরুরি হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। সারণী 17-এ বাক্যের ও বাক্যখণ্ডের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে মূল্যবান হিসেব, 18তে বর্ণ অনুযায়ী শব্দের দৈর্ঘ্যের হিসেব। এসবের রসগ্রহণ করার লোক নিশ্চয়ই দু-একজন পাওয়া যাবে।

তিন.

পরিশিষ্ট আছে মোট ছটি। প্রথমে কবিতা রচনার স্থানকাল। কালের ব্যাপারে দেখি, আসন্ন বর্ষা থেকে শরতের মধ্যে অর্থাৎ দুটি বছরের (সন 1316 ও 1317) জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 125টি কবিতা। বাকিগুলি মোট পাঁচ বছরের (1313 – 1317) নানা সময়ে লেখা। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে সম্পাদকেরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্থান-কাল-পাত্র বাচক বিশেষ্যগুলির তালিকা দিয়েছেন। তৃতীয়তে তারই পরিসংখ্যানগত চারিত্রনির্দেশ। এতে ভাববাচক বিশেষ্যের তালিকা নেই বলে জানিয়েছেন, কিন্তু কেন নেই তার পক্ষে কোনো যুক্তি দেন নি। রবীন্দ্রনাথের, বিশেষত 'গীতাঞ্জলি'র কবিতায় 'অহংকার' 'গৌরব' 'অপমান' 'শান্তি' 'কান্তি' 'বাসনা'

'কৃপা' 'মহাদান' 'অতি-ইচ্ছা' 'দয়া' 'মিলন' 'আধা-ইচ্ছা' 'সংকট' ইত্যাদি ভাববিশেষ্যের দেখা মুহুর্মুহু মেলে, তাদের বিশেষ চরিত্রও আছে। ফলে 'বিমূর্ত ভাব তালিকা তৈরী হয় নি'— এই অসংকোচ বক্তব্য নিয়ে আমাদের প্রশ্ন রইল। তা হলেও এই তালিকা চিত্তাকর্ষক। চতুর্থ পরিশিষ্টে ধাতুর অধোক্রমিক তালিকাটিও তাই। এখানে দেখি, 'কর্' ধাতুটি মোট 206 বার ব্যবহৃত, যা আস্ হ্ দি যথাক্রমে 188, 179, 162 ও 126বার। এ থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ব্যবহৃত ধাতুগুলির একটা রিলিফ-ম্যাপ পাওয়া যাবে। পঞ্চম পরিশিষ্টে উর্ধ্বকমাহীন অসমাপিকা কোন্ কবিতার কোন্ পঙ্ক্তিতে আছে পাঠক তা পাবেন, আর ষষ্ঠ পরিশিষ্টে 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম ও 1388 সংস্করণে মুদ্রণ ও সংস্কারের পার্থক্য দেখানো আছে। বাক্যগঠনে, বানানে, মুদ্রণভ্রান্তিতে শব্দসংহতিতে যে-তফাত ঘটেছে দুটি সংস্করণে তাও সম্পাদকেরা লক্ষ করতে ভোলেন নি। এমন-কি যতিচিহ্ন বিষয়ে ওই দুই সংস্করণে কী বিষমতা ঘটেছে তাও দেখিয়ে দিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জি সম্বন্ধে আগে দু-একটা কথা বলেছি। তাতে বাংলা বইয়ের উল্লেখে প্রথম দিকে বইয়ের নামের দুপাশে উর্ধ্বকমা আছে, কিন্তু পরের দিকে নেই। 'বাংলা ছন্দ', 'ছান্দসিকী', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি বইয়ের প্রকাশকের নাম নেই, Gleason-এর বইয়েরও নেই, কিন্তু সে বইয়ের প্রকাশ যে এপ্রিল মাসে হয়েছে তা জানানোর কোনো দরকার ছিল না। Soares-এর বইয়ের নাম ইটালিক্‌সে দেওয়া হয় নি। ভূমিকা অংশ যে কম্পিউটারে কম্পোজ় করা হয়েছে তাতে ঙ্গ-এর 'ঙ্গ' রূপে মাথার উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু কেন এসে বসে বুঝি না— এ কম্পিউটারটি স্কুলের লেখায়-কাঁচা ছেলেদের মতো কি ? মুদ্রণে দন্ত্য ন-য় ড-এ আর মূর্ধন্য ণ-য় ড-এ চিহ্নদুটি প্রায়ই গুলিয়ে গেছে, 'পরিবর্ধিত' বানানে 'র্দ্ধ' ব্যবহার করা হয়েছে। একটি-দুটি মুদ্রণপ্রমাদ আছে, বেশি নয়।

চার.

এসব সমালোচনা এবং খুঁত-ধরা সম্ভব হল, যেহেতু অশেষ পরিশ্রম করে বইটির মূল্যবান তথ্যসম্ভার আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন এ গ্রন্থের প্রস্তুতকারীরা। এঁদের বিপুল তথ্যের এবং পরিসংখ্যানভিত্তিক বিন্যাসের সূত্রেই সমালোচক শুধু-যে ত্রুটি নজর করেছে তা-ই নয়, নিজের ভাবনাচিন্তাকেও চালাচালি করে খানিকটা স্বচ্ছ করে নিতে পেরেছে, ফলে সে কারণেও বইটির জন্য সমালোচক কৃতজ্ঞ। আর-একবার এ বইয়ের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, তাঁদের তথ্যগুলির মূল্য অপরিসীম বলেই তার বিন্যাস ও তত্ত্বের ভিত্তি যাতে আরও সমর্থ হয় সেদিকে লক্ষ রেখে উপরের ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া গেল। মূল অর্জনের তুলনায় তত্ত্ব, তথ্য ও পরিবেশনার ত্রুটি সামান্যই বলব।*

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, ৎসুয়োসি নারা, নিখিলেশ ভট্টাচার্য, নির্মল দাশ, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, করুণাসিন্ধু দাশ, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, ওয়াই সাকামাতো, তন্দ্রা রাও -সম্পাদিত, গীতাঞ্জলি ভাষাতাত্ত্বিক সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, আই এস আই-ইলকা যুগ্ম গবেষণা প্রকল্প :1, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা, 1994।

পবিত্র সরকার

* বিশেষ প্রয়োজনে এই রচনার সর্বত্র অ্যারাবিক আর রোমান সংখ্যা ব্যবহৃত। —সম্পাদক

ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যসহায়ক কোষজাতীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থপঞ্জি আজও অপ্রতুল। বাংলায় রবীন্দ্ররচনার গ্রন্থপঞ্জি পাওয়া গেলেও তা অনেকাংশে খণ্ডিত, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার পূর্ণাঙ্গ সূচি আজও তৈরি হয় নি। রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক গ্রন্থের তালিকাও অসম্পূর্ণভাবে কয়েকটি প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক রচনার তালিকা আজ পর্যন্ত হল না। বরং বাংলাদেশ এই ব্যাপারে আমাদের চেয়ে তৎপর।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনার পরিমাণ বিপুল এবং বিচিত্র, সেইসঙ্গে তাঁর বাংলা রচনার ইংরেজি অনুবাদও ক্রমশই স্ফীততর হচ্ছে। রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদের নির্ভরযোগ্য সংকলনের প্রথম খণ্ডটি কবির জীবনাবসানের অর্ধশতক পরে সাহিত্য অকাদেমীর সৌজন্যে শিশিরকুমার দাশের অমিত প্রযত্নে সদ্য আমাদের ব্যবহারযোগ্য হতে পেরেছে। সুধাময়ী দেবী তাঁর কীর্তিমান স্বামী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ-সন্ধান থেকে তথ্য আহরণ করে ১৯৭৬-৭৮-এ দুখণ্ডে রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদসূচি প্রকাশ করেছিলেন। বহুতর অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সেই তথ্যপঞ্জিই ছিল এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ইংরেজি অনুবাদের ব্যবহার্য নির্দেশিকা। অথচ ১৯৭৬-৭৮-এর পর দুদশকে আরও বহু অনুবাদকর্ম সম্পূর্ণ হয়েছে বা অনুবাদের সন্ধান মিলেছে, রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুর পক্ষে যা সুলভ নয়। রবীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার মতো যাবতীয় ইংরেজি রচনা, বক্তৃতা ও ভাষণ সূচিন্যস্ত করার উদ্যোগ ছিল পুলিনবিহারী সেনের, যিনি তাঁর একাধিক অসম্পূর্ণ ব্রতের মতো এটিকেও অসমাপ্ত রেখে চলে গেছেন। ১৯৭০-এ জগমোহন মুখোপাধ্যায় -সংকলিত 'বেঙ্গলি লিটারেচার ইন ইংলিশ' শীর্ষক গ্রন্থপঞ্জিতে কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী রবীন্দ্ররচনার একটি তালিকা আছে, সেটিও নানাভাবেই খণ্ডিত ও তথ্যগত অসংগতিদোষে ক্লিষ্ট। এই সূত্রে ১৯৮৫-তে মেটুচেন, এন. জে. অ্যান্ড লন্ডন -কর্তৃক প্রকাশিত আটলা বিবলিওগ্রাফি সিরিজের ১৯-সংখ্যক গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর এ বিবলিওগ্রাফি' নামক বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জিটির উল্লেখ করা যায়। প্রভূত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে এটি সংকলন করেছেন শ্রীমতী ক্যাথরিন হেন (Katherine Henn)। এদেশে গ্রন্থটি এখনও ততটা পরিচিত নয়, যদিও প্রশান্তকুমার পাল তাঁর রবিজীবনী-র ষষ্ঠ খণ্ডে এই গ্রন্থপঞ্জির উল্লেখ করেছেন। এতে, অনেকগুলি পুনরাবৃত্তি নিয়ে, ৩৬৮৮টি এন্ট্রি আছে। এর প্রথম ভাগে আছে ১৭১৯টি এন্ট্রিতে রবীন্দ্ররচনার পরিচয়। উনিশটি অংশে বিভক্ত এই পঞ্জির বিন্যাস যথাক্রমে : ১. শিল্প ও শিল্পসমালোচনা (মোট এন্ট্রি ৬০টি) ; ২. আত্মজীবনীমূলক উপাদান (১৯টি) ; ৩. রচনাসংগ্রহ (৪২টি) ; ৪. আলাপ-আলোচনা (২৫টি) ; ৫. নাটক (৬৮টি) ; ৬. শিক্ষা (৯৫টি) ; ৭. ভারত-বিষয়ক (৮১টি) ; ৮. চিঠিপত্র (৭৬টি) ; ৯. সাহিত্যসমালোচনা (৪৩টি) ; ১০. বিবিধ (১০টি) ; ১১. সংগীত (২১টি) ; ১২. উপন্যাস (১৯টি) ; ১৩. দর্শন ও ধর্মবিষয়ক (৯১টি) ; ১৪. কাব্য (৫০২টি) ; ১৫. ছোটোগল্প (২৪৭টি) ; ১৬. সমাজচিন্তা (১৮৬টি) ; ১৭. বিশেষ উপলক্ষ্যের ভাষণ (৪৯টি) ; ১৮. ভ্রমণ (১৪টি) ; ১৯. সম্পাদিত অনূদিত গ্রন্থ যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা আছে (৩১টি)। দ্বিতীয় ভাগের ছ-টি অংশে আছে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক গ্রন্থ বা খণ্ড-রচনার পরিচয়, মোট সংখ্যা— গ্রন্থ ৪০০, প্রবন্ধ-জাতীয় ১২৮৩, অজ্ঞাতনাম রচনা ২০৩, পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ৪২, গবেষণা গ্রন্থাদি ১৯, এবং গ্রন্থপঞ্জি ২১। শ্রীমতী হেন-এর কাজ অনেক তথ্যবিভ্রান্তিতে ভরা এবং পরোক্ষ সূত্র থেকে সংগৃহীত বলে সংশয়জনক। তবুও দূর বিদেশে বসে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা ও রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত রচনার এত বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি সংকলন করে তিনি অবশ্যই এদেশের রবীন্দ্রানুরাগী ও গবেষকের অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবেন।

শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি-অনুবাদ ইতিবৃত্ত' দুখণ্ডে সংকলিত তথ্যসংবলিত গ্রন্থ এই ধারারই নবতর সংযোজন, যদিও প্রাগুক্ত ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জিটি তিনি সম্ভবত দেখেন নি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যমে সংকলিত এই বইদুটি রবীন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখজনক

সংযোজনা। তিনি সুধাময়ী দেবীর সংগ্রহকে পূর্ণতা দিয়েছেন ও ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মুদ্রিত তথ্যের প্রায় সবই পরিবেশন করেছেন। এটি নিছক গ্রন্থপঞ্জি নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনার ও অনুবাদের একটি ধারাবাহিক স্বচ্ছন্দ ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন তিনি। প্রথম খণ্ড সেই ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড তারই পরিশিষ্ট হিসেবে মূল রচনার বর্ণানুক্রমিক সূচি। দ্বিতীয় খণ্ডকে পরিশিষ্টে বলা হলেও বর্তমান আলোচকের মতে, দ্বিতীয় খণ্ডই মূল গবেষণাসমৃদ্ধ সূচি, প্রথম খণ্ডটি যেন তারই উপক্রম। এই প্রথম খণ্ডের শুরুতে আছে ৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী 'গীতাঞ্জলি (Song Offerings) ইতিকথা' ; তার পর ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদের ধারা' ; 'ভাষানুবাদ ও ভাবানুবাদ'-বিষয়ক ৬০ পৃষ্ঠার আলোচনা ; ১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী 'আমার লিখন ফুটে পথধারে' অংশটি রবীন্দ্রনাথের স্ফুলিঙ্গ-লেখনের কিছু কবিতার অনুবাদ-প্রসঙ্গিত ; পরবর্তী ১১ পৃষ্ঠায় আছে 'রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদে পাঠান্তর ও রূপান্তর' ; ১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অনুবাদ' অংশটিও কৌতূহলপ্রদায়ী। এর পর ৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম পরিশিষ্টে, সংশ্লিষ্ট আলোচনার সহায়ক তথ্যাদির বিবরণ এবং পরবর্তী ১৮ পৃষ্ঠায় পূর্ববর্তী গীতাঞ্জলি-সম্পর্কিত-আলোচনায় উল্লিখিত ৭১ জনের ব্যক্তি-পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড (পরিশিষ্ট ২ রূপে চিহ্নিত) হল 'মূল কবিতা গান ও গদ্যরচনার বর্ণানুক্রমিক সূচী'। এর ৩৬৫ পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা ও গানের বর্ণানুক্রমিক সূচির পরে গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধের সূচি ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী। শেষের ১০ পৃষ্ঠায় আছে রবীন্দ্ররচনার অনুবাদক ও কৃতানুবাদের তালিকা। উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের মান্য পদ্ধতি অনুসারে বর্ণানুক্রম সূচি রোমান বর্ণমালায়, উচ্চারণের সংকেতসহ, মুদ্রিত হয়েছে। ফলে অবশ্যই এর ব্যবহারযোগ্যতার ক্ষেত্রটি প্রশস্ততর হয়েছে।

এই গ্রন্থের কোথাও কোনো নতুন কথা বা তথ্য নেই, সে দাবিও শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় করেন নি। তিনি সবিনয়ে লিখেছেন, 'এই গ্রন্থটি রচনায় বিশেষ কোনো পাণ্ডিত্য বা অভিনবত্ব নেই। বিভিন্ন সময় গবেষকদের দাবি মেটাতে আমাদেরও যেটুকু গবেষণা করতে হয়েছে, তাকেই মূলধন ক'রে সাধ্যমত তথ্য পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছি এই ইংরেজি-অনুবাদের ধারা-তে' (পৃ. খ)।

গীতাঞ্জলির অনুবাদের পূর্বে রবীন্দ্ররচনার কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অনুবাদ হয়ে থাকলেও 'রবীন্দ্র-রচনার-অনুবাদের মূল সুরটি সর্ব্বপ্রথম ধরিয়ে দেওয়ায় *Gitanjali (Song-Offerings)*-কে প্রথমেই উপস্থাপন করতে হয়েছে এই গ্রন্থে' (পৃ. খ)। এখানেও অবশ্য নতুন কোনো তথ্যসন্নিবেশ ঘটে নি, পরিচিত বিবরণকেই প্রাসঙ্গিক উদ্‌ধৃতিসহ সহজপাঠ্য করে তোলা হয়েছে। কোনো কোনো প্রসঙ্গ গীতাঞ্জলির রচনা ও অনুবাদের সঙ্গে নিবিড় সখ্যে বদ্ধ বলে মনে নাও হতে পারে, যেমন রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-বিরোধ-বৃত্তান্ত। এই সূত্রে ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'অপ্রকাশিত পত্র', তার উৎস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নেই। সেটি প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়, রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় সেটি মুদ্রিত আছে।

'রবীন্দ্রসাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদের ধারা' অধ্যায়ে কেমন করে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা— কবিতা ছোটোগল্প প্রবন্ধ ইত্যাদি স্বয়ং কবি-কর্তৃক এবং অপরের দ্বারা ভাষান্তরিত হয়ে রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু বিদেশী পাঠকদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তুলেছিল, তারই তথ্যপূর্ণ বিবরণ আছে। এসব তথ্যও আমাদের কাছে মোটামুটি সুজ্ঞাত, নানা সূত্র থেকে সেগুলিকে সংকলন করে একটি অভিপ্রায়ের অধীনে সাজানোর ফলে ইতিহাসটি সমগ্রতা পেয়েছে। হয়তো এতে কিছু প্রয়োজনীয় বিবরণের অভাব ধরা পড়তে পারে, হয়তো দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুল্লেখ ভ্রূকুটিভূষণ সমালোচকের দৃষ্টি এড়াবে না, তবু মীরা দেবী এই অনুবাদ-ইতিহাস সংকলন করে একটি প্রশংসনীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। ভাষানুবাদ ও ভাবানুবাদ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অনূদিত অন্যান্য বাঙালি কবির রচনা— যেমন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এবং কিছু বৈষ্ণব কবির পদ, কবীরের কয়েকটি দোঁহা ও দু-একটি বাউল পদ পাশাপাশি উদ্‌ধৃত করে গ্রন্থটির আকর্ষকতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে পদরত্নাবলী-র নতুন সংস্করণের উদ্‌ধৃতিতে সম্পাদক অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ

রায়ের নাম প্রত্যাশিত ছিল। 'রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদে পাঠান্তর ও রূপান্তর' অংশে গবেষকদের আকৃষ্ট হওয়ার মতো কিছু উপাদান আছে। 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অনুবাদ' অংশেও গবেষকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উদ্‌ধৃতি সযত্নে সংকলিত হয়েছে। অবশ্য দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা পত্র দুবার মুদ্রিত করার প্রয়োজন ছিল না (পৃ. ২৩৩ ও পৃ. ২৬৪)।

প্রভূত পরিশ্রম সত্ত্বেও বইটিতে কিছু স্খলনের চিহ্ন থেকে গেছে। প্রথম খণ্ড থেকেই জানা গেছে যে, ১৯১২-র এপ্রিল সংখ্যা মডার্ন রিভিউ-তে Sparks from Anvil শীর্ষাধীনে কণিকা-র কুটুম্বিতাবিচার, নিরাপদ নীচতা, শত্রুতা গৌরব, অসাধ্য চেষ্টা, একই পথ, প্রভেদ, বলের অপেক্ষা বলী, সত্যের সংযম, কবিতাগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিতে যথাস্থানে একই পথ, অসাধ্য চেষ্টা, বলের অপেক্ষা বলী— এই তিনটির উল্লেখ বাদ পড়ে গেছে। সদর ও অন্দর গল্পের একটি অনুবাদ করেছিলেন শিকাগোবাসী বসন্তকুমার রায়, যেটি 'বিপিনবাবু দ্য ভিকটিম অব জেলাসি' নামে 'পোস্ট' পত্রিকার ১০ ডিসেম্বর ১৯১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই ধরনের কিছু তথ্য প্রশান্তকুমার পালের গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে আছে, কিন্তু মীরা দেবীর গ্রন্থে নেই। ৭৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন 'Little Theatre-এ রাজা নাটকের তর্জমা *The King of the Dark Chamber* অভিনীত হয়েছিল এই সময়ই।' কিন্তু কোন্ সময়ে ? সঠিক সালটি না থাকায় সংশয় থেকেই যায়। তথ্যসূত্রও অনুক্ত। অনেকক্ষেত্রে অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পূর্ণাঙ্গ তথ্যের দাবি জানায়। যেমন : ৮৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, '১৯২০-র জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কেদার দাশগুপ্তের "ইউনিয়ন অব ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট" সভার ব্যবস্থায় কবির পাঁচটি অপ্রকাশিত (ইংরেজি) নাটিকা অভিনীত হয়।' এই সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে বাড়তি কোনো তথ্যই নেই। খবরের উৎস হিসেবে রথীন্দ্রনাথের *On the Edges of Time*-এর উল্লেখ করলেও ভাষাব্যবহারে মনে হয়, পুরো অংশ তিনি সম্ভবত প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী ৩ (তৃতীয় সং ১৩৯৭), পৃ. ৫৬ থেকে সংগ্রহ করেছেন। প্রভাতকুমারের অনুসরণ করতে গিয়ে শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায় লিখে ফেলেছেন, এই সময় সরোজিনী নাইডু বিলাতে ছিলেন— তিনি নাটিকাগুলির ভূমিকা লিখে দেন। কিন্তু রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি'-তে আছে, 'এক-একটি নাটকের আগে সরোজিনী নাইডু নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দুচার কথা বলেন।' প্রভাতকুমারও লিখেছিলেন '...তিনি নাটিকাগুলির ভূমিকা **করিয়া** দেন।'

মীরা দেবীর গ্রন্থে কোনো কোনো উদ্‌ধৃতি ঈষৎ প্রসঙ্গচ্যুত মনে হতে পারে। ৫৭ পৃষ্ঠায় কবির মৃত্যুর পূর্বে অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-কর্তৃক শান্তিনিকেতন সিংহসদনে কবিকে সম্মানজনক ডি-লিট প্রদানের বর্ণনার পরই রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ 'অন দ্য এজেস অব টাইম' থেকে যে উদ্‌ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেটি ১৯১২ সালের জুনে লন্ডনে আসার পর রোটেনস্টাইনের গৃহে কাব্যপাঠের অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা। ট্রেনে তাঁরা কেমন করে গীতাঞ্জলির টাইপ কপি ফেলে এসেছিলেন ও পরে হারানো মালের দপ্তর থেকে সেটি উদ্ধার করা হল সেই কাহিনী কি ডি. লিট প্রদানের বর্ণনার সঙ্গে অপরিহার্য ছিল ? ১০৭ পৃষ্ঠায় বাকে-র 'টোয়েন্টি সিক্‌স্ সঙ্‌স্ অব রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, এর ২১টি কবিতা [? না গান] রবীন্দ্রনাথ-অনূদিত, চারটি বাকে-অনূদিত। আমাদের মনে হয়, সবগুলিই বাকে-র অনুবাদ। প্রথম খণ্ডে ১১০ পৃষ্ঠার তথ্যে জানা যাচ্ছে, ১৯৩৮ সালে সাংহাই থেকে Loties Fang-কর্তৃক অনূদিত প্রকৃতির প্রতিশোধ *Sanyasi* নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে ৬৬৯ পৃষ্ঠায় এই অনুবাদের উল্লেখ নেই। ওই একই পৃষ্ঠায় প্রথম খণ্ডে আছে, '১৯৪০ সাল। *Visva-Bharati Quarterly*-তে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় যদুনাথ সরকার -কৃত "Sankuntala" প্রকাশিত হয়। মূল 'শকুন্তলা"।' কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৭৩ পৃষ্ঠায় 'শকুন্তলা'র যদুনাথ সরকার-কৃত অনুবাদের মডার্ন রিভিউ-তে প্রকাশের তারিখ আছে ফেব্রুয়ারি ১৯১১। মডার্ন রিভিউতে ওই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির নাম 'Sankuntala Its Inner Meaning'। প্রথম খণ্ডে মডার্ন রিভিউতে ফেব্রুয়ারি ১৯১১ সংখ্যায় যে এটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার উল্লেখ নেই। প্রথম খণ্ডে ১৯৭১-এ মেরি এম লাগো -অনূদিত 'নষ্টনীড়' প্রকাশের উল্লেখ আছে ১৩২ পৃষ্ঠায়, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে লাগো-র এই অনুবাদের উল্লেখ নেই। তা

ছাড়া গ্রন্থ দুটির মুদ্রণ-হরফেও কিছু অসংগতি আছে।

কিন্তু এসবই অতি সাধারণ মাপের বিচ্যুতি বা অসতর্কতা। এই দুই খণ্ডে শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে যে বিপুল তথ্য চয়ন করেছেন, তা রবীন্দ্রগবেষণায় একটি নতুন দরজা উন্মোচন করল। তাঁকে অভিনন্দন।

মীরা চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি-অনুবাদ ইতিবৃত্ত (পরিমলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত), প্রথম খণ্ড, ১৯৯৩, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৪। প্রকাশক : শ্রীগুরু প্রকাশন, ২৭/৭৯ কে. এম. নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০০৪০। মূল্য : প্রথম খণ্ড ৮০ টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড ১০০ টাকা।

অরুণকুমার বসু

প্রাচীন সাহিত্যে মেয়েদের কথা

সুকুমারী ভট্টাচার্য -রচিত 'প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য' বইটি প্রকাশিত হয় সাত বছর আগে (১৩৯৪ বঙ্গাব্দ), গত বছরে (১৪০১ বঙ্গাব্দ) তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটি তাঁর নানা উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং নিবন্ধের সংকলন।

এই পুস্তকটির বিষয়বস্তু দুই অংশে বিভক্ত। এক দিকে আলোচিত হয়েছে সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের সাহিত্যগুণ ও অন্য দিকে আলোচিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান। এই শেষোক্ত বিষয়টিকে বলা যেতে পারে এই বইয়ের বিষয়গত যোগসূত্র।

বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে যে সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে শ্রীমতী ভট্টাচার্য সমাজে নারীর স্থান কী ছিল তার বিচার করেছেন। তাঁর বিষয়পরিধি বিশাল। প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় সে যুগের সামাজিক ইতিহাসের উপর কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না তাই শ্রীমতী ভট্টাচার্য সমাজচিত্রের তথ্য আহরণ করেছেন ব্রাহ্মণ্যবাদী লেখকদের গ্রন্থ থেকে।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্য— সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও শ্রৌতসূত্র— খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে রচিত বলে মনে করেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য (পৃ. ২৭)। অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ভিন্নমতও পোষণ করেন। মহামহোপাধ্যায় কানে মনে করেন যে, সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের কাল আনুমানিক, এবং তাঁর মতে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০-এর মধ্যে তা রচিত হয়েছিল (P.V. Kane, *History of Dharmasastra,* vol 2, part 1, second edition, 1974, p. xi).

লেখিকার মতে যাযাবর আর্যরা প্রাগার্য সিন্ধু-সভ্যতার লোকদের পরাজিত ক'রে আর্যাবর্ত অধিকার করে (পৃ. ২৮)। এই সিদ্ধান্ত অনেক পণ্ডিতই গ্রহণ করবেন না, ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের অভাবে। নারীর অবনমিত অবস্থার কারণ হিসেবে শ্রীমতী ভট্টাচার্য বলেছেন যে, উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশ ক্রমশ কমে গিয়েছিল তারই ফলে সমাজে নারীর স্থান নিম্নে চলে যায় (পৃ. ২৮)। তা হলে প্রশ্ন উঠবে : কায়িক পরিশ্রমে সামাজিক উৎপাদনে অংশ নিয়েও কেন শূদ্ররা সমাজের সর্বনিম্নে স্থান পেল আর সামাজিক উৎপাদনে কোনো অংশ না নিয়ে ব্রাহ্মণেরা পেল সর্বোচ্চ স্থান? সামাজিক উৎপাদনের সূত্র দিয়ে নারীর সামাজিক স্থান নির্ণয় করা যায় না। শ্রীমতী ভট্টাচার্য আর-একটি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বৈদিকযুগের শেষে বিদেশীদের আক্রমণের ফলে নারীহরণ ও বর্ণসংকরের আশঙ্কায় নারীকে অন্তঃপুরে নির্বাসিত করে অসূর্যম্পশ্যা করে তোলা হল (পৃ. ২৮)।

অন্তঃপুরে নিবাস ও অসূর্যম্পশ্যা হবার বিলাস একমাত্র পরজীবী ধনীদের স্ত্রী-জনের পক্ষেই সম্ভব। দরিদ্র নারী, যাঁদের উপার্জন করে অন্নসংগ্রহ করতে হত, তাঁদের তো আর অন্তঃপুর ছিল না। তাঁদের পরপুরুষের সামনে আসতেই হত। যেমন : দময়ন্তী আর দ্রৌপদী সৈরন্ধ্রী বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। পরে শ্রীমতী ভট্টাচার্য নিজেই এই যুক্তিকে কুযুক্তি বলে অগ্রাহ্য করেছেন। বলেছেন যে নারীকে বঞ্চিত করার জন্যেই এই কুযুক্তির সৃষ্টি (পৃ. ১২২)।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে, ঋগ্‌বেদ-সংহিতা রচনার প্রথম স্তরে নারীরা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দচারিণী ছিলেন। আজন্ম কুমারী সমাজে নিন্দার পাত্রী নন, নারীর উপপতি বা পুরুষের উপপত্নী ছিল— এটা সামাজিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত। নারীপুরুষের প্রেমের ও মিলনের অসংকোচ উল্লেখ আছে বহু উপমায়। অথর্ববেদেও নারী-স্বাধীনতা কঠোরভাবে খর্ব করা হয় নি। অথর্ববেদে নারীর দ্বিতীয় পতিলাভের ও দশটি পতিরও উল্লেখ আছে (পৃ. ৩০)।

কীথ বলেছেন যে, ভারতে নারী সব ধর্মের কাছেই লাঞ্ছিত হয়েছেন, এবং সর্বাধিক অবমানিত হয়েছেন ব্রাহ্মণগ্রন্থে (A. B. Keith : *Religion and Philosophy of the Vedas,* reprint 1970, p. 475)। শ্রীমতী ভট্টাচার্য শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা (যজুর্বেদের) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, নারীর পূর্বকালের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে (পৃ. ৩১-৩২)।

পূর্বকালে নারী যজ্ঞানুষ্ঠানে আহুতি দিতেন (শতপথ ব্রাহ্মণ ১. ১. ৪. ১৩), নারী যজ্ঞে অংশ নিতেন, এমন-কি, যুদ্ধেও যেতেন (ঋগ্‌বেদ সংহিতা ৮. ৩১. ৫)। পরবর্তীকালে আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ও গৌতম ধর্মসূত্রের বিধানে নারীর পক্ষে হোম নিষিদ্ধ হল, কারণ স্ত্রী ধর্মে অস্বতন্ত্রা (পৃ. ৩১)। নারী আবদ্ধ হলেন গৃহকর্মে ; রুদ্ধ হল তাঁর শিক্ষার পথ ; স্ত্রী হিসেবে পুত্রসন্তানের জননী হওয়াই তাঁর প্রধান ও পবিত্র কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হয়ে গেল।

প্রাচীন ভারতে গণিকাবৃত্তির সূত্রপাত ও বিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করেছেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য 'প্রাচীন ভারতে গণিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে (পৃ. ৫৫-৭৪)। তথ্য আহরণ করেছেন তিনি বেদসংহিতা, পালি ত্রিপিটক, অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, কামশাস্ত্র ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে। গণিকাবৃত্তির উদ্ভব ভারতে কখন বা কী ভাবে হয়েছিল তার কোনো তথ্য পাই না। তবে এইসব গ্রন্থে গণিকার উল্লেখ আছে বিভিন্ন নামে।

গণিকাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদ ছিল। সমাজ গণিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, ধর্মশাস্ত্রে নানা বিধি প্রণয়ন ক'রে। গণিকাকে অত্যাচার করলে ধর্মশাস্ত্র শাস্তির বিধান দিয়েছে।

গণিকারা অর্থোপার্জন করত। বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে এক গণিকা একরাতে ১০০০ কার্ষাপণ নিত। শ্রীমতী ভট্টাচার্য বলেছেন যে, মহাভারতে শিশু, দাস ও গণিকার সম্পত্তিতে অধিকার নেই— এ কথা বার বার বলা আছে (পৃ. ৬০)। এর সমর্থনে যে তিনটি উৎসনির্দেশ দিয়েছেন, বঙ্গবাসী সংস্করণ থেকে, তাতে গণিকার একবারও উল্লেখ নেই। তিন বার মহাভারতে কারা সম্পত্তিতে অধিকার পাবে না বলা আছে— এই তিন ব্যক্তি অধন : স্ত্রী, দাস এবং পুত্র। পুনা সংস্করণে এক জায়গায় দাসের স্থানে শিষ্য আছে (পুনা, আদি. ৭৭. ২২ ; সভা. ৬৩. ১ এবং উদ্যোগ. ৩৩. ৬৮। বঙ্গবাসী, আদি. ৮২.২২ ; সভা. ৭১.১ এবং উদ্যোগ. ৩৩.৬৮। মুদ্রণদোষে এই উৎসনির্দেশও ভুল ছাপা হয়েছে)। মহাভারতে বহুবার গণিকার উল্লেখ আছে। কখনো তারা যুদ্ধযাত্রায় রাজসৈন্যদলের সঙ্গে চলেছে (পুনা, উদ্যোগ. ৮৪.১৫ ; ১৯৬.১৯) ; কখনো শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের আনন্দ বিধান করছে গণিকা, বারা ও নটনর্তকেরা (পুনা, ভীষ্ম. ১১৬.৪)। কিন্তু গান্ধারী গর্ভবতী হলে 'ধৃতরাষ্ট্রের গণিকার প্রয়োজন হয়েছিল' বলে লেখিকা যে তথ্য দিয়েছেন (পৃ. ৬০) মূল মহাভারতে তা নেই। মহাভারতে আছে যে, গান্ধারী গর্ভবতী হলে ধৃতরাষ্ট্র এক বৈশ্যা নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করেছিলেন এবং যে পুত্র জন্মেছিল সে মহাভারতে যুযুৎসু নামে বিখ্যাত (পুনা, আদি. ১০৭. ৩৫-৩৬ ; বঙ্গবাসী, আদি. ১১৫. ৪২-৪৩)। এইভাবে বিদুরের মা ছিলেন বৈশ্যা দাসী (পুনা, আদি. ১০০. ২৪-২৬)। ভুজিষ্যা বা সৈরন্ধ্রী, গৃহকর্মে নিযুক্তা দাসী, অনেক সময়ে পুরুষের লালসার শিকার হতেন, যেমন : দ্রৌপদী হয়েছিলেন (পুনা, সভা. ১৫)। কিন্তু তাঁরা গণিকা নন।

মহাভারতে বহুবার পারিতোষিক বা যৌতুক হিসেবে সুন্দরী কন্যাদানের উল্লেখ আছে। রাজা ব্রাহ্মণকে

নারী উপহার না দিলে সেই রাজা রাজকলি (রাজাদের মধ্যে কলি) এই দুর্নাম লাভ করবেন (পুনা, শান্তি. ১২.২৭-২৮)। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের আশঙ্কা সম্ভবত অমূলক নয় যে, এইসব নারী পরে হয়তো দাসী বা গণিকায় পরিণত হত (পৃ. ৬৮)।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে সংস্কৃত গ্রন্থে গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে দ্বৈধভাব বিদ্যমান। একটি মনোভাব এইরকম : পুরুষের উপভোগের জন্য, অশুভ হলেও, গণিকার প্রয়োজন। আর এর বিপরীত ভাব হল : গণিকাবৃত্তি পুরোপুরি অশুভ ও পরিহার্য (পৃ. ৭১)।

'নারীর স্থান— রামায়ণে ও মহাভারতে' এই প্রবন্ধে দুই মহাকাব্যে নারীর সামাজিক অবস্থানের তুলনামূলক বিচার করেছেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য (পৃ. ১০০-২৪)।

মহাকাব্যের মূল কাহিনী ঘিরে বহু শতাব্দী ধরে এক বিশাল প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযোজিত হয়েছে। ফলে মহাকাব্যে পুরাতন ও পরবর্তী সমাজের মূল্যবোধও প্রতিফলিত হয়েছে। লেখিকা লক্ষ করেছেন যে, প্রাচীনতর সমাজে নারী অনেক বেশি স্বাধীন ছিলেন, নিজের স্বামীর বিরুদ্ধেও নিজের মত প্রকাশ করতে পারতেন। যৌনমিলনে, নিজের সঙ্গী নির্বাচনে, যৌনসঙ্গ প্রার্থনায় নারীর অবাধ অধিকার মহাভারতে স্বীকৃত। নারীর মদ্যপান নিষিদ্ধ নয়— দ্রৌপদী ও সুভদ্রা মদ্যপানে বিহ্বল হয়ে (মদোৎকটা) অনুচরীদের মহামূল্য বস্ত্র ও অলংকার বিতরণ করছেন এমন দৃশ্য মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে (পুনা, আদি. ২১৪. ২২-২৩)। নারীর বহুবিবাহ কোনো একসময়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু মহাভারত রচনাকালে নারীর বহুভর্তৃতা নিন্দনীয় ও অধর্ম বলে মনে করা হত। দ্রৌপদীর পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে বিবাহকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ বাদানুবাদ আর শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীর বিবাহের সমর্থনে ব্যাসের দুর্বল কৈফিয়ত প্রমাণ করে নারীর বহুবিবাহের সামাজিক সমর্থন নেই।[৮] দ্রুপদ প্রতিবাদ করে বলছেন যে, এক পুরুষের বহু মহিষী বিধিসম্মত, কিন্তু এক নারীর বহু পুরুষ কখনও বিহিত নয়। এটা অধর্ম ও লোক- এবং বেদ -বিরুদ্ধ। পূর্বের কোনো মহান ব্যক্তি এই রকম আচার (ধর্ম) পালন করেন নি। আর এটা সনাতন আচরণ (ধর্ম) হলেও সুপ্রতিষ্ঠ নয় বলেই পালনীয় নয় (পুনা, আদি. ১৮৭. ২৬ : ১৮৮. ৭-৮)।

কিন্তু শ্রীমতী ভট্টাচার্য বলেছেন যে, কৌরবদের মধ্যে নারীর বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং একটি উৎসনির্দেশও দিয়েছেন (পৃ. ১১২ : বঙ্গবাসী, আদি. ১২২. ৭)। আসলে মহাভারতের এই শ্লোকটি নারীর বহুবিবাহ সম্বন্ধেই নয়। প্রাচীনকালে নিজের স্বামীকে উৎক্রমণ করে একাধিক পুরুষের সঙ্গে নারীর সহবাসের যে প্রথা চলিত ছিল সে বিষয়ে পাণ্ডু কুন্তীকে এই শ্লোকে জানাচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, আজও উত্তর কুরুদেশে এই সনাতন প্রথা (ধর্ম) বিদ্যমান এবং এটি স্ত্রীলোকদের প্রীতিদায়ক (উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষ্বদ্যাপি বর্ততে। স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ (পুনা, আদি. ১১৩. ৭)। নারীর বহুবিবাহ সম্পর্কে এই বক্তব্য প্রাসঙ্গিক নয়, স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে নারীর যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে এটা প্রযোজ্য। মহাভারতের এই অধ্যায়ে বলা আছে যে পুরাকালে সকল বর্ণের নারী ছিলেন অবাধ (অনাবৃতা), তাঁরা যৌনসংগমে গাভীর মতো আচরণ করতেন— এটাই ছিল সনাতন বিধি বা ধর্ম (পুনা, আদি. ১১৩)।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য বলেছেন যে ক্রমশই নারীর স্থান মহাভারতে অধোগামী হয়েছে। নারীর অবনমন রামায়ণে অত্যন্ত প্রকট (পৃ. ১১০)। মহাভারত সম্বন্ধে লেখিকা বলেছেন যে, এখানে সমাজের যে-চিত্র পাই তার পরিসর ব্যাপকতর। মহাভারত রচনাকালের ব্যাপ্তি রামায়ণের অন্তত দ্বিগুণ। তাই মহাভারতে আদিমতম কালের চিত্র পাই যা রামায়ণের চেয়ে প্রাচীন (পৃ. ১১০-১১১)।

এক দিকে নারীর স্বাধীন জীবনের চিত্র ও অন্য দিকে পুরুষের বশ্যতায় নারীর অবনমিত জীবনের চিত্র— এই পরস্পর-বিরোধী অবস্থান মহাভারতের কাহিনী থেকে কেন অপসৃত হয় নি তার কারণ নির্দেশ করেছেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য। মহাভারতের মূল কাহিনী চারণ কবিদের আবৃত্তিতে লোকমুখে প্রচারের ফলে জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্পূর্ণ বর্জন বা পরিবর্তন করলে সাধারণ শ্রোতারা গ্রহণ করবে না এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ সংযোজকেরা আমূল পরিবর্তন থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। ইচ্ছার অভাবের জন্য নয় (পৃ. ১২২)।

এই ব্যাখ্যা অতিসরল, কিন্তু কতটা গ্রহণযোগ্য সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। মহাভারত-রচনার ইতিহাস অজ্ঞাত। মহাভারতের পাঠক মাত্রেই জানেন যে মহাভারত-রচনার একটা সুপরিকল্পিত ও স্থির সম্পাদনা-নীতি কোনোকালে ছিল না। মহাভারতে দর্শন, ধর্মনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রশাসন ও অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী সংযোজনের অবাধ স্বাধীনতা ছিল যে-কোনো কথকের বা লেখকের। শত শত বছর ধরে তাই চলেছে। মহাভারত-রচনায় একটা শিথিলভাব পরিলক্ষিত হয় ; দুই পরিপন্থী বক্তব্য পাশাপাশি থাকতে পারে— স্ববিরোধী চিন্তা, পুনরুক্তিদোষ মহাভারতের বৈশিষ্ট্য। যার ফলে দেখা যায় যে, মহাভারতে স্পষ্টত প্রক্ষিপ্ত অংশেও এমন বক্তব্য স্থান পেয়েছে যা ব্রাহ্মণ্য ধর্মবোধের বিরোধী। প্রাচীন সমাজচিত্র অবলুপ্ত করলে মহাভারত জনপ্রিয়তা হারাবে এমন দুশ্চিন্তা সংযোজকদের ছিল বলে মনে করা সম্ভব নয়।

প্রক্ষিপ্ত অংশেও দুরকম মত পাওয়া যায়। বর্ণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের সুবিদিত তত্ত্ব এই যে, বর্ণ জন্মের দ্বারা নির্ধারিত হয় (জননাদ্ বিপ্রঃ : পুনা, শান্তি. ১৬৫. ৭)। আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ (পুনা, ভীষ্ম. ১১৬.৩৩)। কিন্তু আবার সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমতও পাই। নহুষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন যে ব্রাহ্মণ সে-ই যার সত্য, দান, ক্ষমা, অহিংসা, সংযম প্রভৃতি গুণ আছে। এইসব গুণ যদি শূদ্রের থাকে, ব্রাহ্মণের না থাকে তা হলে সেই শূদ্র শূদ্র নয় এবং সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণও নয়। আরও বলা আছে যে, জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কারণ সব বর্ণই মিশ্রিত (সংকর) ; ভাষা, যৌনসংগম, জন্ম ও মৃত্যু সব মানুষের ক্ষেত্রেই একরকম (পুনা, আরণ্যক. ১৭৭. ১৬, ২০, ২৬, ২৭)। সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত অংশে এই একই উক্তি অপরিবর্তিত বা খানিকটা পরিবর্তন করে আবার বলা হয়েছে (পুনা, শান্তি. ১৮২. ৮ ; অনুশাসন. ১৩১. ৪৯)। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, এ বক্তব্য বৌদ্ধমতের যেন অবিকল প্রতিধ্বনি (দ্রষ্টব্য অম্বঠ্ঠ সুত্ত : Rhys Davids, *Dialogues of Buddha,* reprint 1977, vol. 1, pp. 114-15 ; সিহানন্দ সুত্ত : Rhys Davids, pp. 232-33)। এটাই প্রতিভাত হয় যে মহাভারতে বিভিন্ন মতাদর্শ স্থান পেয়েছে নির্বিচারে। তবে তার অনেকগুলি লুপ্তও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে, যা আজ নির্ণয় করা অসম্ভব।

নারীদের স্থান সম্বন্ধে আর-একটা দিক আছে যার উপর শ্রীমতী ভট্টাচার্য গুরুত্ব দেন নি। মহাভারতে একদিকে নারীদের যেমন তুচ্ছ ও অবজ্ঞা করা হয়েছে, অন্য দিকে তেমন একটা উজ্জ্বল মুক্তমনেরও পরিচয় আছে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তারও আগে ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এক প্রবল ঝড় উঠেছিল। বহু সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়েছিল— যার মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় সুপিরিচিত— তারা যজ্ঞসর্বস্ব চিন্তা ও নিষ্প্রাণ যজ্ঞের শৃঙ্খল ছিন্ন করে তপস্যার পথ অবলম্বন করেছিল। এই মুক্তিকামীদের মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে বহু নারীও যোগ দেন। বলা যেতে পারে, এটাই স্বল্পস্থায়ী হলেও, ভারতবর্ষের প্রথম নারীমুক্তির যুগ। তপস্বিনী নারীরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করতেন, সভায় বসে পুরুষদের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্কে যোগ দিতেন।

কখনো শ্রদ্ধাভরে, কখনো বা অবজ্ঞা সহকারে এইসব তপস্বিনীদের উল্লেখ আছে মহাভারতে। প্রবল আন্দোলনের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও বানপ্রস্থ আশ্রমব্যবস্থার অঙ্গরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। মহাভারতের প্রধান চরিত্রের মধ্যে সত্যবতী ও তাঁর পুত্রবধূরা, গান্ধারী, কুন্তী সকলে সংসারে বীতরাগ হয়ে অরণ্যে প্রস্থান করেছিলেন (পুনা, আদি. ১১৯. ১১ ; আশ্রমবাসিক. ২১. ৩)। শাণ্ডিল্য ঋষির কুমারী কন্যা তপস্যায় নিযুক্ত হয়ে স্বর্গলাভ করেন (পুনা, শল্য. ৫৩. ৬-৭)। আর শাণ্ডিলী নামে এক তাপসী গরুড়কে ঔদ্ধত্যের জন্য কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। পরে গরুড়কে ক্ষমা করে সাবধান করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে কোনো নারী নিন্দার যোগ্য হলেও তিনি যেন কখনো নিন্দা না করেন (পুনা, উদ্যোগ. ১১২. ৩, ৮, ১৬)। নারীর কাছে দেবপ্রতিম গরুড়ের শাস্তি— এটা এক অসাধারণ কাহিনী। আবার সেইসঙ্গে তাপসীকে ছোটো করার চেষ্টাও আছে। কুণিগার্গ্যের অবিবাহিত কন্যা তপস্যায় জীবন কাটিয়ে বার্ধক্যে শুনলেন যে, বিবাহ না করলে তিনি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারেন না। বাধ্য হয়ে সেই বৃদ্ধা তাপসী একরাতের জন্য চুক্তি করে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে সহবাস করলেন

এবং পরের দিন প্রাণত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন (পুনা, শল্য. ৫১. ৯, ১৬)। এই কাহিনীর উদ্দেশ্য স্পষ্ট : বিবাহ ছাড়া নারীর মুক্তির কোনো পথ নেই, তপস্যা নিষ্ফল। আর-একজন তাপসীকে দিয়ে বলানো হচ্ছে যে, তিনি তপস্যার ফলে নয়, স্বামীকে অক্লান্ত ও একনিষ্ঠভাবে সেবা করে স্বর্গলাভ করেছেন (পুনা, অনুশাসন. ১২৪. ৮-২৪)।

কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজকন্যা সুলভার কাহিনী তপস্বিনী নারীর কৃতিত্ব হিসাবে গণ্য হবে। তিনি ভিক্ষুকী। একা মিথিলা রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজা জনকের সঙ্গে মোক্ষধর্ম নিয়ে বিচার করছেন, উদ্দেশ্য : জনকের মোক্ষশাস্ত্র বিষয়ে কতটা জ্ঞান তা পরীক্ষা করা। এই দীর্ঘ বাদানুবাদ শান্তিপর্বের একটি অধ্যায় জুড়ে আছে (পুনা, শান্তি. ৩০৮)। এই পর্বটি সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু তা হলেও এই অনন্যা নারীর বুদ্ধি ও বিচারের কাহিনী বাদ পড়ে নি।

'স্বৈরিণী' শব্দের সুপরিচিত অর্থ ব্যভিচারিণী। কিন্তু মহাভারতে পাই যে, বারাণসীতে মৈত্রেয় নামে এক ঋষি স্বৈরিণীকুলে[২] বাস করছেন আর ব্যাস সেখানে উপস্থিত হয়ে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু হল : বেদ অসত্য কিনা (পুনা, অনুশাসন. ১২১. ৩, ৪, ৯)। মহাভারতে বলা নেই : বারাণসীর এই স্বৈরিণীরা কারা ? তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এঁরা ব্যভিচারিণী নারী নন। তা হলে মৈত্রেয় সেখানে বাস করতেন না, আর ব্যাসও কখনো সেখানে পদার্পণ করতেন না। খুব সম্ভব এই স্বৈরিণীরা সেই মুক্তমনা নারীর দল যাঁরা বেদবিরোধী ছিলেন।

আবার অন্য দিকে ছিলেন পুরুষ স্বৈরীরা। তাঁদের ধর্ম কী ? মহাভারতে বলা হচ্ছে যে, এই স্বৈরীরা সকলে তাপস, কিন্তু বিবাহিত। এঁরা মস্তক মুণ্ডন করেন, কাষায়বস্ত্র ধারণ করেন এবং রাত্রে স্ত্রী সহবাস করেন (পুনা, অনুশাসন. ১৩০. ২১-২২)।

সংস্কৃত গ্রন্থের পর্যালোচনায় সাধারণত বেদ, উপনিষদ, মহাভারত বা রামায়ণের নৈতিকতা, অধ্যাত্মবাদ প্রভৃতি তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দিয়ে মানুষের বাস্তব জীবনের দিকগুলি অবহেলা করা হয়। শ্রীমতী ভট্টাচার্য এই দিকগুলি অতি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর আলোচনায় সংস্কৃত গ্রন্থগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এইখানেই বইটির বিশেষত্ব।

মহাভারত ও রামায়ণের প্রামাণিক (ক্রিটিক্যাল) সংস্করণ অনেক বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে। এবং এ-বিষয়ে আলোচনায় সেই সংস্করণ ব্যবহার করাই কাম্য। শ্রীমতী ভট্টাচার্য তা করেন নি। আরও অসুবিধা হল : এই বইতে উৎসনির্দেশে এমন অনেক অবাঞ্ছিত মুদ্রণপ্রমাদ আছে যার ফলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক উৎসসন্ধানে ব্যর্থ হবেন। কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে।

পৃ. ৩৫ : "উষা যাতি স্বসরস্য পত্নী" ঋগ্‌বেদ সংহিতা ১. ১১৫. ২ এর স্থানে হবে ৩. ৬১. ৪। ১.১১৫.২ সূক্তে পাই : "সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ"। পৃ. ৩৮ : প্রাচীন ভারতীয় সমাজে পুরুষের কাছে নারীর সামাজিক মর্যাদা এতই তুচ্ছ ছিল যে, ঋগ্‌বেদ থেকে মহাভারতের যুগ পর্যন্ত নারীকে জুয়ার পণ করা হত। এই বক্তব্যের সমর্থনে শ্রীমতী ভট্টাচার্য ঋগ্‌বেদ সংহিতার বিখ্যাত অক্ষসূক্তের একটি ঋক্ (১০.৩৪.৪) উল্লেখ করেছেন। মহাভারতে দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা সুবিদিত (পুনা, সভা. ৫৮.৩৭)। কিন্তু ঋগ্‌বেদ সংহিতায় নারীকে জুয়ার পণ করা হয়েছে এমন উল্লেখ কোথাও নেই। অক্ষসূক্তের উল্লিখিত ঋকে (১০.৩৪.৪) দ্যূতকারের স্ত্রীর অসহায়তার কথা আছে। ওই ঋকে আছে যে, দ্যূতকারের স্ত্রীকে অন্য লোকেরা আলিঙ্গন করে ('অন্যে জায়াং পরি মৃশন্ত্যস্য')। অক্ষসূক্তেই আছে যে, দ্যূতকারের স্ত্রী পতিগতপ্রাণা হয়ে স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা বিনা প্রতিবাদে সহ্য করেন নি। অক্ষসূক্তেই (১০.৩৪.৩) বলা হয়েছে যে, শাশুড়ি দ্যূতকারকে ঘৃণা করেন এবং স্ত্রী দ্যূতকারকে গৃহ থেকে বিতাড়ন করেন ('দ্বেষ্টি শ্বশ্রূরপ জায়া রুণদ্ধি')। ঋগ্‌বেদে বর্ণিত সমাজে নারী পরবর্তী যুগের মতো ততটা নির্বিবাদী ছিলেন না। পৃ. ৬৩ : মহাভারতের বঙ্গবাসী সংস্করণে আশ্বমেধিক. ৮০. ৩২, দ্রোণ. ৬০. ১, ২, দ্রোণ. ৬৫. ৬ প্রাসঙ্গিক শ্লোক নেই। পৃ. ১১১ : বঙ্গবাসী,

উদ্যোগ. ১২২. ৯ দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারীর ভর্ৎসনা নেই ; আছে বঙ্গবাসী, উদ্যোগ. ১২৯. ১১-১৫ ও পুনা, উদ্যোগ. ১২৭. ১১-১৫। পৃ. ১১২ : বঙ্গবাসী, উদ্যোগ. ১০৯. ১৯এ বর্ণিত শিবা নামে নারী তপস্বিনী নন, তিনি ব্রাহ্মণী বেদ অধ্যয়ন করে স্বর্গলাভ করেন। পুনা সংস্করণে (উদ্যোগ. ১০৭. ১৮) ভিন্ন পাঠে পাই— শিব নামক বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা বেদ ও উপাঙ্গ অধ্যয়ন করে যমালয়ে যান। পৃ. ১৭৭ : "অর্জুনস্য ইমে বাণা নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ। কৃন্তন্তি মম গাত্রাণি মাঘমাং সেগবা ইব" বঙ্গবাসী, শান্তি. ১১৯. ৬৫ -এর পরিবর্তে হবে বঙ্গবাসী, ভীষ্ম. ১১৯. ৬৫-৬৬। পুনা, ভীষ্ম. ১১৪. ৬০এ পাঠ একটু ভিন্ন '... মাঘমাসে গবামিব'। এই উপমানটি বিপর্যস্ত করে কোনো-এক নারী-বিদ্বেষী প্রয়োগ করেছেন স্ত্রী নিন্দায়। "গৃহস্নেহাববদ্ধানাং নরাণামল্পমেধসাম্। কুস্ত্রী খাদন্তি মাংসানি মাঘমা সেগবামিব" (পুনা, শান্তি. ১৩৭. ৮৫)— অর্থাৎ কর্কটী, (মাঘমা) যেমন নিজের ছানাকে হত্যা করে কুস্ত্রী তেমন গৃহস্নেহপরবশ নির্বোধ পুরুষদের মাংস ভক্ষণ করে।

টীকা

১. মহাভারতের রচয়িতারা জানতেন বহুভর্তৃতার সমর্থন ব্রাহ্মণ্যবাদে নেই। সমগ্র নারীসম্প্রদায়কে ব্যঙ্গোক্তি করে কর্ণ বলেছেন যে, একটি নারীর বহুভর্তৃতা সব নারীর কাছে কাম্য (পুনা, আদি. ১৯৪.৮) এবং পরে বলেছেন যে, দ্রৌপদী বহুপুরুষের ভোগ্যা তাই তিনি গণিকা (বন্ধকী) বলে পরিচিত হবেন (পুনা, সভা. ৬১. ৩৫)। অথচ এই প্রাচীন ঘটনা বর্জন করাও সম্ভব নয়, এইরকম একটা উভয়সংকটে পড়ে শ্রোতা আর পাঠকদের কাছে দ্রৌপদীর বিবাহের অলৌকিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হল। ব্যাসকে দিয়ে দুটি দৈবকাহিনী বলানো হল যার প্রতিপাদ্য : দ্রৌপদীর পঞ্চপতি দৈববিধানে পূর্বজন্মেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম উপাখ্যানে আছে যে, ইন্দ্র এবং আরও চারজন পূর্বকালের ইন্দ্র (পূর্বেন্দ্র) এক পরম দেবতার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে রুষ্ট দেবতার অভিশাপে মর্ত্যে মানুষ হয়ে জন্মালেন। দেবতার ইচ্ছায় শ্রী (লক্ষ্মী) হলেন তাঁদের স্ত্রী। পঞ্চেন্দ্র হলেন মর্ত্যের পঞ্চপাণ্ডব আর শ্রী দ্রৌপদী।

একটি দৈব কাহিনীই যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হবার কথা, কিন্তু মহাভারতের রচয়িতারা হয়তো মনে করলেন অধিকন্তু ন দোষায়। সেইজন্য দ্বিতীয় কাহিনী সংযোজিত হল যা প্রথমটির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। দ্বিতীয় কাহিনীতে আছে যে, স্বামীলাভের আশায় কোনো এক ঋষিকন্যা কঠোর তপস্যায় শিবকে সন্তুষ্ট করলেন। কন্যাটি শিবের কাছে বার বার প্রার্থনা করলেন যেন তাঁর সর্বগুণসম্পন্ন স্বামী হয়। কন্যাটি পঞ্চপতির বর পেলেন, কারণ তিনি নাকি পাঁচবার (যা কাহিনীতে নেই) প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ঋষিকন্যা পরের জন্মে দৈবাদেশে পঞ্চপতি পেলেন। এই ঋষিকন্যাই দ্রৌপদী (পুনা, আদি. ১৮৯)। বলা বাহুল্য একই অধ্যায়ে একই উদ্দেশ্যে দুটি কাহিনীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, মহাভারতের রচয়িতারা কতটা বিব্রত হয়েছিলেন দ্রৌপদীর বহুভর্তৃতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। ব্রাহ্মণ্য মতবাদে বিবাহিতা নারীর পুনর্বিবাহ অসিদ্ধ। মহাভারত (পুনা, আরণ্যক. ২৭৮. ২৫) এবং মনুসংহিতা (৯. ৪৭) একমত যে, একবারই কন্যাকে বিবাহে দান করা যায় (সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে)। অথচ দ্রৌপদীর বিবাহ পরম্পর পাঁচদিন পাঁচজনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। তা হলে দ্রৌপদী কুমারী নন। এই ঘোরতর সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এই বলে যে, ব্যাসের অলৌকিক মহিমায় দ্রৌপদী প্রত্যেক দিন বিবাহের পরে কুমারী থেকে গেলেন (বভূব কন্যৈব গতে গতে'হনি) পুনা, আদি. ১৯০. ১৪।

মহাভারতে বর্ণিত পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর বহুভর্তৃতা একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। গ্রীয়ারসন মনে করেন যে, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী মতবাদের সংঘাত চলেছিল ভারতবর্ষে। পাঞ্চাল দেশবাসী ক্ষত্রিয়রা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী আর বহুভর্তৃতা সেই বিরোধেরই প্রমাণ (George A. Grierson, 'Note on Mr. Keith's note on the battle between the Pandavas and the Kauravas', *Journal of the Royal Asiatic*

Society of Great Britain & Ireland, 1908, pp. 837-44.)।

২. 'স্বৈরিণীকুলে' (পুনা, অনুশাসন. ১২১. ৩) এই শব্দটির ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ (আনুমানিক ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ) বলছেন :
স্বম্ ঈরয়তি ধর্মায় প্রেরয়তি স্বৈরিণী মুনিশ্রেণী তস্যাঃ কুলে গৃহে। অর্থাৎ নিজেকে ধর্মের উদ্দেশ্যে চালনা করেন, প্রেরণ করেন স্বৈরিণী-এক শ্রেণীর মুনি। তাঁর কুলে মানে গৃহে।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০১। মূল্য ৪০ টাকা।

চিত্রভানু সেন

মুহূর্তের বোধ, বোধের মুহূর্ত

আকর্ষক ব্যক্তিত্ব। অসমাপ্ত কাজ। ঠাট্টা করে বলতেন হিতেশরঞ্জন, 'বাংলার সবচেয়ে তরুণ গান্ধীবাদী হলাম আমি'। বন্ধুরা প্রায় সবাই ভিন্নমতাবলম্বী। তাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েই দানা বাঁধত তাঁর গবেষণা। চিন্তার পরিণত রূপের পরিচয় এই বইয়ে নেই ; এখন পাওয়া সম্ভবও নয়। কারণ মানুষটা হঠাৎ চলে গেছেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নানা টুকরো লেখা এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন তাঁর গবেষণার সঙ্গী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এই প্রবন্ধসংকলন থেকে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসচর্চার একটি বিশিষ্ট চিন্তার অবয়ব সহজে ধরা পড়ে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা সংহত ভূমিকার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি যথার্থ : 'জাতীয়তাবাদ এবং গ্রামাঞ্চলের গণ আন্দোলন সম্পর্কে হিতেশবাবুর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশিষ্ট। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে ইতিহাসরচনার যে বিভিন্ন ধারা-উপধারা এখন প্রচলিত আছে, তার কোনোটির সঙ্গেই তাঁর লেখা পুরোপুরি খাপ খায় না।' এই মূল্যায়নের সঙ্গে একমত না হওয়া শক্ত। এই কথাও বোধহয় বলা যেতে পারে চর্চার বৈশিষ্ট্যে তিনি এখনো একক ও নিঃসঙ্গ। না, হয়তো সেই অর্থে আর নিছক তথ্য-সংগ্রহ বা অনুসন্ধানের সূত্র-সংকলনে তিনি আজকে আর অভিনব নন। তাঁর নির্দেশিত পথে বেশ-কিছু গবেষক সাধ্যমতো এগিয়েছেন। সত্তরের দশকে মহাফেজখানার সীমানা ছাড়িয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে তিনি একক প্রচেষ্টায় সহস্রাধিক রাজনৈতিক কর্মীর সাক্ষাৎকার, রোজনামচা, প্রচারপুস্তিকা বা দিনলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। এইসব সূত্রের গুরুত্ব গত দুই দশকে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসচর্চার অঙ্গরূপে স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে নেহরু মিউজিয়াম, অজয় ভবন বা নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের সংগ্রহশালার কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতায় হিতেশবাবুর এই রচনাগুলো আজও অনন্য। আমাদের বিচার সেই অনন্যতার বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রত্যয়ের উপস্থাপন

'স্বরাজ' বা 'স্বয়ং রাজমান'-এর প্রত্যয় গ্রামাঞ্চলের গণ-আন্দোলনে কীভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল, এই বিষয়টি তাঁর সব-কটা প্রবন্ধের উপজীব্য। চৈতন্যের বাস্তব রূপায়ণ গণ-আন্দোলনে কী প্রকারে সাধিত হয়, সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে চৈতন্যের প্রতিসরণ কোন্ কোন্ স্তরে হয়, কোন্‌খানে মোচড় নেয়, উত্তরণের সম্ভাবনা কোথায় নষ্ট হয়, এইসব নির্দিষ্ট প্রশ্ন দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের ইতিবৃত্তের

মধ্যে খুঁজেছেন হিতেশরঞ্জন। মেদিনীপুর আরামবাগ বাঁকুড়া মহিষবাথান প্রভৃতি এলাকায় স্থানীয় আন্দোলনের নানা স্তরভিত্তিক ইতিবৃত্তে 'স্বরাজ'-এর ধারণার আবৃত্তি লক্ষ করাটা তাঁর উদ্দেশ্য।

গান্ধীবাদীদের ইতিহাসচর্চা নতুন কিছু নয়। পট্টভি সীতারামিয়া বা তেন্ডুলকরের রচনাবলির কথা তো সবাই জানেন। কিন্তু সেখানে আছে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সংগঠনের ইতিহাস, তাঁর আদর্শ ও জীবনচরিতের কথা। হিতেশবাবুর ঝোঁক শুরু থেকে পৃথক। গান্ধীর মতে 'স্বরাজ'-এর অর্থ কী ; আন্দোলনে অহিংসার স্থান কোথায়, 'অভয়' কাকে বলে, ইত্যাদি প্রসঙ্গে তিনি সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করেছেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, আত্মমর্যাদা ও আত্মমুক্তির সাধনা, স্বনির্ভরশীল ও আত্মপরায়ণ গ্রামসমাজ গড়ে তোলার গান্ধীবাদী আদর্শ ধরা পড়াটা হচ্ছে আন্দোলনগুলির শ্রেষ্ঠ ক্ষণ বা মুহূর্ত। এই বোধের বাস্তবায়নই আন্দোলন। 'স্বরাজ'-এর বর্গে, তার ক্ষণিক সাফল্যে বা আপাত-ব্যর্থতায় তিনি নিরূপণ করেছেন গণ-আন্দোলনের চরিত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নিহিত আছে হিতেশবাবুর রচনার অনন্যতা। ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত রূপ হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই হিতেশবাবুর জেহাদ। 'রাষ্ট্রশক্তি' ব্যতিরেকে কীভাবে স্বরাজের সাধনা গ্রামাঞ্চলের নানা আন্দোলনে হয়েছিল, তাকে খুঁজে বের করার দিকেই তাঁর দুর্বার আকর্ষণ। ফলে শীল, গ্যালাঘার, বেইলি বা রজতকান্ত রায়ই বলুন বা সর্বেপল্লী গোপাল, বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী, সুমিত সরকারই বলুন, এঁদের রচনার আদলে হিতেশবাবুর লেখাকে ধরা যাবে না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাগুক্ত ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলরূপে আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রকে মেনে নিয়েছেন। সেই প্রক্রিয়া কীভাবে হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়ার কাছে কীই বা প্রত্যাশা ছিল, কতদূর তা চরিতার্থ হয়েছে, এই নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। কিন্তু 'tryst with destiny'-মার্কা বক্তৃতা বা গান্ধীজীর অনশন দিয়ে শেষ হয়েছে বেশিরভাগ রচনা। আন্দোলনের পরিণতি রাষ্ট্র-নির্মাণে, তজ্জনিত উল্লাসে বা বিষাদে। কিন্তু হিতেশবাবুর রচনায় এই কাঠামোটা অনুসৃত হয় নি। কারণ 'ব্রিটিশ শাসনের অবসানে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি সেটা গান্ধীজীর উদ্দিষ্ট স্বরাজ নয়।' ফলে তাঁর মতে, গণ-আন্দোলনে খোঁজা উচিত আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্র তৈরি করার প্রচেষ্টা নয়, অন্য এক না-হওয়া সমাজের সম্ভাবনা।

নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে যেসব ঐতিহাসিক গত দুই দশক ধরে গবেষণা করছেন, তাঁদের রচনার সঙ্গে হিতেশবাবুর রচনার আপাত-সাদৃশ্য আছে। গণ-উদ্যোগের মধ্যে শক্তি খোঁজা, নিম্নবর্গের স্ব-উদ্যোগ কীভাবে বার বার স্থানীয় স্তরে আন্দোলনের গতিমুখ বদলে দিচ্ছে বা গণ-আন্দোলনে অখ্যাত নাম-না-জানা অসংখ্য সাধারণ লোক কী ভাবছে, কীভাবে তারা জমায়েৎ হচ্ছে, হিতেশবাবুর আলোচিত এইসব প্রশ্ন শহীদ আমিন বা ডেভিড হার্ডিম্যানকেও অনুক্ষণ ভাবিয়েছে। কৃষকবিদ্রোহের চৈতন্যের নানা রূপকে বোঝাই তো রণজিৎ গুহ মহাশয়ের গবেষণার উদ্দিষ্ট। কিন্তু সাদৃশ্যটা আপাত ; তত্ত্বে পার্থক্য যোজনপ্রমাণ।

যে-দ্বৈত ক্ষেত্রের কথা নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা বলেন, যে-খণ্ডের সম্পূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা নিয়ে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা দীপেশ চক্রবর্তী প্রমুখ ঐতিহাসিক চিন্তিত, সেই সমস্যা নিয়ে হিতেশবাবু একেবারে ভাবিত নন। আন্দোলন খণ্ড সন্দেহ নেই ; কিন্তু গান্ধীবাদী প্রত্যয় তো অখণ্ড, তা হল : স্বরাজ। সেটাই সব খণ্ডকে একসূত্রে বাঁধবার শক্তি রাখে। আদর্শ ও আন্দোলন যেন অযুতসিদ্ধ পদার্থ, অবয়ব-অবয়বীর মতো, সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ। একটা বাতিল করলে অন্যটার অস্তিত্বও নষ্ট হয়, নিরর্থকতায় পর্যবসিত হয়। অখণ্ড না থাকলে এখানে খণ্ড হয় না ; হিতেশবাবুর কাছে, খণ্ড আন্দোলন অখণ্ড আদর্শের স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিশেষ রূপ মাত্র।

খণ্ডের মাহাত্ম্য : অখণ্ডের উপস্থিতি

নানা খণ্ড এলাকার আন্দোলনের অনুপুঙ্খ পরিচিতি এই বইতে ধরা পড়ে। 'কলকাতার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি'র রাজনীতির সীমা ছাড়িয়ে 'সম্পূর্ণ ব্যাবর্তক গ্রামীণ পরিবেশে নিরক্ষর, নিরন্ন জনসাধারণের' যেসব

আন্দোলন পূর্ব মেদিনীপুর, আরামবাগ, বাঁকুড়াতে গড়ে উঠেছিল, তার নানা আখ্যান অধ্যায়-পরম্পরায় বিবৃত। কলকাতার কাছে মহিষবাথানে আন্দোলন কীভাবে স্থানিক মাত্রা পায়, তাও তাঁর চোখ এড়ায় নি। আরামবাগের প্রাকৃতিক পরিবেশ, মেদিনীপুরে মাহিষ্য গোষ্ঠীর সামাজিক অগ্রগতি, বাঁকুড়া জেলার কৃষক-আন্দোলন, সব-কিছু কীভাবে জাতীয় আন্দোলনের টানাপোড়েনে আবদ্ধ হল, তা সব জটিলতা নিয়েই ধরা পড়েছে কুশলী বর্ণনায়। ছোটো ছোটো তথ্যের উল্লেখ দেখায়, ক্ষেত্র-সমীক্ষায় হিতেশবাবু কতটাই না তন্নিষ্ঠ ছিলেন। 'ধাপধরা-গোবিন্দপুর' যে আরামবাগ মহকুমার পুড়শুরা থানায়, এই কথা হিতেশবাবু মনে করিয়ে দিয়েছেন এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে মহকুমার তৎকালীন যাতায়াতের ব্যবস্থার ইঙ্গিত স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ৪২-এর আন্দোলনের প্রসঙ্গে কী দক্ষতার সঙ্গেই না তিনি লিখেছেন, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের নামকরা ভোল পালটে-ফেলা দেশী আমলাদের অতীতে অনুসৃত চণ্ডনীতির দাপট ; আবার জানাতে ভোলেন নি সরকারি আমলাদের দাপট কীভাবেই না গ্রামে গ্রামে আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন বাড়িয়ে দিয়েছিল, আন্দোলনের মৌলিক চরিত্র পালটাতেও সাহায্য করেছিল। অনিলবরণ রায়, গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ প্রমুখ স্থানীয় নেতার কথা যেমন এসেছে, আবার শিশুরাম মণ্ডল, পদ্মা দুধওয়ালী বা হাবুর মায়ের লড়াইয়ের কাহিনীও হিতেশবাবু তাঁর ইতিবৃত্তে সযত্নে স্থান দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জবানী, অভিজ্ঞতা ও আন্দোলনের নানা গল্প নিবন্ধটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। সর্বব্যাপী কাঠামো বা কোনো এক উদ্দেশী যুক্তির দাপটে মানুষের গল্প হারিয়ে যায় নি। প্রত্যেকটি খণ্ড গল্প নিটোল। অসম্পূর্ণ হলেও সেই গল্প প্রত্যয়ের ছোঁয়ায় ভাস্বর, এইরকম একটা নীতিতে বিশ্বাসী হিতেশবাবু সুযোগ বুঝলে বিবৃতি থামিয়ে গল্প বলতেন। ফলে আমরা জানতে পারি যে ইতিহাসে খুঁটিনাটি কী গুরুত্বপূর্ণ! যেমন : কেন কোনো সংগঠন কোথায় দানা বাঁধবে, তা নির্ভর করছে, যথাযথ সময়ে কোনো একটা লাগসই ছোটো কাজ করার উপর। পুকুরপাড়ে পায়খানা পরিস্কার করা থেকে কলেরার মড়া পোড়ানোর কাজ বা 'বাগাল'দের কাঁধে হাত রেখে খোসগল্প করার অভ্যাসও এলাকায় গান্ধীজীর সেবা-সংগঠনের ভিত গড়ে দিতে পারে, বাইরের কর্মী ধীরে ধীরে গ্রামের লোকেদের আপন মানুষ হতে পারে। এই মানুষ গড়ার কাহিনী, মানুষের চৈতন্য বদলের লড়াই যে স্বরাজের বোধ— এই তত্ত্বটা বার বার খণ্ড কাহিনীর মধ্য দিয়ে হিতেশবাবু জোরের সঙ্গে বলেছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে আধুনিক কোনো ইতিহাসের গবেষণায় খণ্ডচিত্রের এইরকম সমাবেশ দেখা যায় নি, কারণ খণ্ড-অখণ্ডের সমবায়িক সম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিকই হিতেশবাবুর মতো দৃঢ়প্রত্যয়ী নন। ফলে তাঁর রচনা অন্য এক দুর্লভ স্বাদে বিশিষ্ট।

'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'

এই বৈশিষ্ট্যে বৈচারিক প্রশ্নের সূত্রপাত। 'অভয়' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে : অসংখ্য সাধারণ মানুষ গান্ধীজীর ডাকে কীভাবে সাড়া দিয়েছিল, 'কীভাবে ভরসা পেয়েছিল'। তাদের ভাষা, তাদের জবানী তিনি বিবৃতির মধ্যে সরাসরি তুলে ধরেছেন। একের পর এক নানা লোক এসেছে, 'অভয়ের মন্ত্রের' কথা বার বার বলে গেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। অংশটির নাম : 'নগেন প্রতিহারের অভয়বোধ ও স্বরাজচিন্তা' (পৃ. ৩২-৩৪)।

প্র : এ-সব যে করেছেন এতে তো ঝুঁকি ছিল, তবু কেন করেছেন ?
উ : ঝুঁকি বৈকি ? <u>এ তো তখন একটা নেশা</u>। মার খাব কি মরব সে-সব জ্ঞান তো তখন নেই আর।
প্র : ভয় তো ছিল এ-সবের।
উ : ভয় করি নাই তখন।
প্র : কিন্তু আন্দোলনটা কেন করেছিলেন ?

উ : ভালোর জন্য।
প্র : কি ভালো হবে ?
উ : আমাদের দেশের ভালো হবে। ইংরেজ যে শোষণ করছে তা থাকবে নাই। আমরা সকলে মিলে সবটা কাজ করতে পারব।...
প্র : আর কি ভালো হবে বলে মনে হয়েছিল ?
উ : নিজেদের জন্য যদি কিছু টাকাকড়ি দরকার হয় তো নিজেদের মধ্যে জোগাড় করে ঠিক চলবে।...
প্র : আপনি কি খাজনাবন্ধ আন্দোলন করেছিলেন ?
উ : খাজনা বন্ধ করেছি। খাজনা না দেওয়াতে জমি গেছে।
প্র : বন্ধ করলেন কেন ?
উ : এই পাঁচজনে জুটে যে কথাটা হলো সেইটে করা।
প্র : কিন্তু তার তো একটা যুক্তি ছিল।...
প্র : এত জোরটা কিসের ?
উ : দুব নাই যে মনেতে জোরটা হয়ে গেছে। দুব নাই তো দুব নাই।
প্র : জোরটা আসে কোথা থেকে ?
উ : কোথা থেকে আসে জানি না। তবে এসে যায়।

কোথা থেকে যে জোরটা আসে প্রতিহার মশায় সেটা বুঝিয়ে বলতে পারেন নি। কিন্তু এর উৎসটা কোথায় আমাদের জানতে হবে। [সব নজরটান মৎপ্রদত্ত]

সমস্ত অধ্যায়ে বা বই জুড়ে এই উৎসটাই হিতেশবাবু নির্ণয় করেছেন— তা হল : গান্ধীবাদী প্রত্যয় বা স্বরাজের সাধনা।

প্রকৃতপক্ষে, উপরি-উক্ত সাক্ষাৎকারের মধ্যে দুটি ভিন্নমুখী বোধের টানাপোড়েন দুর্নিরীক্ষ্য নয়। নগেন প্রতিহারের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাকে হিতেশবাবু অন্য লোকদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলাতে চাইছেন ; ফলে ভিন্ন ভিন্ন কাজের পেছনে সাধারণ 'যুক্তি'র তাগিদটা বোঝার ইচ্ছা, সব ভিন্নতাকে কোনো-না-কোনো স্পষ্ট প্রত্যয়ে ধরার আকুলতা, প্রশ্নের অভিমুখকে চালিত করেছে। অপরপক্ষে, হিতেশবাবুর মনে হয়েছে যে নগেন প্রতিহারের জবাব অস্বচ্ছ ; কারণ তার কাছে লড়াইটা নেশা, সবাইয়ের সমবেত ইচ্ছায় সাড়া দেওয়া। নেশাটাই জোর, মুহূর্তে জোরটা আসে, পরিস্থিতিটা যে ওইরকম। সব-কিছুর পেছনে যুক্তি খুঁজলে নগেনবাবুর জোরটা বোধহয় উবে যেত। 'এ তো তখন একটা নেশা'— এই কথাটার মধ্যে মুহূর্তের বৈশিষ্ট্য জাঁকিয়ে বসেছে। মানুষের মেজাজ নয়, মেজাজের মানুষ, মেজাজ ও মানুষ সেই মুহূর্তে একাকার। খণ্ড-অখণ্ড ভেদের কথা মনে থাকে না, নানা খণ্ডকে মিলিয়ে আর অখণ্ড খোঁজবার দরকার পড়ে না।

তবে, মুহূর্তের এই নিজস্ব বোধকে ধরার সংবেদনশীলতা হিতেশবাবুর ছককেও হারিয়ে গেছে। আন্দোলনের নানা ফাঁকফোকর আছে। সচেতনভাবে সেইসব ফাঁকির অস্তিত্ব হিতেশবাবুর সমৃদ্ধ রচনায় ধরা পড়েছে ; মেদিনীপুর ও বিশেষত আরামবাগে বার বার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঐক্য কীভাবে ভাগচাষী আন্দোলনের দাবিতে বা জমিদারবিরোধী লড়াইয়ের চাপে ভেঙে যাচ্ছিল, তার বিস্তৃত আলোচনা যে-কোনো পাঠককে মুগ্ধ করবে। 'পত্র' পত্রিকার নানা লেখার ঝোঁক বিশ্লেষণ ক'রে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে নিম্নবর্গের তাগিদ ও উদ্যোগ কখন কীভাবে জেলার নেতৃবৃন্দকে অবস্থান পরিবর্তনে বাধ্য করেছিল ; নেতৃবৃন্দের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য ৪২-এর পরে ওই মহকুমায় কোনো গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। এই প্রেক্ষিতে গণ-আন্দোলনের অসংখ্য সম্ভাবনা হারিয়ে যাওয়ার আক্ষেপ তিনি বার বার করেছেন (পৃ. ২০৬)।

হিতেশবাবুর সব আক্ষেপ অহিংস গ্রামসমাজের স্বপ্ন ভেঙে যাবার প্রেক্ষাপটে। মুহূর্তের বোধে যে-স্বপ্নকে

সফল হতে তিনি দেখেছেন বলে মনে করেছিলেন, দেশে ও কালে সেই স্বপ্ন অবয়ব পেল না। খণ্ড ও অখণ্ডের বিরোধকে তিনি এইভাবে বোঝার চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রের মাধ্যমে নয়, কিন্তু সামাজিক অভিজ্ঞতার খণ্ড মুহূর্তগুলি দিয়ে তো স্বরাজের আদর্শে গঠিত ভারতীয় সমাজ তৈরি হতে পারত। প্রত্যয়ের এই ক্ষেত্রে হিতেশরঞ্জন সান্যালও অখণ্ডতার সাধক।

সবরকমের অখণ্ডের সাধনার চরিত্র অবশ্য এক গোত্রের নয়। আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার ইচ্ছা, ভোগবাদী সমাজের কামনা এবং স্বরাজে অবিচল প্রত্যয় থাকার মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। অথচ মনে হয়, কোনো অখণ্ডই খণ্ডকে পূর্ণভাবে ধরতে পারে না ; কারণ শত সংযোগ সত্ত্বেও অখণ্ডের বোধ এবং খণ্ডের বোধ পৃথক। অস্তিত্বের জোরে অখণ্ড অবশ্য খণ্ডকে আত্মসাৎ করতে পারে ; অন্যপক্ষে খণ্ডের সত্তার মধ্যে এমন এক অনন্যতা থাকতে পারে যা স্বতন্ত্র, যা অখণ্ডকে ছাপিয়ে যায়। নগেন প্রতিহারের জোর/অভয় একান্ত নিজস্ব, সেই ক্ষণজাত বোধকে কোনো কাঠামোতে বাঁধলেই, বোধের নিজত্ব, স্বত্ব চলে যাবে, বোধ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে। শেষ বিচারে, স্বরাজের বোধও প্রত্যেকের নিজস্ব, প্রত্যেকে নিজের মতো করে স্বরাজকে তৈরি করে। সেখানে কোন্‌টাই বা খণ্ড, আর কোন্‌টাই বা অখণ্ড ? নগেন প্রতিহার ঠিক এই কথাটা কি হিতেশবাবুকে বলতে চেয়েছিলেন ?[১]

টীকা

১. এই লেখাটি শেষ করার পরে Shahid Amin-এর বই *Event, Metaphor, Memory : Chauri Chaura, 1922-1992,* Delhi, 1995 পড়লাম। নানা স্তরে নানা লোকের খণ্ডিত স্মৃতির বিবরণ কীভাবে জানাবোঝা ইতিহাসের আখ্যানকে তছনছ করে দিতে পারে, সেইরকম একটি অভিজ্ঞতার অনুপম উদাহরণ এই বইটি। নানা অখণ্ড আখ্যান এবং বিচিত্র খণ্ড-খণ্ড স্মৃতির টানাপোড়েনে ইতিহাস-রচনার সমস্যা কী, সেই বৈচারিক বিতর্কে গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল, স্বরাজের পথে, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৪। মূল্য একশো টাকা।

গৌতম ভদ্র

সংলাপ

নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ

শেফালী মৈত্র তাঁর 'নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ' প্রবন্ধে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে এমন এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যে বিষয়ে আলোচনা সচরাচর বাঙলা ভাষায় চোখে পড়ে না। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের দিকে যাত্রায় তিনি যে-পথ অনুসরণ করেছেন— দেকার্ত, কান্ট, ফ্রেগে, হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন, কোয়াইন, ডেভিড্‌সন, দেরিদা— এই পথ-নির্বাচন, আধুনিকোত্তর ভাবুকদের মেটাফর্ ব্যবহার করে বলতে গেলে বলতে হয়, এও এক আখ্যানেরই রচনা, যা এই ক্ষেত্রে একই সঙ্গে এক টেলোস-এরও ইঙ্গিতবাহী। বস্তুত কোনো দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা এর থেকে মুক্ত হতে পারে না, দর্শনের ইতিহাসের আলোচনা তো নয়ই। যে-কোনো ব্যাখ্যাই এবং তার পথ-নির্বাচন বা অন্য কথায় বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে যে-আখ্যান রচিত হয়, রচনাকার তার মাধ্যমে বিষয় সম্পর্কে এক আবেষ্টন বা ক্লোজ়ার সৃষ্টি করেন। কোনো একটি বিশেষ ক্লোজ়ারই সত্য, বাকি সব মিথ্যা এরকম কিন্তু নয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে অবশ্য বলতে হয়, আমাদের কোনো একটি 'বিষয়ের' ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বা বর্ণনা থাকে না, থাকে ভিন্ন বিষয় এবং ভিন্ন ক্লোজ়ার। প্রতিটি ক্লোজ়ারই অন্যের থেকে আলাদা এবং প্রতিটি ক্লোজ়ারই জগৎকে এক নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজায়, প্রতিটি ক্লোজ়ারই আমাদের এই 'জগৎ' সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট আচরণ ও উপায় অবলম্বন করতে সাহায্য করে।

শেফালী মৈত্র তাঁর রচনায় নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের যে-ব্যাখ্যা রচনা করেছেন তা এক নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা এবং ক্লোজ়ারও। এই উক্তির মাধ্যমে লেখিকার কোনো সমালোচনা কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নয় ; বরং আমি বলতে চাইছি, কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা, সম্ভাব্য ক্লোজ়ারগুলি থেকে বেছে নিয়ে একটি ক্লোজ়ারকে বিষয়ের উপর আরোপ করে। আমার এই রচনার ক্ষেত্রেও ওই একই উক্তি প্রযোজ্য। এই উক্তি বিভিন্ন দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যদি না দার্শনিক এই বিষয়ে সচেতন থাকেন। দুজন এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাঁরা হলেন নীট্‌শে (প্রচলিত বাংলা উচ্চারণই ব্যবহার করলাম) এবং হাইডেগার। আধুনিকোত্তর চিন্তাধারার যদি কোনো জিনিওলজি তৈরি হয়, তা হলে সেই জিনিওলজি আরম্ভ হবে নীট্‌শে ও হাইডেগার থেকে। বস্তুত বিনির্মাণবাদীদের একরকম পূর্বসূরীও এঁরা দুজন। লেখিকা কিন্তু এঁদের দুজনের সম্বন্ধে মোটামুটি নীরব। কেন নীরব, তার উত্তর হয়তো কোনো এক বিনির্মাণেই মিলবে। কিন্তু আপাতত সে চেষ্টা আমি করছি না। বরং লেখিকা যেমন দেকার্ত থেকে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, সেই দেকার্তের সূত্র ধরেই বলব যে হাইডেগার তাঁর 'বিইং অ্যান্ড টাইম' (১৯২৭) এবং পরে আরও জোরালোভাবে 'দ্য কোয়েশ্চন কন্‌সারনিং টেক্‌নোলজি' বা 'পোয়েট্রি, ল্যাঙ্গুয়েজ, থট' গ্রন্থগুলিতে[১] দেকার্ত-প্রবর্তিত আধুনিকতার এই বনিয়াদী পদ্ধতির (ফাউন্ডিং মেথডোলজি) এক সমালোচনার উদ্ভব করেন, যে-বনিয়াদী পদ্ধতিকে হাইডেগার দেখেছিলেন পশ্চিমে হিংসার উৎপাদক এবং জ্ঞানের এক অপর্যাপ্ত ভিত্তি হিসেবে। হাইডেগার মনে করতেন, দেকার্তীয় অনুমানের ফলেই জ্ঞাতা (নোয়িং সাবজেক্ট) এবং নির্জীব জ্ঞানের বস্তুর (ইনার্ট অবজেক্ট অব নলেজ) মধ্যে এমন এক বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে ও এমন এক জগৎ নির্মিত হয়েছে যেখানে বৈজ্ঞানিকের নির্লিপ্ততা এক অদ্ভুত প্রাধান্য অর্জন করেছে এবং সমস্ত অস্তিত্বের মডেল ও ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জগৎ এমন এক বিন্যাস যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে তৈরি করে নেয়, এই অভিজ্ঞতার বদলে পশ্চিমের মানুষ জগৎকে নিরীক্ষণ করতে শিখেছে এক অসাড়, নির্জীব বস্তু হিসেবে যাকে সে বিভিন্ন দ্বিত্বের মাধ্যমে নিপুণভাবে ব্যবহার করতে চায়। এই দ্বিত্বের উদ্ভব হয়েছে মূল দেকার্তীয় বিভাজন থেকে এবং এর

পুনরাবৃত্তি হয়েছে বিভিন্নভাবে, যেমন : মন/শরীর, জড়/আত্মা, যুক্তি/অনুভূতি, পুরুষত্ব/নারীত্ব, ইত্যাদি। ফলে আধুনিকতার শর্তই হয়ে উঠেছে জাগতিক সত্তাকে (বিইং ইন-দ্য-ওয়র্ল্ড) অস্বীকার করা। এ যেন এক নির্লিপ্ত জ্ঞাতা নির্জীব জড় প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করছে, অনুধ্যান করছে, বিচার করছে এবং নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। সব জাগতিক সম্পর্কই শেষ অবধি কার্যসাধনের উপায় হিসেবে পরিণত হচ্ছে। জাগতিক সত্তাও শেষ অবধি প্রায়োগিক ও প্রাযুক্তিক ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিচ্ছে। হাইডেগার চেয়েছিলেন এই প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয়ে এই সত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোক। তাঁর যুক্তি ছিল দেকার্তীয় এই উপস্থিতি (প্রেজেন্স) বহু সম্ভাব্য সম্পর্কগুলির মধ্যে একটি সম্পর্ক মাত্র। তাই দেকার্তীয় যুক্তির বিকল্প হিসেবে তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন নান্দনিক ক্ষেত্র, যেমন কবিতা, যেখানে দেকার্তীয় সেই প্রত্যয়গত বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই, যা মানুষকে জগৎ থেকে আলাদা করে দেয়। বস্তুত আধুনিকোত্তর চিন্তাধারার প্রথম প্রতিফলন যে নান্দনিক ও সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় তার মূলে রয়েছে হাইডেগারের প্রভাব। এর বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায় ; আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি, যা আধুনিকোত্তর চিন্তাভাবনার একটি প্রভাবশালী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়। লেখাটি হল সুসান সন্টাগ-এর 'এগেইন্স্ট ইন্টারপ্রিটেশন' (১৯৬৬)[২]। এখানে সন্টাগ খুব স্পষ্টভাবেই হাইডেগার দ্বারা প্রভাবিত এবং হাইডেগারের মতোই যে-কোনো ব্যাখ্যার প্রতি সন্দিগ্ধ ও প্রতিরোধী মনোভাবাপন্ন। সন্টাগ বরং বেশি উৎসাহী 'নৈঃশব্দ্যের নন্দনতত্ত্বের' (এস্থেটিক্স অব সাইলেন্স) প্রতি ; শিল্প যেখানে পশ্চিমী প্রায়োগিক ও প্রাযুক্তিক যুক্তিকে প্রতিরোধ করবে এবং যে-কোনো ব্যাখ্যাকেই তার শরীরে পশ্চিমের যৌথ বৌদ্ধিক ইচ্ছাশক্তির আরোপণ হিসেবে অস্বীকার করবে।

নীট্শে ও হাইডেগারের প্রভাব আধুনিকোত্তর চিন্তায় নানাভাবে এসেছে। এর বিস্তারিত আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয় ; কিন্তু দেরিদার আলোচনা করতে গেলেই মনে রাখতে হবে যে এঁরা তিনজনই দর্শনকে তার জ্ঞাতা-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণের (দেকার্ত, কান্ট, প্রভৃতির জ্ঞানতত্ত্বের ফসল) আওতা থেকে সরিয়ে এনে দর্শনের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন ভাষা, চিহ্ন ও রচনার ভূমিকা। এঁরা তিনজনই তাঁদের রচনার প্রতিবর্তী (রিফ্লেক্সিভ) চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন এবং এই সচেতনতা এঁদের রচনাশৈলীতে প্রতিফলিত, যে কারণে এঁদের রচনার গতিপ্রকৃতি সহজবোধ্য নয়। এবং এঁরা তিনজনই দর্শনকে তার তথাকথিত উচ্চাসন দিতে নারাজ। এইসব কারণেই কোনো কোনো সমালোচক এঁদের রচনা খারিজ করে দেন এই বলে যে এইগুলি দর্শন নয়, সাহিত্য। এই যুক্তির মধ্যে পরোক্ষভাবে যে ধারণা কাজ করে তা হল : দর্শন যেন সাহিত্যের অতিরিক্ত অন্য কিছু, দর্শনের দাবি সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা কঠোর বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনার ফসল। সমস্যা হল দেরিদা, নীট্শে, হাইডেগার দর্শনের এই তত্ত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তাই দেরিদাও আলোচনার জন্য বেছে নেন পল ভালেরির সেই রচনা যেখানে ভালেরি মন্তব্য করেন যে দর্শনও এক ধরনের লেখন (রাইটিং), যা তার লিখিত চরিত্রের কথা মনে রাখে না অথবা মুছে দিতে চায়।[৩] দার্শনিক ভাষার চরিত্রই বা কী সেটা দেরিদার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।[৪] সেইজন্য দেরিদা ভালেরিকে বিনির্মাণবাদীদের পূর্বগামী হিসেবে গণ্য করেছেন।

শেফালী মৈত্রের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনে যুক্তি ও যুক্তিবিদ্যার দিকটি। সেইজন্য তাঁর আলোচনায় যেমন দেকার্ত ও কান্ট এসেছেন, তেমনই এসেছেন ফ্রেগে এবং কোয়াইন। এই আলোচনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিনির্মাণের আলোচনায় আরও যে-কয়েকটি বিষয়ের বিবেচনা জরুরি হয়ে পড়ে তা হল ভাষা : চিহ্ন ও রচনার ভূমিকা। এবং এখানেই যুক্তিবিদ্যা এক কূটাভাসের (প্যারাডক্স) সম্মুখীন হয় যাকে আমি প্রতিবর্তিতা বা রিফ্লেক্সিভিটি বলছি। লেখিকা যেমন হ্বিট্গেনস্টাইনের কথা বলেছেন, সেই রকমই গঠনবাদী ভাষাতত্ত্বের (স্ট্রাকচরাল লিঙ্গুইস্টিক্স) প্রবক্তারাও ভাষা ও চিহ্নকে দর্শনের আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। দেরিদা তাঁর 'অব গ্রামাটোলজি'-র এক বড়ো অংশ নিয়োজিত করেছেন এঁদের আলোচনায়।[৫] ভাষার নতুন স্বরূপ ও চরিত্র উন্মোচিত হওয়ার ফলে দার্শনিক প্রত্যয়গুলি (কন্সেপ্ট্স) স্বচ্ছ বলে গণ্য করা কঠিন

হয়ে ওঠে, ফলে আমাদের ভাষা সম্পর্কে দাবি, ভাষার সঙ্গে জগতের সম্পর্কের দাবি এবং সবরকম পরোক্ষ দাবি এমন এক প্রতিবর্তী চরিত্র পেয়ে যায় যার থেকে মুক্তি অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করতে হলে তা তো ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করতে হবে। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন তাঁর 'ট্র্যাকটেটাস' গ্রন্থে ভাষা ও জগতের সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হন যে 'আমার ভাষার সীমানা মানেই হল আমার জগতের সীমানা।'[৬] কিন্তু হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন ভাষা সম্পর্কে এই কথা বলতে পারেন না কারণ এই কথা বলা মানে ভাষার সীমানা অতিক্রম করা। তাই এই উক্তি যদি সত্যি হয় তা হলে তা মিথ্যা। হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন এই প্রতিবর্তিতা সম্পর্কে অচেতন ছিলেন না, তাই তিনি বলেন, 'আমার প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যানের কাজ করে এইভাবে : যিনি আমাকে বোঝেন তিনি শেষ অবধি মেনে নেবেন যে প্রস্তাবগুলি অর্থহীন, তিনি এইগুলি পরের ধাপে যাবার জন্য— ধাপ হিসেবে— ব্যবহার করবেন।'[৭] হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইন-এর মতো নীট্‌শে, হাইডেগার, দেরিদাও ভাষা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাও প্রতিবর্তী এবং কূটাভাসী। তবুও হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনের মতো তাঁরা ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ দাবি করা থেকে বিরত থাকেন না। বরং তাঁদের এই দাবিগুলি তাঁদের তত্ত্বের মধ্যেই প্রতিবর্তিতা-সঞ্চালনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত। দেরিদার ক্ষেত্রে এই অন্তর্ভুক্তি দেখায় যে সব রচনায় প্রতিবর্তিতা দেখা দিতে বাধ্য ; তাই একে অস্বীকার করা বা পরিহার করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই দার্শনিকদের রচনা সম্পূর্ণভাবে প্রতিবর্তী, রচনার বক্তব্যও সবসময় রচনার সীমাবদ্ধতা থেকে উদ্ভূত। তাই এঁদের রচনা নিশ্চল বস্তু নয়, যা নিয়ে বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে পারে, যেমন আমরা মর্মর মূর্তি নিয়ে করি বরং এঁদের রচনায় গতি আছে, সঞ্চালন আছে ; যা বলা যায় এবং যা বলা যায় না এই দুই-এর এক অস্থিরতা আছে। তাই এই রচনায় বর্ণনা, মতপ্রকাশ ও সিদ্ধান্তের পরিশেষে সব-কিছু অগ্রাহ্য করে আবার শুরু হয় নতুন যাত্রা। কোন্‌টি বৈধ আর কোন্‌টি অবৈধ তা আর গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ সবই রচনার অবিরাম অস্থিরতার লক্ষণ এবং অংশ।

শেফালী মৈত্রের প্রবন্ধের প্রসঙ্গে এখানে বিনির্মাণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বিনির্মাণের মাধ্যমে একটি রচনা যেমন তার আলংকারিক এবং যৌক্তিক অসামঞ্জস্য উদ্‌ঘাটিত করে, সে রকমই রচনার প্রকাশ্য বক্তব্য এবং রচনা কী বলতে বাধ্য হচ্ছে তাও উন্মোচিত হয়। বস্তুত দেরিদার বিনির্মাণ রচনার এমন এক ঘনিষ্ঠ পাঠ যেখানে প্রত্যয়গুলির যে পার্থক্যের উপর রচনাটি দাঁড়িয়ে আছে বা রচনাটি নির্ভর করছে, রচনার মধ্যেই তার স্ববিরোধী প্রয়োগের ফলে তা রচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিচ্ছে, রচনাটি তার নিজের মানদণ্ডের ভিত্তিতেই অসার্থক হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে এ কথা বলাও আবশ্যক যে দেরিদা নিজে কিন্তু বিনির্মাণের কোনো সংজ্ঞা দিতে চান নি, বিনির্মাণের কোনো পদ্ধতি বা কৌশলও নয়। কারণ কোনো সংজ্ঞা তার অর্থ বহন করে— এই অনুমানকেই দেরিদা বিনির্মাণ করতে চান। কিন্তু বিনির্মাণ শুধুমাত্র রচনার মধ্যে অসংগতি বা স্ববিরোধ প্রদর্শন নয়, এর ক্ষমতা আসে দেরিদার এই দাবি থেকে যে একটি রচনা যদি উপস্থিতির পরাতত্ত্বের (মেটাফিজিক্স অব প্রেজেন্স) মধ্যে অবস্থান করে, তা হলে তা সবসময়ই বিনির্মাণ করা সম্ভব। বিনির্মাণ ও 'উপস্থিতির পরাতত্ত্বের' এই যোগ দেরিদার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানেই দেরিদার বিনির্মাণের সঙ্গে সাহিত্যিক বিনির্মাণের পার্থক্য।

এই যোগ সবচেয়ে পরিষ্কার দেরিদার হুসের্‌ল-সম্পর্কিত প্রথম দুই গ্রন্থে।[৮] হুসের্‌ল তাঁর দর্শনে অভিব্যক্তি (এক্সপ্রেশন) ও নির্দেশ-এর (ইন্ডিকেশন) মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এই পার্থক্য চিহ্নের ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। অভিব্যক্তি বক্তার অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত, এ হল চিহ্নের বিশুদ্ধ অর্থ ; অন্য দিকে নির্দেশ হল সূচনাত্মক এবং তা অভিপ্রায়ের সঙ্গে সব সময় যুক্ত নয়। হুসের্‌ল-এর আলোচনা করতে গিয়ে দেরিদা বলেন, চিহ্ন সবসময়ই পুনরাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। যদি চিহ্নের পুনরাবৃত্তি সম্ভব না হত, তা হলে তা চিহ্ন থাকত না। তাই চিহ্ন হতে গেলে হুসের্‌ল-এর বিশুদ্ধ অভিব্যক্তির পুনরাবৃত্তির ক্ষমতা থাকা চাই। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে হুসের্‌ল বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি সৃষ্টির যে শর্ত আরোপ করেছেন, তা ভেঙে যায়। চিহ্ন আর কল্পনার বিশুদ্ধ সৃষ্টি

হিসেবে থাকে না বরং তা যুক্ত হয়ে যায় বিভিন্ন সূচনাত্মক চিহ্নের জালে। দেরিদার বক্তব্য হল পাশ্চাত্য দর্শনে শুধু হুসের্‌ল কেন, প্রায় সব দার্শনিকই নির্ভর করেছেন এক পূর্ব-স্বীকৃত নিশ্চয়তার ধারণার উপর, যে নিশ্চয়তার উপস্থিতি অবিলম্বিত ও তাৎক্ষণিক। এইসব দর্শনের উৎস ও ভিত্তি হল এই উপস্থিতি। দেরিদা এই উপস্থিতির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন। দেরিদার মতে, পাশ্চাত্য দর্শনে বাচন ও লেখনের মধ্যে বাচনকে অগ্রাধিকার দেবার যে প্রবণতা, যাকে তিনি ধ্বনিকেন্দ্রিকতা (ফোনোসেন্ট্রিজ্‌ম) বলে আখ্যা দেন, তাও এই উপস্থিতির পরাতত্ত্বের পূর্ব-স্বীকৃত ধারণার ফল। বাচন যেহেতু তাৎক্ষণিক এবং অবিলম্বে অধিগত তাই বাচন বর্তমান ও উপস্থিত— এই যে ধারণা, তাকে দেরিদা অস্বীকার করেন। বিনির্মাণ সম্ভব, কারণ সব রচনাই নির্মিত হয় দুটি পূর্ব-স্বীকৃত ধারণাকে ভিত্তি করে : একটি হল নির্দিষ্ট অর্থের ভিত্তি বা লোগোসেন্ট্রিজ্‌ম এবং অন্যটি হল উপস্থিতির পরাতত্ত্বের ধারণা। শেফালী মৈত্র লোগোসেন্ট্রিজ্‌মকে যুক্তিকেন্দ্রিকতা হিসেবে বিচার করেছেন, যে-বিচার আমার মনে হয় কিছুটা অসম্পূর্ণ। গ্রীক শব্দ 'লোগোস' যে-সমস্ত দ্যোতনা বহন করে, তার মধ্যে যুক্তি তো পড়েই, আবার তার মধ্যে প্রজ্ঞা আর পরমার্থের দ্যোতনাও কখনো কখনো আসে। খ্রিস্টধর্মের আদিযুগে ধ্রুপদী দর্শনকে যুগপৎ ধারণ ও অতিক্রম করার জন্য 'লোগোস' শব্দটি ঈশ্বরের বাণী অর্থে, ব্যবহৃত হত: ঈশ্বরই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, তাঁর বাণী বা শব্দ একই সঙ্গে অর্থের উৎস এবং অর্থের সূচক এবং একমাত্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ বাণী। দেরিদার মতে লোগোসের প্রভাব পড়েছে বহুদূর। বাচন মাধ্যমহীন অভিব্যক্তি হিসেবে বিশুদ্ধ এই ধারণা থেকে লোগোসকে স্থাপন করা হয়েছে লেখনের চেয়ে উচ্চাসনে এবং লেখনকে গ্রহণ করা হয়েছে বাচনের বিশুদ্ধতার একটি প্রয়োজনীয় কিন্তু সন্দেহজনক সম্পূরক হিসেবে। বাচনকে বেশি মূল্য দেওয়ার মধ্যে যে প্রবণতা বিদ্যমান তা হল স্বয়ং-সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা, বিশুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষা। দেরিদার মতে বিশুদ্ধ বাচন যেমন সম্ভব নয় তেমনি উপস্থিতিও সম্ভব নয়। তিনি উপস্থিতিকে অনুপস্থিতির অন্তর্ভুক্ত করেন। বাচন তাঁর মতে সর্বদাই (ও) ইতিমধ্যেই (অলওয়েজ় অলরেডি) লেখনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দেরিদা অর্থকেন্দ্রিকতার ফাঁদ এড়াবার জন্য নতুন নতুন শব্দের উদ্ভব করেছেন, একবার ব্যবহার করার পর এই শব্দগুলি পরিত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই। যদিও রোর্‌টি বলেছেন, এ কোনোমতেই সম্ভব নয়, ছাত্র ও অধ্যাপকদের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে শব্দগুলি শেষ অবধি একটা অর্থ পেয়েই যাবে।[৯] দেরিদা তাঁর লেখায় উক্তির অপসারণের (ইরেজ়ার) মাধ্যমে লোগোসেন্ট্রিক ক্লোজ়ার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন বা অনেক সময় বেছে নিয়েছেন এমন এক লিখনশৈলী যাকে বলা যায়, প্যারডির প্যারডি।[১০] বস্তুত এই ক্লোজ়ারকে পরিহার করার জন্য দেরিদা নিজের গ্রন্থের ভূমিকা লেখা থেকেও সাধারণত বিরত থেকেছেন। শেফালী মৈত্র লিখেছেন, 'বিনির্মাণবাদীদের মতে ক্লোজ়ার বা আবেষ্টন থাকা মাত্রই দূষ্য'। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় বিনির্মাণবাদীরা জানেন, তাঁদের রচনাও হয়তো ক্লোজ়ারের ফাঁদমুক্ত থাকতে পারে না বা পারবে না। সেইজন্যই নানা ছলাকলা, কলাকৌশল, ইরেজ়ার, ট্রেস, প্যারডির প্যারডি ইত্যাদি। বিনির্মাণে নয়, আধুনিকোত্তরতার বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে এই কলাকৌশল বা ছলাকলার মধ্যেই।

টীকা

১. Martin Heidegger, *Being and Time*, New York, 1962 ; *Poetry, Language, Thought*, New York & London, 1975 ; *The Question Concerning Technology*, New York, 1977.

২. Susan Sontag, *Against Interpretation*, New York, 1966.

৩. Jacques Derrida, 'Qual Quelle : Valéry's Sources', *Margins of Philosophy*, Chicago, 1982.

৪. Jacques Derrida, 'Is There a Philosophical Language', *Points... Interviews, 1974-1994*, ed., E. Wever, Stanford, 1995.

৫. Jacques Derrida, 'Linguistics and Grammatology', *Of Grammatology*, Baltimore, 1976.
৬. L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, London, 1961, 5·6.
৭. পূর্বোক্ত, 6·54.
৮. Jacques Derrida, *'Speech and Phenomena' and Other Essays on Husserl's Theory of Signs*, Evanston, 1973 ; *Edmund Husserl's 'Origin of Geometry' : An Introduction*, Pittsburgh, 1978.
৯. Richard Rorty, 'Deconstruction and Circumvention', *Critical Inquiry*, vol. II, 1984, pp. 1-23.
১০. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : Jacques Derrida, *Spurs : Nietzsche's Styles*, Chicago, 1979.

প্রদীপ বসু

২.

'নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ'-এর মতো একটি উচ্চমানের নিবন্ধের জন্য শেফালী মৈত্র আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন। মুগ্ধ হয়েছি শেফালীর চিন্তার স্বচ্ছতায়, বক্তব্য উপস্থাপনে তাঁর অনায়াস দক্ষতায়। দর্শন-বিষয়ক কোনো প্রবন্ধে আমরা সচরাচর যে ধরনের অকারণ পাণ্ডিত্য ও ভীতিপ্রদ দুর্বোধ্যতার সঙ্গে পরিচিত শেফালীর প্রবন্ধে তার অনুপস্থিতি আমাদের এক বিশেষ স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়। তাঁর লেখা অত্যন্ত ঝরঝরে, প্রশংসনীয় তাঁর পরিমিতিবোধ : আর এই পরিচ্ছন্নতা ও পরিমিতিবোধের আবহে তাঁর বক্তব্য এক গভীর ঋজুতায় বিস্তারলাভ করেছে। বলা বাহুল্য, বিষয়ের উপর বিশেষ দখল না থাকলে এটি সম্ভব নয়। লেখিকার কৃতিত্ব এইখানেই।

শেফালীর উদ্দেশ্য নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের পথ তৈরি করা। দর্শনের যে-কোনো আধুনিক প্রকল্পে বিশেষ প্রাধান্য পায় 'নির্মাণ'— যার কেন্দ্রবিন্দু কোনো ধ্রুব ও অপরিহার্য মৌল ধারণা, কোনো অচলায়তনের আবেষ্টন (ক্লোজার)। এই মনগড়া অচলায়তন থেকে বেরিয়ে আসার অন্য নাম 'বিনির্মাণ'। আধুনিকোত্তর পর্বে দেরিদা, রোর্‌টি অথবা লিওতার এইভাবেই বেরিয়ে আসতে চান শাশ্বত থেকে ঐতিহাসিকতায়। ধ্রুবত্বের বিরুদ্ধে এই তীব্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই বিনির্মাণ প্রাণিত হয়ে ওঠে। লেখিকার ভাষায় :

> বিনির্মাণবাদীদের মতে ক্লোজার বা আবেষ্টন থাকা মাত্রই দূষ্য, তা সে লজিকের বৃত্তেই হোক, অথবা আদর্শ বা বিজ্ঞানের কোনো বৃত্তে হোক। ব্যাখ্যার যে-কোনো একমাত্রিকতাই অগণতান্ত্রিক, তথা দূষ্য। ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে ধ্রুবত্বের দাবি বারে বারে করা হয়েছে ; কিন্তু কোনো দাবিই ধোপে টেঁকে নি, তবু দার্শনিক একটা কোনো শাশ্বত ধ্রুব সত্য যুক্তি বা বিজ্ঞান বা মতাদর্শের মধ্য দিয়ে জগতের ব্যাখ্যা খুঁজেই চলে— এমন কোনো ধ্রুব সত্য যা দর্শনকে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত চেহারা দিতে পারে।... তবু যেন সব দার্শনিক বলতে চান, 'কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না অমুক, অমুক স্বীকার করা হয়।' এই শূন্যস্থানে কান্ট বসালেন ইনটুইশন আর ক্যাটিগরি-কাঠামো। অর্থাৎ 'কোনো বাক্যই বোধগম্য হবে না যদি না তা মানুষের ইনটুইশন আর ক্যাটিগরি-কাঠামোর দ্বারা বিন্যস্ত হয়।' ফ্রেগে আর হ্বিট্‌গেনস্টাইন বলছেন, কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না বাক্যটি তাঁদের দেওয়া লজিকের কাঠামো বা ফর্মের মধ্যে পড়ে। আর ডেভিড্‌সন বলেন, কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না যদি না বাক্যটি তাঁর দেওয়া কোহিয়ারেন্স বা সংগতির

> শর্ত পূরণ করে। এভাবে একটা মাত্রা দিয়ে গোটা জগৎকে দেখতে চাওয়াটা দেরিদার মতে একটা ক্লোজার বা আবেষ্টন। এঁরা প্রত্যেকে মনে করছেন, তাঁরা যা বলছেন তা-ই শেষ কথা এবং আর যে যা বলছে তার নিগলিতার্থ যদি তাদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায় ভালো নয়তো সেটা প্রলাপ।... একটি রূপক ব্যবহার করে বলা যায় যে এই দার্শনিকদের ব্যাখ্যায় যেন আছে শুধু আশ্রয়-বাক্য আর তার থেকে নিষ্কাশিত কতগুলি সিদ্ধান্ত, আর বাদ বাকি, চার পাশে যেন সাদা মার্জিন। মনে করা হয় এই আশ্রয়-বাক্য আর তার থেকে নিষ্কাশিত সিদ্ধান্ত অনন্য ; বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা আর-কোনো শাস্ত্র জোগাতে পারে না, এই ব্যাখ্যা যেন সর্বব্যাপ্য, এর বাইরে আর বোঝার কিছু থাকে না ; দাবি করা হয়, এই ব্যাখ্যা চূড়ান্ত, এর কোনো নড়চড় হতে পারে না। পাশ্চাত্য বিনির্মাণের পরিভাষায় দার্শনিকরা আমাদের দিচ্ছেন একটি অদ্বিতীয়, সমগ্র, বদ্ধ, শব্দতালিকা (ইউনিক, টোটাল, ক্লোজড ভোকাবুলারি)।
>
> দেরিদা বলতে চান, এমন আশ্রয়-বাক্যের সাহায্য নেওয়া মানে একধরনের মেটাফর বা উৎপ্রেক্ষার সাহায্য নেওয়া— কোনো মেটাফরই অনৈতিহাসিক নয় যদিও এই কথাটা আমরা অনেক সময় স্বীকার করতে চাই না। ইতিহাস বদলের সঙ্গে আমাদের মেটাফর বদলায়, পালটে যায় দর্শন। এই সত্যটুকু অস্বীকার করলেই আমরা কোনো-না-কোনো ক্লোজার বা আবেষ্টন সৃষ্টি করে ফেলি। দেরিদার এই বক্তব্যের সঙ্গে রোর্‌টি একমত।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দেরিদার বিনির্মাণের কথা যদি আমরা মনে রাখি তবে নরিস কিংবা গাশের ভাষ্য যথাযথ বলে মনে হবে না। এঁরা দেরিদাকে দর্শনের অপরিবর্তনীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মেলাতে চান : 'Derrida has devoted the bulk of his writings to a patient working-through (albeit on his own, very different terms) of precisely those problems that have occupied philosophers in the "mainstream" tradition, from Kant to Husserl and Frege'. (Christopher Norris, *Derrida* দ্রষ্টব্য)। এঁরা বলতে চান অন্যান্য ট্রানসেন্‌ডেন্টাল দার্শনিকদের মতো দেরিদারও মূল বিবেচ্য বা প্রশ্ন : 'কোনো কিছু সম্ভব হয়ে ওঠে কোন্ অপরিহার্য শর্তে' ? তা সে ভাষাই হোক অথবা দর্শনই হোক। এবং এই প্রশ্নের উত্তরে দেরিদার বক্তব্য, ভাষার সমস্ত বিভিন্নতা যে ঐক্যসূত্রে বা মূল শিকড়ে বিন্যস্ত তার নাম *différance*। এই ভাষ্য মানলে যে নির্মাণ বা মৌল ধারণার বিরুদ্ধে দেরিদার জেহাদ সেই দিগন্তের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে আসতে হয়। তা হলে দেরিদার দর্শনেও প্রশ্রয় পায় অচলায়তন আবেষ্টন। তা হলে যাঁরা মনে করেন, 'This word (deconstruction) has had a remarkable career. Having first appeared in several texts that Derrida published in the mid-1960s, it soon became the preferred designator for the distinct approach and concerns that set his thinking apart' (*A Derrida Reader between the Blinds* দ্রষ্টব্য) তাঁদের বক্তব্য নিরালম্ব হয়ে পড়ে। তা হলে আর বলা যাবে না, সবরকম বনিয়াদি তত্ত্ব ও তথ্যকে দেরিদা সন্দেহের চোখে দেখেন এবং চেষ্টা করেন বিনির্মাণ করতে।

আর সব শেষে থাকে কিছু প্রত্যাশা ও কিছু সংশয়। শেফালীর প্রবন্ধে বিনির্মাণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেলে খুশি হতাম। বিশেষ করে হুসের্‌ল ও হাইডেগারের যে ঐতিহাসিক অনুষঙ্গে দেরিদার দর্শন উঠে এসেছে (দেরিদার *Speech and Phenomena, Margins of Philosophy* দ্রষ্টব্য) তার কিছু আলোচনা প্রয়োজনীয় ছিল। এই প্রবন্ধে বিনির্মাণ বিষয়ে যতটুকু পেয়েছি তাতে মন ভরে নি। আরও কিছু প্রত্যাশা ছিল। বিশেষ করে বিনির্মাণের নানা অন্তর্লীন তরঙ্গ ও ব্যঞ্জনা, হুসের্‌লীয় সারতত্ত্ব এবং হাইডেগারের *Sein, Ereignis* ইত্যাদি 'unique magic words'-এর বিরুদ্ধে দেরিদার প্রবল অভিঘাত।

এবার একটু সংশয়। ডেভিড্‌সনকে শেফালী যতটা নিশ্চিত প্রত্যয়ে নির্মাণ বা ক্লোজারের পরিমণ্ডলের

মধ্যে চিহ্নিত করেছেন তা সর্বজনসম্মত হবে কিনা জানি না। কেননা Ernest LePore -সম্পাদিত ডেভিড্‌সন-বিষয়ক গ্রন্থে Samuel C. Wheeler III-র লেখা 'Indeterminacy of French Interpretation : Derrida and Davidson' প্রবন্ধে আমরা পেয়েছি এক ভিন্নতর ভাষ্য যেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে ডেভিড্‌সনের সঙ্গে দেরিদার বিনির্মাণের সাযুজ্য।

কিন্তু সংশয় যেখানে আরও অনেক বেশি তা লেখিকার নিম্নলিখিত মন্তব্য ঘিরে : 'বিনির্মাণবাদীরা খেলায় মাতেন নি। দার্শনিক সৌধ বিনির্মাণে তাঁরা যথোপযুক্ত যুক্তি ব্যবহার করেছেন'। এবং এই একই কথা অন্য ভাষায় : 'রোর্‌টি যতই মনে করুন দর্শনের পরিমণ্ডল থেকে না বেরুলে আধুনিকোত্তর হওয়া যায় না, দেরিদা তবু দর্শন চর্চা ছাড়তে রাজী নন... তাঁর লেখায় যথেষ্ট দার্শনিক ঋজুতা আমরা দেখতে পাই। দেরিদা কখনোই দর্শন ছেড়ে সাহিত্যের খাতায় নাম লেখানোর কথা বলেন নি।' মনে হয়, শেফালীর এই বক্তব্য নরিস ও গাশের ভাষ্যের দ্বারা সংক্রামিত— যাঁদের কাছে দর্শন খেলা নয়, যুক্তির অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু 'খেলা' কথাটি দেরিদা স্বয়ং ব্যবহার করেছেন। 'Play of signifiers' কথাটি বোধহয় তাঁর মুখেই শুনেছি। আমরা জানি হ্বিট্‌গেন্‌স্টাইনও 'game' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এবং খেলা হলেই সেখানে কোনো নিয়ম, শৃঙ্খলা বা যুক্তি থাকবে না— এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। শেফালীর প্রতিবাদ উচ্চারিত বিশেষ করে রোর্‌টির বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, রোর্‌টির কাছে দর্শন বিলুপ্ত হয়েছে সাহিত্যের মধ্যে। কারণ যে-কোনো দার্শনিক তত্ত্বই আসলে গল্প বা ন্যারেটিভ, তাই তা সাহিত্য-সমালোচনার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। ফলে সাহিত্যিক সাম্রাজ্যবাদের কাছে রোর্‌টির অকুণ্ঠ ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। রোর্‌টি সম্পর্কে শেফালীর এই বিশ্লেষণ কি যথার্থ ? এ কথা সত্যি, কোনো শাশ্বত সত্য বা লিওতারের ভাষায়, কোনো মেটান্যারেটিভ (*Postmodern Condition*)-এর পটভূমিকায় দর্শনকে সংস্থাপিত করতে রোর্‌টি একেবারেই রাজী নন। এবং সেই যুক্তিকে তিনি দূষ্য বলে মনে করেন যা কোনো অচলায়তন প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে যায়। দর্শনকে তিনি এই ধ্রুবত্বের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চান ; দর্শনের মৃত্যুর অর্থ এই বশ্যতা থেকে বেরিয়ে আসা। কিন্তু এর অর্থ দর্শনের পরিসমাপ্তি নয়, এক নতুন মাত্রায় তার উত্তরণ। এর অর্থ দর্শনের এক redescription— মেটান্যারেটিভ থেকে ন্যারেটিভে (*Contingency, Irony and Solidarity* দ্রষ্টব্য)। এই ন্যারেটিভ-কেন্দ্রিক হওয়ার জন্য সাহিত্যকে সম্প্রসারিত অর্থে নিলে দর্শন তার কাছাকাছি এসে যায় বটে, কিন্তু এই ন্যারেটিভের পেছনে কোনো যুক্তি (reason) নেই এ কথা ঠিক নয়। শুধু সে যুক্তির ব্যঞ্জনা ভিন্ন। সে যুক্তি প্রাগ্‌ম্যাটিক এবং সামাজিকরীতি (convention)-শাসিত। রোর্‌টির ভাষায় : there is nothing to be said about... rationality apart from descriptions of the familiar procedures of justification which a given society— ours— uses in one or another area of inquiry ('Solidarity or Obiectivity', J. Rajchman and C. West -সম্পাদিত, *Post-Analytic Philosophy*)। আমার মনে হয়, দেরিদা যখন একই সঙ্গে বলেন, দর্শন মাত্রই রূপকাত্মক বা গল্পকথা (narrative) এবং যুক্তি-আশ্রয়ী— তখন তাঁর কথার যথার্থ তাৎপর্য এইভাবেই বুঝতে হবে।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো, আমার এই আলোচনা এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, এবং হয়তো তাই কিছুটা এলোমেলো। তবু আশা রাখি, এই শিথিলতার মধ্যেও আমার বক্তব্যের মূল সুরটির আভাস হয়তো পাওয়া যাবে।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

৩.

প্রদীপ বসু বলেছেন, 'শেফালী মৈত্র তাঁর রচনায় নির্মাণ থেকে বিনির্মাণের যে ব্যাখ্যা রচনা করেছেন তা এক নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা এবং ক্লোজারও'। কথাটা ঠিকই, আমি মনে করি না কোনো বিষয়ের ক্লোজার-নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা রচনা করা যায়, সচেতন থাকলেও করা যায় না। আমার প্রবন্ধের গোড়াতেই বলা আছে, 'যুক্তিবাদী দর্শন দেকার্ত থেকে শুরু করে এই শতকের শেষ অবধি অনেক ঘাত-প্রতিঘাত অনেক আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে এসেছে, তা সত্ত্বেও তা বিনির্মাণ-বাদীদের আস্থাভাজন হতে পারছে না, কেন পারছে না, তা দেখা এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, নবপর্যায় ৩, পৃ. ১২-১৩)। অর্থাৎ র‍্যাশনালিস্ট ট্র্যাডিশনের নানান ভাঙাগড়ার কাহিনী ব'লে দেখাতে চেয়েছি, কেমন করে তাঁরা আধুনিক পর্যায়ে এসেছেন— যে-পর্যায়ে র‍্যাশনালিস্টরা মনে করেন, পুরোনো দিনের অ্যান্টিফাউন্ডেশনাল অভিযোগ তাঁরা খণ্ডন করতে পারেন। এ সত্ত্বেও তাঁরা এখনও আক্রান্ত— বিনির্মাণবাদীরা এখনও এঁদের দর্শনে ক্লোজার দেখেন— নিছক ক্লোজার নয়, লোগোসেন্ট্রিক ক্লোজার। বিনির্মাণবাদীদের অভিযোগ যেসব দার্শনিকদের বিরুদ্ধে, তাঁরা প্রায় সকলেই এই আপত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ অথবা উদাসীন। 'নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ'-এর উদ্দেশ্য, এঁদের একটু নাড়া দেওয়া, কিছুটা অপরিচয়ের বোরখা সরানো। প্রদীপ বসু ঠিকই বলেছেন, 'এও এক আখ্যানের রচনা যা একই সঙ্গে এক টেলোস-এরও ইঙ্গিতবাহী'। এই আখ্যানে বিনির্মাণ তথা দেরিদার বিশদ বিবরণ না থাকায় কল্যাণ সেনগুপ্তর মতো আরও অনেকেরই প্রত্যাশা পূরণ না হওয়াই স্বাভাবিক। আমার প্রবন্ধের শিরোনাম এই প্রত্যাশা জাগানোর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

এই প্রবন্ধে লোগোসেন্ট্রিজ়ম-এর খুব সংকীর্ণ অর্থ ধরে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে— লোগোস বলতে বোঝানো হয়েছে : রিজ়ন। এই সংকীর্ণ অর্থে দেরিদাও কখনো কখনো কথাটা ব্যবহার করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে উনি লোগোস, রিজ়ন আর ডিস্‌কোর্সকে সমার্থক বলেছেন।[১] আমার সীমিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এটুকু নিয়েই কাজ করেছি। বিনির্মাণের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লোগোসের প্রসারিত অর্থ বাদ দিয়ে অবশ্যই দেওয়া যায় না।

প্রদীপ বসু বলেছেন, বিনির্মাণের আলোচনায় (আমি বলব, পূর্ণাঙ্গ আলোচনায়) জরুরি হয়ে পড়ে ভাষা, চিহ্ন ও রচনার অবদান ; আর সেইসঙ্গে, আমাদের ভাষা সম্বন্ধে দাবি, ভাষার সঙ্গে জগতের দাবি (সম্পর্ক ?) এবং সবরকম পরোক্ষ দাবি। প্রবন্ধে এই দিকটা না থাকার ফলে আমি মনে করি, ভুল বোঝার অবকাশ থেকে গেছে। মনে হতে পারে, বিনির্মাণ মানে শুধু বিরোধ— নির্মাণের সঙ্গে সংঘাত। বিনির্মাণবাদীদের কাজে যে ইতিবাচক দিক আছে তা বর্তমান লেখায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। কোনোরকম এসেন্স, উপস্থিতি বা প্রেজ়েন্স স্বীকার না করে শব্দার্থের পৌনঃপুনিকত্ব বা ইটারেবিলিটি কী করে ব্যাখ্যা করা যায়, তা না বললে বিনির্মাণের গঠনমূলক দিক সম্বন্ধে কিছু বলাই হয় না। 'বিনির্মাণ' শব্দে 'বি' উপসর্গটির নঞর্থ-অতিরিক্ত যে একটা গঠনমূলক দ্যোতনা আছে তা অনুচ্চারিত থেকে যায়। হয়তো সেই গঠনমূলক দিকেই আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন কল্যাণ সেনগুপ্ত— দেরিদার সঙ্গে ডেভিড্‌সনের সম্পর্কের কথা ব'লে। স্যামুয়েল সি. হুইলার-এর প্রবন্ধ 'ইন্‌ডিটারমিনেসি অব ফ্রেন্চ ইন্টারপ্রিটেশন : দেরিদা অ্যান্ড ডেভিড্‌সন' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[২] এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি কল্যাণ সেনগুপ্তর কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রবন্ধ পড়ার পরেও আমি কিন্তু ডেভিড্‌সন আর দেরিদার সাযুজ্য দেখতে পাচ্ছি না। ডেভিড্‌সন আর দেরিদা উভয়েই ভাষার এসেন্স অস্বীকার করেছেন আর তাই নেসেসিটি বা আবশ্যিকতার ধারণা সম্বন্ধে তাঁদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। এঁদের সাদৃশ্য এই পর্যন্তই। এর পরে তাঁরা যাত্রা করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। ডেভিড্‌সন মানছেন, উদারম্মন্যতার নীতি আর সেইসঙ্গে বলছেন, কোনো বাক্য বোধগম্য হবে না, যদি-না বাক্যটি তাঁর দেওয়া কোহিয়ারেন্স বা সংগতির শর্ত পূরণ করে— উনি এও মনে করেন যে 'কোহিয়ারেন্স লিড্‌স টু করেস্‌পন্ডেন্স' বা সংগতির সূত্র ধরে

আমরা জগতে পৌঁছে যেতে পারি। আমার তো মনে হয় না, আমরা কোনোভাবে ডেভিড্‌সনকে দেরিদাপন্থী বলতে পারি। হুইলারও তাঁর প্রবন্ধে তা বলেন নি। হুইলার বলছেন, ডেভিড্‌সন ও দেরিদার মূল পার্থক্য ইন্টারপ্রিটেশনের আপেক্ষিকতা ব্যাখ্যায় ('ইনডিটারমিনেসি অব ইন্টারপ্রিটেশন')। ডেভিড্‌সন যেন বলছেন, খণ্ডাংশের ইন্টারপ্রিটেশন পৃথকভাবে হয় না— ব্যাখ্যা সবসময় অখণ্ড বা হোলিস্টিক হয়। এই অখণ্ড বা পূর্ণাবয়ব ব্যাখ্যার আপেক্ষিকতা একমাত্র প্রান্তদেশে থাকতে পারে ; মূল অংশে নয়। ডেভিড্‌সন মনে করেন, সব মানুষের অধিকাংশ বিশ্বাস এক এবং প্রতিটি মানুষের অধিকাংশ বিশ্বাস ঠিক, অতএব পরস্পরকে না বোঝাটা কখনোই আত্যন্তিক হতে পারে না। উপমার সাহায্যে বলা যায়, মার্জিনের কাছে কিছু অংশ যদি দুর্বোধ্য থাকেও তাতে আমাদের পরস্পরকে ঠিক বোঝায় কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। দেরিদা ইন্টারপ্রিটেশনের ব্যাপারে এমন আস্থাবান নন ; তিনি মনে করেন, অনুকূল পরিবেশেও ইন্টারপ্রিটেশনে আপেক্ষিকতা থাকতে পারে। এই ব্যাপারে দেরিদা আর ডেভিড্‌সনের পার্থক্য হুইলার প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন[৩] এবং প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন, তিনি মনে করেন না ইন্টারপ্রিটেশনের বিষয়ে ডেভিড্‌সন-এর সঙ্গে দেরিদা সহমত।[৪]

রোর্‌টির সঙ্গে দেরিদার তথা দর্শনের সম্পর্ক কী আর দেরিদার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্কই বা কী, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে, তবু কল্যাণ সেনগুপ্তকে অনুরোধ করব কতগুলো কথা বিবেচনা করতে। রোর্‌টি র‍্যাশনালিটিকে পুরোপুরি বর্ণনা বা ডেসক্রিপশানের আওতায় এনেছেন নিঃসন্দেহে কিন্তু তার সঙ্গে আর-একটা কাজও করেছেন তিনি— দার্শনিক আলোচনাকে রাজনীতির পরিমণ্ডলে এনেছেন বা রিডিউস করেছেন। তাঁর কাছে দর্শনের কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই যার বলে দর্শন আমাদের যাপনের সমস্যা সমাধানে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। মেটাফিলসফি বা অধিবিদ্যা বর্জন করে রোর্‌টি আমাদের আর-এক ধরনের দর্শনচর্চার পরামর্শ দিচ্ছেন না ; উনি বলছেন, দর্শন ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি রাজনীতির আলোচনা করতে ; কারণ আমাদের যাপনের সমস্যাগুলি মূলত রাজনৈতিক সমস্যা, দর্শনের সমস্যা নয়।[৫] তিনি মনে করেন না যে রাজনীতি র‍্যাশনালিটি-নিরপেক্ষ— অন্যান্য শাস্ত্রের মতো রাজনীতিও র‍্যাশনালিটির সাহায্য নিতে পারে। কিন্তু এই সুবাদে এইসব আলোচনা দার্শনিক আলোচনায় পর্যবসিত হয় না। অন্য পক্ষে দেরিদার কাছে, আমার মনে হয়, দর্শন খুব জরুরি। দেরিদা অবশ্যই লোগোসেন্ট্রিজ্‌ম এবং উপস্থিতি বা প্রেজেন্স বাদ দিয়েই দর্শনের কথা ভাবছেন। এই কথার সমর্থন তাঁর সাক্ষাৎকারেই রয়েছে। সেখানে উনি পরিস্কার করে বলছেন, দর্শনের বিলুপ্তি উনি চান না— চান নবীনায়ন[৬] ; রোর্‌টি চান বিলুপ্তি।

'নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ' প্রবন্ধে একটা মারাত্মক ভুল রয়েছে। 'বেগ্রিফস্‌স্রিফট'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা আছে : ফ্রেগে 'কনসেপ্ট' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'থট' শব্দটি ব্যবহার করেন (পৃ. ১৬)। ওই বাক্যটা হবে : বেগ্রিফস্‌স্রিফট বিশুদ্ধ মননের ভাষা (ল্যাঙ্গুয়েজ অব পিওর থট) ; এই ভাষা ধারণাগত বক্তব্যের প্রতিফলন (কন্‌সেপ্‌চুয়াল কনটেন্ট অব এ জাজমেন্ট)। 'বেগ্রিফস্‌স্রিফট' লেখার অনেক পরে ফ্রেগে 'বেগ্রিফ' (কনসেপ্ট বা ধারণা) আর 'গেডাঙ্কে'-এর (থট বা মনন) পার্থক্য আলোচনা করেন। ফ্রেগের মতে কন্‌সেপ্ট (বেগ্রিফ) হল একটি বিধেয়ের রেফারেন্স বা নির্দেশ ; আর থট (গেডাঙ্কে) হল একটি সম্পূর্ণ বাক্যের সেন্স বা অর্থ।

টীকা

১. 'Logocentrism, to put it in summary form is an attempt which can only ever fail, an attempt to trace the sense of being to the logos, to discourse or reason (*legein* is to collect or assemble in a discourse) and which considers writing or technique to be secondary to logos.' Raoul Mortley, ed., *French Philosophers in Conversation,* London and New York, 1991, p 104.

২. Samuel C. Wheeler III, 'Indeterminacy of French Interpretation : Derrida and Davidson', *Truth and Interpretation : Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson*, ed. by Ernest LePore, Oxford, 1986.

৩. 'The eruptions of Davidsonian indeterminacy seem to occur only at margins, since interpretation itself depends on overall agreement. Thus there can be no global breakdown while interpretation is possible. It seems that, in the best of circumstances, there is stability for Davidson's theory. According to Derrida, on the other hand, since iterability itself brings about displacement of interpretation, indeterminacy obtains even in the best of circumstances.' LePore, *Truth and Interpretation*, p. 490.

৪. 'Some brief disvowals and disclaimers will be required to show that this paper is serious as a whole, and not to be taken as an attempted demonstration that Davidson can be read as anybody's co-believer... I have ignored a great deal that is important and interesting in Derrida's work, and would not claim that his main significance is as fellow-traveler with Davidson's views of interpretation'. LePore, *Truth and Interpretation*, p. 493-94.

৫. 'The moral I wish to draw from the story I have been telling is that we should carry through on the rejection of metaphilosophical scientism... If I am right in thinking that the difference between Heidegger's and Dewey's ways of rejecting scientism is political rather than methodological or metaphysical, then it would be well for us to debate political topics explicitly, rather than using Aesopian philosophical language.

If we did, then I think that we would realize how little theoretical reflection is likely to help us with our current problems. For once we have criticized all the self-deceptive sophistry, and exposed all the 'false consciousness', the result of our efforts is to find ourselves just where our grandfathers suspected we were : in the midst of a struggle for power between those who currently possess it... and those who are starving or terrorized because they lack it. Neither twentieth-century Marxism, nor analytical philosophy, nor post-Nietzschean 'continental' philosophy has done anything to clarify this struggle.' Richard Rorty, 'Phlosophy as Science, as Metaphor, and as Politics', *Essays on Heidegger and Others : Philosophical Papers*, vol. II, Cambridge, 1991, pp. 25-6.

৬. 'I am not among those who say that philosophy is finished. Even when I talk about the closure of logocentrism, and the closure of metaphysics, I make a distinction between closure and end : I think that the conclusion that philosophy has reached its conclusion, come to its term, is a dangerous thing and a thing which I would resist. I think that philosophy has, *is*, the future, but for the moment it has to give its consideration to that which has enclosed it, a set of finite possibilities.' Raoul Mortley, *French Philosophers in Conversation*, p. 106.

শেফালী মৈত্র

প্রামাণিক ইংরেজি-বাংলা অভিধানের দিকে

বিশ্বভারতী পত্রিকার নবপর্যায় ২ : কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় অশোক মুখোপাধ্যায় 'শব্দকোষ : ইংরেজি থেকে বাংলা' এবং মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় পিনাকী মিত্র 'প্রামাণিক ইংরেজি-বাংলা অভিধানের দিকে' শীর্ষক দুটি রচনায় ইংরেজি-বাংলা অভিধানের উদ্দেশ্য নীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অশোক মুখোপাধ্যায় ঢাকার বাংলা একাডেমী -প্রকাশিত জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী -সম্পাদিত *Bangla Academy English-Bengali Dictionary* বইটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পিনাকী মিত্র তারই সূত্র ধরে মূল কথাটি বলতে চেয়েছেন। 'সমার্থশব্দকোষ' নামের বিখ্যাত অভিধানের সংকলক হিসেবে অশোক মুখোপাধ্যায় সুপরিচিত। তাঁর অভিধানচিন্তা সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু পিনাকী মিত্রের নাম পাঠকদের কাছে তেমন পরিচিত হওয়ার কথা নয়। প্রখর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং বহুভাষাবিদ এই মানুষটির এক টুকরো রচনা পাঠকদের সামনে হাজির করে বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক আমাদের সবার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অশোক মুখোপাধ্যায় ও পিনাকী মিত্রের আলোচনার উপলক্ষ উপরোক্ত ইংরেজি-বাংলা অভিধানটি। কাজেই আগে ওই অভিধানটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলাই ভালো। অভিধানটি সম্পর্কে আমিও কিছু আলোচনা অন্যত্র করেছি। তার পুনরাবৃত্তি না করে বরং যা সেখানে বলি নি সেই রকম দু-একটি কথা তুলব।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক তাঁর প্রসঙ্গ-কথায় লিখেছেন যে, যেখানে অন্যান্য ইংরেজি-বাংলা অভিধান ইংরেজি ভাষার 'বিশেষ ভঙ্গি বা রীতির অর্থান্তর করেই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে', সেখানে এই অভিধানটিতে প্রয়োগের প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষার্থীর কাজ অনেক সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এটা মস্ত বড়ো দাবি। কিন্তু এই অভিধানেও সত্যি সত্যি সেটা পুরোপুরি করে ওঠা যায় নি। যেমন, *cat, catch* এই দুটি মুখশব্দের ভিতরে কিছু প্রয়োগবাক্য থাকলেও তারই কাছাকাছি *cast* - এ খুব-একটা নেই। আবার *set (verb)* -এ বেশ-কিছু দৃষ্টান্তবাক্য থাকলেও *sale* -এ নেই। কিছুটা যান্ত্রিকভাবে অনুবাদের ফলে এই অভিধানে অর্থের বিবৃতি অনেক জায়গায় যে বেশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে তা অশোক মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন। শুধু যান্ত্রিকতাই নয়, অন্য গোলমালও আছে। অনেক ক্ষেত্রে সংকলক অস্বাভাবিক বাংলা লিখেছেন। ১৫৮ পাতায় *choice*-এর মধ্যে লেখা হয়েছে— অসাধারণ ভাবে ভালো। 'ভাবে' কেন ? অসাধারণ ভালো লিখলেই তো স্বাভাবিক হয়। ২৭৭ পৃষ্ঠায় এই বাক্যাংশটি দেখতে পাচ্ছি— জবরদস্তি করে বা ভয় দেখিয়ে কাউকে কোনো কিছু করতে বাধ্যকরণ। শেষের ওই বাধ্যকরণ শব্দটাই গোল বাধিয়েছে। ৪৬৩ পাতায় *inebriation*-এর মানে হিসেবে লেখা হয়েছে, মাতলামি, মদোন্মত্ততা, শৌণ্ডত্ব, প্রামাদ্য। শেষ দুটি শব্দের বদলে অনায়াসে লেখা যেত মত্ততা, প্রমত্ততা, নেশাগ্রস্ততা, মত্তাবস্থা ইত্যাদি। বানান ভুলও (না কি ছাপার ভুল ?) যে নেই তা নয়। ৯৯১ পৃষ্ঠায় *trespass*-কে *tresspass* করা হয়েছে। একই শব্দের দুটি রূপ বা দুটি বানান যেখানে ব্রিটিশ ও মার্কিন দেশের প্রয়োগের পার্থক্যের জন্যে সেখানে প্রায়ই সেই পার্থক্য উল্লিখিত হলেও সর্বত্র হয় নি। ২৫২ পাতায় *disc, disk* -এর দ্বিতীয়টি যে মূলত *US* রীতির তা বলা হয় নি। ১৫৯ পাতায় *christmas*- কে ক্রিসমাস বলা হয়েছে, ঠিকই বলা হয়েছে। কিন্তু ২৯৭ পাতায় *eve* মুখশব্দে লেখা হয়েছে : খ্রিস্টমাস ইভ। স্ট কেন ? ২৬৬পাতায় *dove* মুখশব্দে প্রথম অর্থ পাচ্ছি : ঘুঘু, পায়রা। অর্থাৎ ঘুঘু এবং পায়রা সমার্থক। পায়রা কলুম্বিদী গণের পাখি, প্রজাতির নাম কলুম্বা লিভিয়া। ঘুঘুও কলুম্বিদী গণের পাখি হলেও ভিন্ন প্রজাতির পাখি। সাধারণভাবে ইংরেজিতে অনেকে এই দুটি পাখিকে অভিন্ন ভাবলেও প্রকৃতপক্ষে এরা ভিন্ন। কয়েকটি শব্দের মানে বুঝতে পাঠক হিমসিম খেয়ে যাবেন। ৬০৬ পাতায় *noumenon* -এর বিবৃতি আছে। এটি অত্যন্ত অপ্রচলিত একটি শব্দ। কনসাইজ্ অক্সফোর্ডের কোনো সংস্করণেই নেই, অ্যাডভান্সড লার্নার্জ-এর কোনো সংস্করণে নেই, কোবিল্ডে নেই, লংম্যানে নেই। আছে চেম্বার্সের ১৯৬৪ সালের সংস্করণে। কী অর্থ পাচ্ছি এর ? দেখুন, পাঠক পরিষ্কার বুঝতে পারেন কিনা— সমস্ত প্রাতিভাসিক গুণাগুণবর্জিত, বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক স্বজ্ঞার বিষয়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ঢাকার, বাংলা একাডেমীর এই অভিধানটির ব্যবহারযোগ্যতা সংশয়াতীত। প্রয়োজনীয় শব্দ সব না হলেও অধিকাংশই পাওয়া যাবে এতে। সিলেবলের ভাগ, উচ্চারণ নির্দেশ, অর্থের বিবৃতি কাজ চালিয়ে দেবার পক্ষে মন্দ নয়। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ড্যানিয়েল জোনজ্-এর নির্দেশিত উচ্চারণের সঙ্গে তফাত দেখা যায়। তবে সেটা বড়ো কিছু নয়। বাংলা হরফে উচ্চারণ-নির্দেশের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে তা খুব একটা সরল নয়। এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও বলি IPA বা আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার ব্যবহার এসব ক্ষেত্রে অধিকতর কাম্য। এই প্রসঙ্গে পরে বলছি।

অনিবার্যভাবে এই অভিধানটির সঙ্গে সংসদের ইংরেজি-বাংলা অভিধানের তুলনা এসে পড়বে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে কেবল কয়েকটা সাদৃশ্য ও পার্থক্যের কথা বলা যাক। সংসদের অভিধানটির বয়স ছত্রিশ বছর। ইতিমধ্যে কয়েকটি পরিমার্জিত সংস্করণ হলেও বিবৃতিতে সাধুভাষার ব্যবহার এখনও অব্যাহত। এদিক থেকে ঢাকার অভিধানটি এগিয়ে গেছে, বিবৃতিতে, চলিত বাংলা ব্যবহার ক'রে। ঢাকার অভিধানে শব্দনির্বাচন হয়েছে অ্যাডভান্সড লার্নার্জ ডিকশনারির অনুসরণে, অশোক মুখোপাধ্যায় তাও দেখিয়েছেন। সংসদের অভিধানে শব্দনির্বাচনে চেম্বার্স ডিকশনারির উপরই বেশি নির্ভর করা হয়েছে। শব্দের অন্তর্ভুক্তিতে সংসদের অভিধান অবশ্যই বেশি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। সেটা বোঝা যায় যখন দেখি *kolkhoz, kris, grig, unseasonable, deltoid, gravid, dud, lacustrine* প্রভৃতির মতো অতিপ্রয়োজনীয় শব্দ ঢাকার অভিধানে নেই, সংসদে আছে। অভিধানে অন্তর্ভুক্ত ফরাসি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশে সংসদ সচরাচর ফরাসি উচ্চারণ রেখেছে, ঢাকার অভিধানটিতে আছে ব্রিটিশ উচ্চারণ। যেমন *ensemble* শব্দের উচ্চারণ সংসদে আঁসাঁব্‌ল্, ঢাকার অভিধানে অনসম্‌ব্‌ল। ঢাকার অভিধানের ব্যবহার-বিধিতে বলা হয়েছে যে উচ্চারণ নির্দেশে সংকলকরা অনুসরণ করেছেন ডেন্ট-প্রকাশিত এবং A.C. Gimson -সম্পাদিত *English Pronouncing Dictionary* -কে। মূল অভিধানটি যে Daniel Jones -এর করা তার উল্লেখ নেই কেন বোঝা গেল না। কেননা এই বিশ্ববন্দিত ইংরেজি উচ্চারণ অভিধানটি Daniel Jones -এর নামেই চলে। তাঁর মৃত্যুর পরে এটি সম্পাদনা করেছেন Gimson। যাই হোক, এখানে বলার কথা এই যে দুটি অভিধানের কোনোটিতেই IPA ব্যবহৃত হয় নি, দুটিতেই বাংলায় উচ্চারণ দেখানো হয়েছে। সংসদের অভিধানে অধিকন্তু রোমান হরফেও উচ্চারণ দেখানো হয়েছে। শ্বাসাঘাত দেখাবার জন্য সংসদে ব্যবহৃত হয়েছে শূন্যচিহ্ন বা ডিগ্রি চিহ্ন, ঢাকার অভিধানে প্রধান শ্বাসাঘাত দেখানো হয়েছে শ্বাসাঘাতযুক্ত সিলেবলের আগে 'উত্তোলিত তিলকচিহ্নের মাধ্যমে' এবং অপ্রধান শ্বাসাঘাত দেখানো হয়েছে 'অবনমিত তিলকচিহ্নের সাহায্যে'। সামগ্রিক বিচারে ঢাকার অভিধানটি আধুনিকতর। কিন্তু সংসদের অভিধান বেশি কাজের। একটি মুখশব্দের ভিতরে সম্পর্কিত ও আনুষঙ্গিক শব্দ ওই অভিধানে ঢাকার অভিধানের চেয়ে অনেক বেশি এবং এটাই দুটি অভিধানের মধ্যে বড়ো পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

জিল্লুর রহমান এবং সহযোগীরা যে অভিধান সংকলন করেছেন তারই প্রসঙ্গে অশোক মুখোপাধ্যায় ও পরে পিনাকী মিত্র সাধারণভাবে একখানি ইংরেজি-বাংলা অভিধান সংকলনের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। সেগুলি সত্যিই বিবেচনার যোগ্য। পিনাকী মিত্র ঠিকই বলেছেন, ইংরেজি-বাংলা অভিধানটি কেমন হবে তা নির্ভর করবে কোন্ উদ্দেশ্যে কাদের জন্য অভিধানটি রচিত হবে তার উপর। একখানি ইংরেজি-বাংলা অভিধান রচনার নীতি নির্ধারণ করতে হলে মূলত চারটি বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। এই চারটি হল— ১. উদ্দেশ্য এবং মডেল, ২. শব্দ নির্বাচনের রীতি, ৩. অর্থের বিবৃতি, ৪. উচ্চারণ নির্দেশ। এক-এক করে এই চারটির প্রসঙ্গে কিছু বলি।

উদ্দেশ্য ও মডেলকে একই সঙ্গে বিবেচনা কেন করছি, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এর সহজ উত্তর এই যে অভিধানটির উদ্দেশ্য কী, উদ্দিষ্টই বা কারা তার উপরই নির্ভর করবে মডেলটি কী হবে বা কোন্ অভিধান

হবে বা আদৌ বিশেষ কোনো অভিধানকে মডেল করা যাবে কি না। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও তাঁর সহযোগীরা যে-অভিধান প্রণয়ন করেছেন কিংবা সংসদের *English- Bengali Dictionary* যেভাবে সংকলিত হয়েছে তাতে মনে হয় না নিছক 'কেজো' ধরনের অভিধান তাঁদের অন্বিষ্ট। যদি যুগপৎ ইংরেজি ভাষার চর্চা, ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা এবং ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞান ও বিদ্যার বিভিন্ন দিকের চর্চার সহায়ক একখানি অভিধান প্রণয়নই উদ্দেশ্য হয়, তবে অবশ্যই এই অভিধানে প্রচুর ভাষাতাত্ত্বিক ডিটেলের প্রয়োজন নেই। বরং ভাষার ব্যাবহারিক দিকটি অর্থাৎ প্রয়োগের দিকটিই বেশি সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। এক-একটি এন্ট্রি বা মুখশব্দের মধ্যে প্রয়োজনমতো phrasal verbs, idiomatic expressions ইত্যাদির বিবৃতি থাকা দরকার। বহু পাঠক শুধু ইংরেজি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অর্থ ও প্রয়োগই দেখে নিতে চান না। তাঁরা ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের সহায়ক হিসেবেও এমন একটি অভিধান দেখেন। এবং শুধু আলোচনামূলক ইংরেজি রচনারই অনুবাদ নয় অবশ্যই, গল্প-উপন্যাস-কবিতার মতো রচনার বাংলা অনুবাদেও এই অভিধানকে যথার্থ সহায়ক হয়ে উঠতে হবে। কাজেই মডেলের প্রসঙ্গে এবং নীতির বা পদ্ধতির প্রশ্নে এই কথাটিকে বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে।

এবারে মডেলের প্রসঙ্গ। কোন্ অভিধানের কোন্ সংস্করণকে মডেল ভাবা হবে, সে-সম্পর্কে পিনাকী মিত্র চমকে দেবার মতো একটা কথা বলেছেন। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। সাধারণভাবে আমরা জানি যে কনসাইজ্ অক্সফোর্ড ডিকশনারির (COD) আমূল ও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে ষষ্ঠ সংস্করণের পর থেকে, বিশেষত সপ্তম ও বর্তমানের অষ্টম সংস্করণ দেখে যেন এটিকে চেনাই যায় না। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ IPA-তে দেখানো হয়েছে, ভিতরের বিভিন্ন অর্থগুলোকে 1, 2, 3, 4 এইভাবে সাজানো হয়েছে, কখনো-কখনো একই অর্থের সামান্য পার্থক্য বোঝাতে 1a, 1b এইভাবেও দেখানো হয়েছে। একই মুখশব্দের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শব্দগুলোকে bold type -এ রাখা হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক তথ্য আরও বেশি সংযোজিত হয়েছে। অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা অনুসারে এতে সংযোজিত হয়েছে প্রায় চল্লিশ রকমের তথ্য। হর্নবি-র *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (OALD) -এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৪ সালে এবং বর্তমানে যেটি চালু সেটি এর চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। এই অভিধানটিও আদ্যন্ত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। এতেও দ্বিতীয় সংস্করণের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অনেকটাই পরিত্যক্ত হয়েছে। দুটি অভিধানই এখন অনেক আধুনিক, অনেক প্রয়োজনসাধক। তবু কেন পিনাকী বললেন, COD-র পঞ্চম এবং OALD-র দ্বিতীয় সংস্করণই ইংরেজি-বাংলা অভিধানের মডেল হওয়া উচিত? এর জবাবও পিনাকী দিয়েছেন। আসলে ইংরেজি-বাংলা অভিধানের পাঠক কী চাইবেন, কী চাইতে পারেন, তা বিচার করেই মডেল স্থির করতে হবে। সেদিক থেকে পিনাকী ভুল বলেন নি। যাঁরা উচ্চশিক্ষিত বা শিক্ষাভিমানী, যাঁরা ইংরেজি ভাষাটাই চর্চা করতে চান, তাঁরা তো মূল COD বা OALD-ই দেখবেন। তাঁদের পক্ষে ওই দুই অভিধানের নতুন সংস্করণই উপযুক্ত হবে। কিন্তু যাঁরা ইংরেজি-বাংলা অভিধানটিকে তাঁদের বাংলা লেখারও কাজে লাগাতে চাইবেন তাঁদের পক্ষে ওই চল্লিশ রকমের তথ্য অবশ্যই বাহুল্য হবে। এঁদের কথা মনে রেখে অভিধান লিখতে হলে COD-র পঞ্চম সংস্করণ বা OALD-র দ্বিতীয় সংস্করণকে সাধারণভাবে মডেল হিসেবে দেখা যেতেই পারে।

তবে ঠিক এখানেই আমার একটি সংযোজনের প্রস্তাব আছে। আগেই বলেছি, বহু শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের সহায়ক একখানি উত্তম অভিধানের খোঁজ করেন। এবং এও বলেছি যে শুধু আলোচনামূলক ইংরেজি রচনার অনুবাদ নয়, গল্প-উপন্যাসের অনুবাদেরও সহায়ক হতে হবে ওই অভিধানকে। এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সংসদের *English-Bengali Dictionary* এবং ঢাকার এই *English-Bengali Dictionary* দুটিতেই একটা ফাঁক থেকে গেছে। ইংরেজি ভাষায় অজস্র কথ্য পর্যায়ভুক্ত informal শব্দ এখন অভিধানে চিহ্নিত হচ্ছে। COD ও OALD-র নতুন সংস্করণগুলিতে বহু informal শব্দের বিবৃতি

আছে যা আগেকার সংস্করণে ছিল না। উদাহরণস্বরূপ দেখাই— *get the push* এই কথাটা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী রাখেন নি। আর *jalopy* একটা কথ্যরীতির শব্দ, OALD-র নতুন সংস্করণে একে informal বলা হয়েছে। সিদ্দিকীর অভিধানে এটাও নেই। নেই এমনি আরও অনেক informal শব্দ। সাধারণভাবে যে অভিধানের যে সংস্করণকেই মডেল করা হোক-না কেন, ইংরেজি-বাংলা অভিধানে এই ধরনের শব্দ থাকা একান্তই উচিত।

এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা নিশ্চয় অসংগত হবে না যে এক-একটি মুখশব্দের বিবৃতি কেমন হবে তার মডেল হোক COD-র পঞ্চম সংস্করণ কিংবা OALD-র দ্বিতীয় সংস্করণ। পিনাকী-র এই বক্তব্য নিশ্চয় মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু শব্দের অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে এই দুটি অভিধানের এই দুটি সংস্করণ কিংবা অন্য কোনো একটি বা দুটি অভিধানের উপরই যান্ত্রিকভাবে নির্ভর করা ঠিক হবে না। কেননা সে ক্ষেত্রে ইংরেজিতে স্বীকৃতি পেয়েছে বা স্বীকৃতিযোগ্য বহু ভারতীয় বা এশীয় শব্দ বাদ পড়ে যাবে। যেমন : *choga, carcoon, chalan, hadis, haveli, kafila* প্রভৃতি শব্দের কথা মনে রাখতে হবে। এই ধরনের বহু শব্দ কোনো কোনো অভিধানে এসে গেলেও অনেক অভিধানে নেইও। অথচ অমিতাভ ঘোষ, শোভা দে, উপমন্যু চট্টোপাধ্যায়, নীরদ সি. চৌধুরী প্রভৃতির রচনায় এইসব শব্দ প্রায়ই দেখতে পাই। *All of a heap* এই শব্দবন্ধটি নীরদ সি.-র খুবই প্রিয়, তাঁর বইয়ে একাধিকবার এটি দেখা গেছে, শেষবার *Thy Hand Great Anarch*-এ। মজার ব্যাপার, COD-র কোনো সংস্করণে, এটি নেই, *heap* বা *all* কোনো এনট্রিতেই নেই। OALD-র দ্বিতীয় সংস্করণে *be struck all of a heap* এইভাবে আছে, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে বাদ গেছে। *Chambers' Twentieth Century Dictionary*-তে কিন্তু *all of a heap* আছে, ওইভাবেই আছে।

ইংরেজি-বাংলা অভিধানের শব্দনির্বাচন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজে কোনো একটি অভিধানের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে না। আগেই দেখেছি কোনো-কোনো শব্দ COD-তে নেই, OALD-তে নেই, *Chambers'* এ আছে। আবার কোনো-কোনো শব্দের বেলায় উলটোটাও হতে পারে। COD-তে *lumpen* আছে, OALD-তে নেই, *Chambers'* -এ নেই, *Longman*-এ নেই। *Pedentous* COD-তে নেই, OALD-তে নেই, Longman -এ নেই, আছে *Chambers'*-এ। আবার *Kukri, Kolkhoz, Kulak, Kris* প্রভৃতির মতো অনিংরেজি শব্দ কেবল COD-তেই লভ্য, এগুলো পাওয়া যাবে না OALD-তে কিংবা *Longman*-এ কিংবা *Chambers'*-এ।

এবারে আমাদের তৃতীয় বক্তব্য, অর্থের বিবৃতির প্রসঙ্গ। অর্থের বিবৃতির প্রসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে অভিধানটি English-Bengali? না কি English-Bengali-English? সংসদের অভিধানটিতে প্রতিটি ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থের পাশাপাশি ইংরেজি সমার্থক শব্দও বিবৃত হয়েছে। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর অভিধানে কেবল বাংলা অর্থই আছে, ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই। সাধারণভাবে ইংরেজি-বাংলা অভিধানে প্রতিটি শব্দের বাংলা অর্থই যথেষ্ট মনে করি। তার সঙ্গে ইংরেজি সমার্থক শব্দ রাখা অনাবশ্যক বাহুল্য। তবে, যেহেতু এই অভিধান দ্বিভাষিক এবং শিক্ষিত বাঙালি পাঠককে ইংরেজি শব্দের অর্থ বুঝতে সাহায্য করবে এবং ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদকর্মে সাহায্য করবে, তাই এতে শুধু ব্যাখ্যামূলক বাংলা অর্থই যথেষ্ট নয়, প্রতিটি শব্দের অর্থের পাশাপাশি কিছু সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ রাখা একান্তই প্রয়োজন।

সবশেষে উচ্চারণ নির্দেশের প্রসঙ্গ। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর অভিধানে বাংলা হরফে উচ্চারণ দেখানো হয়েছে। তার জন্য কিছু চিহ্ন উদ্‌ভাবন করতে হয়েছে, কিছু পুরোনো চিহ্নকে অন্য অর্থ দেওয়া হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে খণ্ডিত বা ছোটো মাপের আ-কার, ছোটো পয়েন্টের হরফ, দন্তৌষ্ঠ্য /f/ ধ্বনির জন্য নীচে ফুটকিযুক্ত ফ, ব্যবহৃত হয়েছে তিনটি জ— সাধারণ জ, একটি-বিন্দুযুক্ত জ ও দুটি-বিন্দুযুক্ত জ ; দন্তৌষ্ঠ্য /v/ বোঝাতে বিন্দুযুক্ত ভ, নীচে চিহ্নযুক্ত থ ও দ প্রভৃতি। অশোকবাবু বলেছেন যে এই পদ্ধতিটিকে একটু ঘষামাজা করে অন্য ভাষার উচ্চারণও বাংলায় লেখার একটা সাধারণ রীতি হয়ে উঠতে পারে। তা তো পারেই।

কিন্তু ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ এভাবেও নির্ভুলভাবে দেখানো যায় না। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক লিপিতে (IPA) একটি চিহ্ন একটি ধ্বনি— এই নীতির কোনো ব্যত্যয় নেই। কিন্তু বাংলা হরফে তা করে ওঠা যায় না। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীও পারেন নি। দু-একটা উদাহরণ দেখা যেতে পারে। ইংরেজি *furbish* শব্দটির উচ্চারণ বাংলায় লিখতে গিয়ে /ɛ/ ধ্বনিটির জন্য খণ্ডিত বা ছোটো আ-কার ব্যবহার করেছেন। আবার /ə/ এই ধ্বনিটির জন্যও অন্যত্র খণ্ডিত বা ছোটো আ-কার ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ একই চিহ্ন দিয়ে দুটি ধ্বনিকে বোঝানো হয়েছে। এটা কিন্তু কাম্য নয়। আবার দেখুন *gecko* শব্দের উচ্চারণ বাংলায় লেখা হয়েছে— গেকৌ। IPA-র উচ্চারণের সঙ্গে বেশ তফাত দেখা যাচ্ছে। যে-কোনো বাঙালি তাঁর অভ্যাসমতো কৌ উচ্চারণ করলে সেটা মোটেই ইংরেজি উচ্চারণের অনুরূপ হবে না। কাজেকাজেই IPA-তে উচ্চারণ নির্দেশ করাই সঠিক উপায়। সঙ্গে আপাতত বাংলা হরফেও উচ্চারণ লেখা যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত IPA-র উপরই ভরসা করতে হবে। IPA অনেকেই জানেন না, IPA-তে অনেক পাঠকই অভ্যস্ত নন এই আপত্তি উঠতেই পারে। আমাদের যুক্তি এই যে IPA-র অপেক্ষাকৃত সরল একটা পদ্ধতি Daniel Jones -এর অভিধানে ব্যবহৃত হয়েছিল যেটা তাঁর মৃত্যুর পরে Gimson -এর সম্পাদনায় কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা চাই সেই সরলীকৃত পদ্ধতি ইংরেজি-বাংলা অভিধানে ব্যবহৃত হোক। পাঠককে তা অবশ্যই শিখে নিতে হবে। কিন্তু সেটা এতই সহজ যে কোনো মনস্ক পাঠকেরই সেটা বুঝে নিতে তেমন অসুবিধে হবার কথা নয়। আর সিদ্দিকী যে বাংলা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন সেটাও কি খুব-একটা সরল ব্যাপার? সেটাও তো পাঠককে শিখে বুঝে নিতে হচ্ছে। তা শিখতে যদি হয়ই, তো IPAই বা নয় কেন?

সুভাষ ভট্টাচার্য

একটি সাম্প্রতিক বিতর্ক এবং আমাদের কথাপট

শ্রীসৌরীন ভট্টাচার্য ও শ্রীসব্যসাচী দেবের চিঠির জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। সৌরীনবাবুর পত্রের স্বরটি স্নিগ্ধ, তাঁর বক্তব্যও সুচিন্তিত। 'নির্বাসন', 'স্বর-প্রস্বর' প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন তিনি— তাঁর বক্তব্যে আমিও দু-চার কথা যোগ করতে চাই। আমার লেখায় 'আক্রান্তের অভিমান' হয়তো ছিল, তা যদি বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে থাকে তবে তা দুঃখের বিষয় তো বটেই।

'তর্ক'ও 'তর্কের বেনোজলে'র মধ্যে যে ফারাক তিনি হিসেব করেছেন, তাও মানি। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার তাঁর সঙ্গে সামান্য মতপার্থক্য আছে : আলোচনায় ভুল বোঝার অবকাশ থাকবেই। নিজের বক্তব্য বোঝানোর যতই চেষ্টা করি-না কেন, বা নিজেই যত ভালো করে বুঝি-না কেন, ভাষার নিজস্ব নিয়মেই বোঝার আলোটুকুকে ঘিরে থাকে না-বোঝার ছায়া আর প্রচ্ছায়া। সুতরাং কেজো কথার মধ্যেও কিছু অকাজের কথা ঢুকে পড়বে। কিছু কথায় হয়তো সাময়িক উষ্মা হবে কারো। যেমন হয়তো এজাজের কথায় আমার বা আমার কথায় সব্যসাচীবাবুর হয়েছে— তাতে কিছু বেনোজলও ঢুকবে তর্কে। আবার এই বেনোজল সরানোর চেষ্টাও করতে হবে— এ-ক্ষেত্রে আমি সৌরীনবাবুর-ই পক্ষে (যদি সৌরীনবাবুর মতোই 'দুমুখো' কথা বলা যায়)। দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন এইটে নিশ্চিত করা যে তর্কটা যেন চলতে থাকে, বিভিন্ন মতামতের উন্মুক্ত হাওয়ায় যেন আমরা নিশ্বাস নিতে পারি ; কেউ যেন শাসনশক্তির বলে আইন করে তর্কের সম্ভাবনাটাই বাতিল করে না-দেন। তাই তর্কও চলবে, কিছু বেনোজলও ঢুকবে, তা সরানোর প্রচেষ্টাও করতে হবে— এইরকম দ্বন্দ্বসংকুল অবস্থার মধ্যে একটি সত্যই আমাদের আলোকবর্তিকা হতে পারে ; তা হল এই যে আমাদের কারোই 'শেষ উত্তর' বলে কিছু জানা নেই।

এই মনোভাব নিয়েই সব্যসাচীবাবু ও সৌরীনবাবুর 'সংলাপে' যোগ দিচ্ছি। সব্যসাচীবাবু অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলেছেন, এই চিঠির প্রথমাংশে তার জবাব দেব। সব্যসাচীবাবুর প্রশ্নগুলি বেশির ভাগই ইংরেজিতে যাকে বলে rhetorical— ভঙ্গিটা প্রশ্ন করার কিন্তু বোঝাই যায় সঠিক উত্তর সবই প্রশ্নকর্তার জানা আছে। প্রশ্নগুলি বাগ্‌যুদ্ধের অস্ত্রমাত্র। কিন্তু কয়েকটি বড়ো প্রশ্ন সব্যসাচীবাবুর চিঠিতেও উঠেছে। তা নিয়ে আমার এই চিঠির শেষাংশে আলোচনা করব। স্বভাবে আমি যিশু নই, ফলে 'অপর গাল এগিয়ে দেবার' নীতি অনুসরণ করব না। সব্যসাচীবাবুর কূটভাষের জবাবে আমায় কিঞ্চিৎ তার্কিকতা করতে হবে। তাই চিঠির এই অংশের অনুশিরোনাম করা গেল : 'কূট-কচালে কথা'। পাঠকের ধৈর্যের ওপর চাপ যদি পড়ে তো আগেই মার্জনা চেয়ে রাখি।

সব্যসাচীবাবুর সংশয়াবলী : কিছু কূট-কচালে কথা

সব্যসাচীবাবু লিখেছেন, 'সংশয় জাগছে দীপেশের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।' প্রসঙ্গত লক্ষণীয় এই এজাজ় আহ্‌মদের বই *(In Theory)*, যা আমার রচনাটির একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়, তা নিয়ে সব্যসাচীবাবুর কোনো 'সংশয়' আছে কিনা তাঁর পত্রে তার কোনো ইঙ্গিত মেলে না। তিনি লিখেছেন বটে যে তিনি 'এজাজ় আহ্‌মদের রচনার হয়ে সাফাই গাইতে' চাইছেন না। এমন-কি 'দলীয় কর্মসূচীর আদলে' তৈরি 'মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক রচনায়' যে 'সাদা-কালো' ও 'অসহিষ্ণু' বিচারের প্রবণতা দেখা যায়, তাকে সব্যসাচীবাবু সমালোচনার যোগ্যই মনে করেন কিন্তু এজাজ়ের বইটি এই ধরনের সমালোচনাযোগ্য রচনার গোত্রভুক্ত কিনা সে-বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি সব্যসাচীবাবু। বরঞ্চ তাঁর আলোচ্য বিষয় : 'দীপেশের দৃষ্টিভঙ্গি'। ফলে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আমি 'নাইয়া' পত্রিকার সঙ্গে কথোপকথনে কী বলেছি, তা-ও আলোচনার মধ্যে নিয়ে এসেছেন সব্যসাচীবাবু।

সব্যসাচীবাবুর প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার পথে দুটি প্রধান অন্তরায় আছে। প্রথমত, আমার 'দৃষ্টিভঙ্গি' কী, তা নিয়ে সেটুকুই আলোচনা করব যেটুকু আমার এই 'দরবারি চিন্তা' শীর্ষক প্রবন্ধে সরাসরি উপস্থিত। অন্যথায় বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। দ্বিতীয় অন্তরায়, সব্যসাচীবাবুর পাঠাভ্যাস। এমন অনেক প্রশ্ন তুলেছেন তিনি যা এ-ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক (যদিও প্রশ্নগুলি অন্য বা বৃহত্তর প্রসঙ্গে জরুরি হতেই পারে)। আমার ঘাড়ে অনেক সিদ্ধান্ত চাপিয়েছেন তিনি যা আমার নয়। তাঁর চিঠি পড়ে বুঝেছি যে সব্যসাচীবাবু— অন্তত এই পত্রের রচয়িতা সব্যসাচীবাবু— অত্যন্ত অমনোযোগী পাঠক। অমনোযোগী পাঠকের সঙ্গে তর্ক করা শক্ত। মনে পড়ে, ই.পি. টমসন এক সময় অমনোযোগী সমালোচনার সামনে নিজেকে অসহায় বোধ করে লিখেছিলেন : 'It is difficult to anticipate problems of readers who are inattentive...'(E.P. Thompson, *Whigs and Hunters : The Origin of the Black Act,* Harmondsworth, Middlesex, 1977, p. 302).

শুধু যে আমার প্রবন্ধই সব্যসাচীবাবু অমনোযোগের সঙ্গে পড়েন তা নয়, এমন-কি এজাজ়ের বইটিও তিনি মন দিয়ে পড়েছেন ব'লে মনে হয় না। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, এজাজ় কেন তাঁর দীর্ঘকাল আমেরিকায় অধ্যাপনার কথা বেমালুম চেপে গেলেন ? (এজাজ়ের বইটির অংশবিশেষ আমেরিকায় থাকতেই লেখা।) সব্যসাচীবাবু বক্রোক্তি করে বলেছেন : 'বইটি এজাজ়ের আত্মজীবনী নয়, তাই সব তথ্য জানানোর দায় তাঁর ছিল না। আর এই ইতিহাসটি প্রয়োজনীয় হত যদি এজাজ়ের চিন্তাভাবনার বিকাশে তার কোনো ভূমিকা থাকত।' তার পর এসেছে সব্যসাচীবাবুর সেই চূড়ান্ত শ্লেষ : 'তা না হলে কে আমেরিকায় পড়িয়েছেন, কে অস্ট্রেলিয়ায় পড়ান, তা জানার বা জানানোর বাধ্যতা কী ?'

আহা, যদি টমসনের মতো তাঁর সমালোচক সম্বন্ধে বলতে পারতুম : 'Scholarship, wit and the judicious savouring of evidence... all combine' (Thompson, *Whigs and Hunters,*

p. 309)। কিন্তু তার উপায় নেই। সব্যসাচীর উক্তিতে বিদ্রূপ আছে কিন্তু 'judicious savouring of evidence'-এর কোনো লক্ষণ নেই। এজাজের বইটির যদি প্রথম দুটি অধ্যায়ও ভালো করে তিনি পড়তেন, অন্তত দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনামের দিকেও নজর দিতেন, তা হলে জানতেন যে এজাজের আলোচ্য বিষয়গুলির অন্যতম হল : 'ideologies of immigration'। বইয়ের গোড়াতেই তাঁর বক্তব্যের অভিমুখ এইভাবে বুঝিয়েছেন এজাজ :

> The characteristic feature of contemporary literary radicalism is that it rarely addresses the question of its own determination by the conditions of its production and the class location of its agents... the intention [of *In Theory*], rather, is to mark a break with the existing theoretical formation... This **necessarily** [বড়ো হরফ আমার—দী. চ.] involves raising the suppressed questions of institutional site and individual location....*(In Theory,* London, 1992, pp. 6-7).

আমেরিকায় পড়াশুনা ও অধ্যাপনার (যতদূর জানি প্রায় বিশ বছরের) কথা তুলে আমি এজাজের নিজের প্রশ্নের মুখ তাঁরই দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি। কোন্ 'suppressed institutional site'-এ এজাজের ভাবনাচিন্তা তাদের নিজস্ব রূপ পরিগ্রহণ করেছে—এ প্রশ্ন করলে আমেরিকা তথা পশ্চিমের কথা বাদ দেওয়া যায় কি ? আমার 'বেমালুম চেপে যাবার' অভিযোগ তো তাঁর নিজের ব্যবহৃত 'suppressed' কথারই প্রতিধ্বনি মাত্র ! এজাজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সব্যসাচীবাবুর মতো আমিও উদাসীন। কিন্তু বুদ্ধিজীবী এজাজের অসততা সম্বন্ধে পাঠক হিসেবে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে বৈকি। হোমি ভাবা প্রমুখের বিচারে যে-মাপকাঠির প্রয়োগ করেন এজাজ, নিজেকে তিনি তার থেকে রেহাই দেন, রেহাই দেবার প্রসঙ্গটি সযত্নে পরিহার করে চলেন, এতে তাঁর চিন্তাভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে না।

অমনোযোগিতাবশত আরও অনেক অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলেছেন সব্যসাচীবাবু। তাঁর ধারণা, আমি বলতে চেয়েছি 'শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব বাতিল'। বলি নি কথাটা, সব্যসাচীবাবু আবার পড়ে দেখবেন। যে বক্তব্যে 'বিরাগ' দেখিয়েছিলুম তা এই যে, ' "শ্রেণীসংগ্রামের" তত্ত্বেই ইতিহাসের **সমস্ত চাবিকাঠি** লুকোনো থাকে।' ('সমস্ত চাবিকাঠি' বড়ো হরফ করে দেখালুম বাক্যাংশটির ঝোঁক বোঝানোর জন্য।) নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিচার করতে চাওয়াটাই অপরাধ, এমন কথা বলি নি। 'মননশীল, চিন্তাবিদ' মানুষদের রচনা 'নীতিবায়ুগ্রস্ত' হিসেবে পড়ার অভ্যাসের বিরোধিতা করেছিলাম। যেমন ধরুন হাইডেগার বিরাট দার্শনিক ছিলেন আবার নাট্‌শি পার্টির সভ্যও ছিলেন। অনেকে এই দ্বিতীয় কারণেই তাঁর সমস্ত চিন্তা বর্জন করতে চান— এইরকম মনোভাবের বিরোধিতা করেছিলাম আমি। গান্ধির প্রসঙ্গেও এমন সব কথা তুলেছেন সব্যসাচীবাবু যার সঙ্গে আমার রচনার কোনো যোগাযোগ নেই। আমার দাবি ছিল অত্যন্ত সীমিত। বলেছিলাম, 'ইয়োরোপীয় আধুনিকতার "ক্রিটিক" করলেই যদি তা ফ্যাসিবাদ হয় তা হলে তো মহাত্মা গান্ধি সবচেয়ে বড়ো ফ্যাসিবাদী !' এই কথাটির কি কোনো বিরুদ্ধ যুক্তি আছে সব্যসাচীবাবুর ? নাকি তিনি গান্ধিকেও ফ্যাসিবাদী বলবেন ? গান্ধি বই-পড়ার প্রশ্রয় দিতেন কি না তা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য ছিল না। (সব্যসাচীবাবু মাও-চিন্তাধারার কথা বলেন ; ওঁর মনে থাকবে হয়তো যে ষাটের দশকে মাও-এর নাম ক'রে কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হত 'যে যত বই পড়ে সে তত মূর্খ হয়'। স্মৃতি সতত সুখের নয় !)

মার্গসংগীতের প্রশ্নেও ওই একই কথা। বিষয়টি একটি সাধারণ বক্তব্যের উদাহরণ ছিল। আমার সাধারণ বক্তব্যটিতেই কিছু ভুল আছে কি না, উদাহরণ হিসেবে মার্গসংগীতের প্রয়োগ সিদ্ধ কি না, এসব নিয়ে কিছু বলেন নি সব্যসাচীবাবু। আমি কেন লোকসংগীত উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করি নি তা-ই তাঁর অভিযোগ। লিখেছিলাম, 'আমরা আত্মীয়তায়, সংগীতে, শিল্পে...' ইত্যাদি ; সব্যসাচীবাবু বাঁকা প্রশ্ন করেছেন : 'এই "আমরা"

কারা, তা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে কি?' নিশ্চয়ই যাবে। প্রবন্ধ লিখেছি বাংলায় বিশ্বভারতী পত্রিকার জন্য। অক্ষরজ্ঞানে-শিক্ষিত বাঙালি হিসেবে অক্ষরজ্ঞানে-শিক্ষিত অপর বাঙালিকে উদ্দেশ্য করে— 'আমরা' কথাটি লেখক-পাঠকের মধ্যে সেই সম্পর্কেরই সূচক। এখন এই সম্পর্কের মধ্যে কারা পড়েন সে-বিচারের ভার সব্যসাচীবাবুর হাতে ছেড়ে দিলাম।

'...পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের দাবিকে বৈধ বলে মানা হবে কোন্ যুক্তিতে?' যদি ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান বৈধ হয় তা হলে 'পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ তৈরির বৈধতা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?' প্রশ্নগুলো সব্যসাচীবাবুর। এসবের পিছনে তাঁর বড়ো প্রশ্ন : 'ধর্মের ভিত্তিতে জাতিপরিচয় নির্ধারণ ও তারই জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের দাবি কি সত্যি যুক্তিসংগত?' দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নে পরে আসছি। প্রথম প্রশ্নটা পড়েই বুঝেছিলাম আমার বক্তব্য সব্যসাচীবাবুর কাছে পরিষ্কার হয় নি। পাকিস্তানের বৈধতা বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বক্তব্য ছিল না। পাকিস্তান যে উপমহাদেশীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের কোনো অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল না, এ কথা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদের মূল ধারার বাইরে তাঁদের নিজস্ব জাতিরূপ নির্ধারণ করেছিলেন। সেই প্রচেষ্টার মধ্যে বিভাজ্যতা ছিল— কোন্ ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদ-ই বা এই বিভাজ্যতা-দোষ থেকে মুক্ত?— কিন্তু কংগ্রেসী ধারার বাইরে তৈরি-হওয়া এই প্রচেষ্টাও বৈধ। কংগ্রেসী ইতিহাসচর্চায় এই বৈধতাকে 'Muslim separatism' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে খাটো করে দেখা হয়। এজাজ় আহ্‌মদের বইয়ে আমি এই কংগ্রেসী প্রবণতারই পরিচয় পেয়ে প্রতিবাদ করেছি।

সব্যসাচীবাবু বলবেন, 'ধর্মের ভিত্তিতে জাতিপরিচয় নির্ধারণ... কি সত্যি যুক্তিসংগত?' এখানে সব্যসাচীবাবু ও আমি দ্বিমত। ইতিহাস কোনো ব্যক্তিমানুষের যুক্তির নিয়ম মেনে চলে না। কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা রাষ্ট্রের বৈধতা সচরাচর একটি ব্যাবহারিক প্রশ্ন হিসেবে ধরা হয়। পৃথিবীতে আজ বহু রাষ্ট্র আছে যার জাতিরূপ নির্ধারণের প্রচেষ্টার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে একমত নই। যেমন ধরুন, ইন্দোনেশিয়া: গণতন্ত্র নয় ; মিলিটারি-শাসিত এক রাষ্ট্রব্যবস্থা, পূর্ব টিমর প্রদেশে তার ভূমিকা রীতিমতো সাম্রাজ্যবাদী, তাই বলে কি ইন্দোনেশিয়াকে 'অবৈধ' রাষ্ট্র বলব? আমার প্রবন্ধে কিন্তু বৈধতার প্রশ্নটা ছিল গণতান্ত্রিক বিচারের প্রশ্ন। ভারতীয় উপমহাদেশে বেশির ভাগ মুসলমান মানুষ যদি 'মুসলমান' হিসেবেই কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদ থেকে দূরে থাকতে চেয়ে থাকেন, তাঁদের সেই সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষাকে— একজন গণতান্ত্রিক মানুষ হিসেবেই— আমি 'বৈধ' বলে মনে করি। এর দ্বারা তাঁদের সঙ্গে বা তাঁদের মূল্যবোধের সঙ্গে আমি একমত, এ কথা বলা হচ্ছে না।

তবে জাতিপরিচয় নির্ধারণের ভিত্তিও সময়ে বদলাতে পারে। কোনো রাষ্ট্রই অনন্ত বৈধতার গ্যারান্টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। ১৯৭১ সালে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রটি বাংলাদেশে আর বৈধ ছিল না। তার মানে এই নয় যে ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে 'পাকিস্তানে'র কোনো বৈধতা ছিল না। 'বাংলার জনগণ...পাকিস্তান সৃষ্টির বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছিল এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল'— এ মন্তব্যে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু মন্তব্যটি করেছেন শেখ মুজিবের জীবনীকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম স্বয়ং (দ্র. মযহারুল ইসলাম, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব', ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ ৫২)।

আর দু-তিনটে কথা বলে এই কূট-কচালের পর্ব শেষ করি। আমি লিখেছিলাম, আমাদের সত্তর-দশকের ইতিহাসচর্চায় 'ধনতন্ত্র' বা 'সামন্ততন্ত্র' জাতীয় কথাগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হত। সব্যসাচীবাবু 'আধা-সামন্ততন্ত্র'র কথা তুলেছেন। দুঃখের বিষয় যে ওতে আমার কথা কিছু অপ্রমাণ হয় না। 'সামন্ততন্ত্র' ক্যাটিগরি মেনে নিয়েই 'আধা'-র কথা ওঠে। 'আধা'-তো আর 'সামন্ততন্ত্রের' ক্রিটিক নয়, 'আধা'-তো একটি মাপ মাত্র! (আধা-পোয়া বললে কি 'পোয়া'র ধারণাটিকে অস্বীকার বা সমালোচনা করা হয়?)

(বুর্জোয়া) গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কথা তোলায় সব্যসাচীবাবু আমার মধ্যে 'একধরনের ইয়োরোপ-

আচ্ছন্নতা' দেখেছেন। প্রথমত বলি মার্ক্সবাদের একজন আগ্রহী ছাত্র হিসেবে ইয়োরোপীয় দর্শনে আমার কোনো অনীহা নেই। মার্ক্সকে গভীরভাবে জানতে চাইব অথচ ইয়োরোপীয় দর্শন বুঝতে চাইব না— এরকম কোনো স্ববিরোধী অভিমান আমার নেই। ভারতীয় ঐতিহাসিক হিসেবেই ফুকো-দেরিদা পড়ি। কেন পড়ি, তা-ই তো বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম গোটা প্রবন্ধটি জুড়ে। তার পরও সব্যসাচীবাবু প্রশ্ন করেছেন : 'ফুকো-দেরিদার সহায়তা কেন জরুরি ?' একটা গোটা প্রবন্ধ লিখে যা বোঝাতে পারি নি তা এখন দু লাইনে পরিষ্কার করতে পারব, এমন বিশ্বাস হয় না। তাই প্রশ্নটা আলোচনা না-করেই ছেড়ে দিলাম আপাতত।

সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি নীট্শে সম্বন্ধে সব্যসাচীবাবুর মন্তব্য পড়ে। লিখেছেন, 'নীট্শে এই শতকের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক, সে তো এই অর্থেই যে তাঁর রচনা তৈরি করে দিয়েছিল ফ্যাসিবাদের ভিত্তি।' প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমি 'এ যুগের' লিখেছিলাম, 'এই শতকের' নয়, কারণ নীট্শে উনিশ শতকের মানুষ, ১৯০০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু সত্যিই চমকিত হয়েছি একজন শিক্ষিত বাঙালির মুখে পুরোনো কুৎসা শুনে। 'নীট্শে ফ্যাসিবাদের ভিত্তি রচনা করে দিয়ে যান'— এ কথা আজকাল আর কাউকে বলতে শুনি না। সব্যসাচীবাবুর কথায় মনে পড়ল যে তাঁর আত্মজীবনী *Ecce Homo*-র শেষের পাতায় নীট্শে প্রশ্ন করেছিলেন : 'Have I been understood?– Dionysus against the Crucified...'। উত্তর দিয়েছেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক মাইকেল ট্যানার : 'The answer must be a resounding "No".' (Michael Tanner, 'Introduction' to Friedrich Nietzsche, *Ecce Homo : How One Becomes What One Is*, trans., R. J. Hollingdale, Harmondsworth, Middlesex, 1992, p. xvii)। আর কিছু না-হোক, সব্যসাচীবাবুকে আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীট্শে-বিশেষজ্ঞ Walter Kaufmann-এর *Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist*, (Princeton, New Jersey, 1974) পড়ে দেখতে বলি। সব্যসাচীবাবু যে-ধরনের মতবাদ পোষণ করেন, বইটি তার বিরুদ্ধে একটি অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, গবেষণাপুষ্ট বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

আর নীট্শে কেন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক, তাঁর গুরুত্ব আমি 'একটু বেশি বাড়িয়ে দেখতে' চাই কি না, সে প্রশ্ন মুলতুবি রাখলাম কোনো ভবিষ্যৎ আলোচনার আসরের অপেক্ষায়। প্রসঙ্গটি বৃহৎ। কূট-কচালে কথা এবারের মতো এখানেই শেষ করি। সব্যসাচীবাবুর কতগুলো ছোটো প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। ক্ষমাশীল পাঠকের ধৈর্যের ওপর অনেক পীড়ন হল। এবার ফিরে যাই দু-চারটি বড়ো প্রশ্নে যা সৌরীনবাবু ও সব্যসাচীবাবু তাঁদের পত্র মারফত তুলেছেন। প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তিবাদ ও ধর্ম ; নির্বাসন ও ঘরে-ফেরা

সব্যসাচীবাবুর নানান প্রশ্নের আড়ালে আন্দোলিত হচ্ছে একটি বড়ো প্রশ্ন, তা 'ধর্ম' নিয়ে। ঝাড়ফুঁকের বিরুদ্ধে লড়াই কী করে হবে, 'দীপেশ পৌঁছে যান ধর্মের আঙিনায়', 'আনন্দমঠে'র 'বিপদের বীজ', খোমেইনির ইরান, বিরসার ভগবান হয়ে যাওয়া, সইদ-এর তথাকথিত মরমীয়াবাদ, ভারুচার বিপজ্জনকতা— এসব কথাই ওঠে, কারণ 'ধর্মে'র মধ্যে মানুষের বিপদ দেখেন সব্যসাচীবাবু আর ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই তাঁর যুক্তিবাদকে হাতিয়ার মনে হয়। 'কোনো একদিন যা মানুষের আশ্রয় হয়েছিল', 'সময়ের পরিবর্তন'কে অস্বীকার করে কি 'আজও সেই আশ্রয়ের বিশ্বাসকে যৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন' করতে হবে ? অভিযোগটা শুধু রুস্তম ভারুচার বিরুদ্ধে নয়, 'সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিক'দের বিরুদ্ধেও। আমার প্রবন্ধে 'ধর্ম' বিষয়ে কোনো সরাসরি আলোচনা নেই— কারণ কথাটি এজাজের বইতে ওঠে নি— কিন্তু প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আজকের ভারতবর্ষে।

বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। স্থানান্তরে (*Economic and Political Weekly* পত্রিকার ৮এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যায় 'Radical Histories and the Question of Enlightenment

Rationalism : Some Recent Critiques of *Subaltern Studies'* শীর্ষক প্রবন্ধে) এ নিয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি সম্প্রতি, সব্যসাচীবাবুর আগ্রহ থাকলে তাঁকে পড়ে নিতে অনুরোধ করব। কিন্তু একটি বক্তব্য সব্যসাচীবাবুদের কাছে নিবেদন করতে চাই : মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে 'ধর্ম' ও 'যুক্তি'-র সহাবস্থান অসম্ভব, তা হলে আমরা ঐতিহাসিক সত্য ও যুক্তিবাদী চিন্তা— দুদিক থেকেই ভুল করব। প্রথমত, এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসের তুলনায় মানুষের 'যুক্তিবাদী'ভাবে ভাবার ইতিহাস— অর্থাৎ rational argumentation-এর ইতিহাস— অনেক বেশি পুরোনো। যুক্তিবাদীভাবে ভাবলে যে একটি নিরীশ্বর পৃথিবীতে পৌঁছোতে হবেই— এমন কোনো অমোঘ নিয়ম নেই চিন্তার জগতে। খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে 'rationalist mystic'দের নিয়ে আলোচনা হয়, রামমোহন রায়ের ওপর ইসলামি যুক্তিবাদের প্রভাব নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা আছে সুমিত সরকারেরই একটি পুরোনো প্রবন্ধে ('Rammohun Roy and the Break with the Past'– প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল V.C. Joshi -সম্পাদিত *Rammohun Roy and the Modernization of India*, Delhi, 1972 গ্রন্থে) ; স্পিনোজার *Ethics* তো যুক্তিবাদীভাবেই ভগবৎবিশ্বাসী, আর কেপলার কি নিউটনের ধার্মিকতার কথা না-হয় বাদ-ই দিলাম (নিউটনের তো ম্যাজিকেও আগ্রহ ছিল)।

দ্বিতীয়ত, আমরা আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'যুক্তি'র যে চেহারাটা দেখি, সেইটাই যে 'যুক্তি'র একমাত্র রূপ এমন-ও কোনো কথা নেই। চিন্তায় কার্যকারণ সম্পর্ক একধরনের যুক্তি। আবার আনুষঙ্গিক (associational) বা সাদৃশ্যচিন্তা (analogical thought) আর-এক ধরনের যুক্তি। সুতরাং যুক্তি মানেই যে তা ইয়োরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির যুগের বিজ্ঞানের 'যুক্তি'— এ-রকম ভাবলে ভুল হবে।

তৃতীয়ত, আসি Enlightenment rationalism-এর প্রশ্নে, যা-নিয়ে সব্যসাচীবাবুর এত ওকালতি। আজকের যুগে এই যুক্তিবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোচক নিশ্চয়ই জার্মান দার্শনিক হাবারমাস। সব্যসাচীবাবু নিশ্চয়ই জানেন যে হাবারমাস-ও যুক্তিবাদের দুটো চেহারার কথা বলেন— ১. বিমূর্তভাবে যুক্তির সম্ভাবনা (reason) আর ২. আমলাতান্ত্রিক ও আধুনিক প্রযুক্তিচালিত সমাজে যুক্তির চেহারা (rationalization)। প্রথমটির (অর্থাৎ 'reason'-এর) ঐতিহ্য রক্ষা করতে গিয়ে হাবারমাসকে যুদ্ধ করতে হয় দ্বিতীয়টির বিরুদ্ধে। হাবারমাসের অনুবাদক ও মন্ত্রশিষ্য টমাস ম্যাকার্থির ভাষায় হাবারমাসের অবস্থানটি এইরকম :

> There are, of course, good reasons for being critical of the illusions of the Enlightenment. The retreat of 'dogmatism' and 'superstition' has been accompanied by fragmentation, discontinuity and loss of meaning. Critical distance from tradition has gone hand in hand with anomie and alienation, unstable identities and existential insecurities.... There is no need to go on enumerating such phenomenon : a sense of having exhausted our cultural, social, and political resources is pervasive. But there is a need to subject these phenomena to a careful analysis if we wish to avoid a precipitate abandonment of the achievements of modernity. What is called for, it might be argued, is an enlightened suspicion of Enlightenment, a reasoned critique of Western rationalism, a careful reckoning of the profits and losses entailed by 'progress'. Today, once again, reason can be defended only by way of a critique of reason. (Thomas McCarthy, 'Translator's Introduction' in Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action : Reason and the Rationalization of Society*, trans., T. McCarthy, vol. 1, Cambridge, 1991, pp. vii-viii.)

আমি বলব, সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিকেরা অনেকেই এইরকম 'reasoned critique of reason'-এর কাজেই নিয়োজিত।

'ধর্ম' কথাটির অর্থও বহুমাত্রিক। ঈশ্বরবিশ্বাস, নীতিবোধ, আধ্যাত্মিকভাব থেকে শুরু করে আচার-আচরণ, তন্ত্রমন্ত্র, দেবদেবীর কথা, ডাইনি-ঝাড়ফুঁক সবই আমরা 'ধর্ম' কথাটির মধ্যে নিয়ে আসি। এ-সমস্ত সব সময়ই মানুষের শত্রু— এইরকম ভাবার কোনো কারণ আছে কি? অত্যাচার যেমন ধর্ম ব্যবহার ক'রে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি 'যুক্তি' ব্যবহার করেও হয়েছে— বর্তমানে যে-দেশে বসে এই চিঠি লিখছি, অস্ট্রেলিয়ায়, সেখানে তো আদিবাসী সমাজের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় মানুষেরা দুটি অস্ত্রই ব্যবহার করেছিলেন। আবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 'ধর্মে'র মাধ্যমে হয়েছে ; নিরীশ্বরবাদী আধুনিক মানবাধিকারও 'যুক্তি'র ভাষাতেও হয়েছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য দুপক্ষেই।

সব্যসাচীবাবুর চিঠি পড়ে মনে হয় (যথা : 'রুস্তম সময়ের পরিবর্তনকে স্বীকার করেন না, কোনো একদিন যা মানুষের আশ্রয় হয়েছিল, আজও সেই আশ্রয়ের বিশ্বাসকে যৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন করতে চান'), ধর্মকে তিনি অতীত ইতিহাসের অংশ বলে ভাবেন। কেন, বুঝলাম না। পাশ্চাত্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও পুরোনো সমাজব্যবস্থার অনেক দায়িত্ব আজ রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত। কিন্তু ধর্ম অতীত বা বিলুপ্ত কোনোটাই হয়ে যায় নি সেখানে, মায় 'কুসংস্কার' পর্যন্ত দিব্যি টিঁকে আছে! পরিবর্তন কিছু হয় নি তা নয় ; কিন্তু পরিবর্তনের এমন কোনো একমুখী (ধর্ম→যুক্তি) ধারা আছে বলে মনে হয় না।

আসলে, সৌরীনবাবু তাঁর চিঠিতে যা বলেছেন, সময়টা জটিল। সময় হয়তো মানুষের জন্য বরাবরই জটিল ছিল ; কিন্তু উনিশ শতকী ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবে আমরা চিন্তায় কতগুলো সহজ সমীকরণ তৈরি করে নিয়েছিলাম : একমুখী ইতিহাসের কথা, প্রগতির কল্পনা (the idea of progress), সরল বীজগণিতের মতো মার্ক্সবাদ ইত্যাদি। তাতে আমরা ধরেই নিতাম, খানিকটা 'শিক্ষিতে'র অভিমানে, যে আমরা যাঁরা 'প্রগতি'-র চিন্তা করতে শিখেছি তাঁরা আলোকপ্রাপ্ত আর যাঁরা শেখেন নি তাঁরা হয় অজ্ঞানতার অন্ধকূপে পড়ে আছেন নয়তো তাঁরা প্রগতির শত্রু, প্রতিক্রিয়াশীল। সময়টা জটিল, তার কারণ এই : 'প্রগতি'চিন্তার সমালোচনা করে যদি এই দাবি তোলা যেত যে 'দাও ফিরে সে অরণ্য...' ইত্যাদি, আধুনিক বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বা চিকিৎসাবিদ্যার কোনো প্রয়োজন নেই, দরকার নেই গণতান্ত্রিক অধিকারের, তা হলে আমাদের বর্তমান দার্শনিক ধ্যান-ধারণা ও জাগতিক-রাজনীতিক কর্তব্যের মধ্যে বেশ-একটা সহজলভ্য সামঞ্জস্যে আমরা ফিরে যেতে পারতাম। সময়টা জটিল এই কারণে যে দর্শন ও কর্মে এই সামঞ্জস্য আর সহজলভ্য নয় : দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করা ও দুনিয়াকে পালটানোর মধ্যে যে যোগসূত্র তাঁর একাদশতম থিসিসে মার্ক্স কল্পনা করে নিয়েছিলেন, সেই কল্পনায় আজ একটা ফাটল ধরেছে। এই ফাটল ফুকো-দেরিদা ধরান নি ; তাঁরা 'ফাটল'টিকে নিয়ে কীভাবে ভাবনা-চিন্তা করা যায়, তাতেই সাহায্য করেন মাত্র। চিড় ধরেছে চিন্তার নিজস্ব কারণেই। অথচ রাজনীতিক কর্তব্যের চরিত্র বদলায় নি। এখনো লড়াই করে মানুষকে জিতে নিতে হবে গণতান্ত্রিক অধিকার, 'ব্যক্তি' হয়ে ওঠার স্বাদ ; যদিও জানি— ক্যারল পোম্যান-এর বা ল্যুস ইরিগার-এর রচনার কথা প্রবন্ধেই বলেছি— 'ব্যক্তি'র চিন্তা, 'অধিকার'-এর চিন্তা এগুলো আজ আর নিঃসংশয়, তর্কাতীত বিশ্বাসের জায়গা হতে পারে না। সময়টা এই কারণে জটিল যে, যে-'বিশ্বাস' প্রগতিশীল রাজনীতির পক্ষে অপরিহার্য— এবং সেই অর্থে 'বিশ্বাস' হিসেবেও অপরিহার্য— তা আর (পুরোনো অর্থে, অর্থাৎ সন্দেহের অতীত) 'বিশ্বাস'-এর জায়গা নিতে পারে না। বিশ্বাসের প্রশ্ন আজ তাই পরিণত হয়েছে নিছক কার্য-সম্পাদনের (performativity) প্রশ্নে।

এই কারণেই 'নির্বাসনে'র বিষয়টিকে— 'নিজভূমে পরবাসী' থাকার কথাটা, সৌরীনবাবু যা লিখেছেন— তা আজ জরুরি হয়ে উঠেছে। একটা সময় ছিল, যখন নেহরুর মতো মানুষ নিজের শিক্ষা-দীক্ষার বশে চার পাশের ম্লানমুখ ভারতবাসীর মধ্যে নিজেকে 'পরবাসী' বোধ করতেন। কিন্তু নেহরুর আত্মরক্ষার কবচ ছিল প্রগতিচিন্তায়। যে শিক্ষা ওঁকে 'পরবাসী' করেছে তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিলেই তো সবাই 'শিক্ষিত ভারতবাসী'

হয়ে উঠবে, সুপ্ত ভারতীয় 'ঐক্য' জেগে উঠবে সেই প্রচেষ্টায়, এবং নেহরুর 'পরবাসী' বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বেরও পরিসমাপ্তি হবে সেই মুহূর্তে— নেহরুধর্মী এই বিশ্বাসেই তো বার বার ভরসা খুঁজে পেয়েছেন প্রগতিশীল মানুষেরা। কিন্তু চিন্তার এই রক্ষাকবচ যদি আর না থাকে ? যদি বুঝি যে যাঁদের আমরা (প্রধানত মধ্য কি উচ্চবিত্ত বৈজ্ঞানিক-যুক্তিবাদী পুরুষেরা) 'অশিক্ষায়-থাকা-মানুষ' হিসেবে কল্পনা করি— আত্মজৈবনিক স্বরে বলতে গেলে মনে পড়ে যায় : সাদার্ন অ্যাভিনিউ-র কালীবাড়িতে বিকৃতমস্তিষ্ক পুত্রের শুভার্থে জ্যেঠিমার ব্যাকুল যাতায়াত, জামাই-এর চাকুরির জন্য বন্ধুর শাশুড়ীর কালীঘাটে মানত, অসুস্থ স্বামীর শারীরিক কল্যাণকামনায় সুদূর তিরুপতি মন্দিরে স্নেহময়ী বন্ধুপত্নীর প্রার্থনা, পাড়ার বস্তির ছেলেদের শীতলাপুজো, বাঁক কাঁধে করে তারকেশ্বরে ছোটা— যদি ভাবি যে এই 'অশিক্ষা'র মানুষগুলো আসলে অন্য ধরনের বিশ্ব-নিরীক্ষায় রত, এমন সব জগৎ-কল্পনা যা একই সমাজের মানুষ বলে আমার চেতনা ও অস্তিত্বকেও ছুঁয়ে আছে সর্বত্র, অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি কিন্তু বৌদ্ধিক জ্ঞান দিয়ে সব সময় বুঝতে পারি না সেইসব কল্পনাকে, তখনই তো নষ্ট-হওয়া কলের মতো অকেজো হয়ে যায় সহজ সমীকরণগুলো। সমাজতন্ত্রের কাচ দিয়ে যে পৃথিবীকে একটি অখণ্ড জগৎ বলে ভাবি, তাকেই খণ্ডিতরূপে দেখি এই নানান সম্ভাব্য (possible) জগৎ-কল্পনার দৈনন্দিন প্রকাশে। এ কথা কী করে গোপন করি যে এই জগৎ-কল্পনার, এই বৈচিত্র্যের সামনে দাঁড়িয়ে মনের মধ্যে সঞ্জাত হয় এক গভীর সন্দেহ : ইতিহাসের কোথাও কি আছে সেই অমোঘ নিয়ম যা এই সমস্ত ভিন্নমার্গী জগৎ-কল্পনাকে মিলিয়ে দেবে একদিন কোনো একটি আধুনিক ইয়োরোপীয় রাজনীতিক দর্শনের উন্মুক্ত রাজপথে, যে-পথের শেষে আছে সেই প্রতিশ্রুত দেশ যেখানে যাত্রী-মানুষের জন্য রাখা আছে বিশ্রামের ছায়া, তৃষ্ণার জল ও রাত্রির আশ্রয় ? অথচ আমরা তো ইয়োরোপীয় অষ্টাদশ শতকের ঔপনিবেশিক সন্তান, আমাদের মাথায় সারাক্ষণ জেগে থাকে 'রাজনীতিক দর্শন', সেই আলোকদ্রষ্টা, ক্ষমতাসম্পন্ন, আধুনিক ইয়োরোপীয় পুরুষের কণ্ঠস্বর আর তাঁর সেই ধনুকভাঙা পণ— এই অজস্র, পরস্পর-অমেয় বৈচিত্র্যবহুল জগৎ-কল্পনাগুলিকে নানান 'ল.সা.গু-গ.সা.গু.'র আঁক কষে মেলাবেন-ই তিনি মেলাবেন !

'নাইয়া' পত্রিকার বন্ধুবর্গের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, পৃথিবীর একটা একমুখী 'উন্নতি' করা সম্ভব, এমন রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা ইতিহাসের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধতা করেই জন্ম নেয়। সব্যসাচীবাবু এতে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। আরও বড়ো মানুষকে শালিস মানি তা হলে— কথাটা কেবল আমার নয়, কয়েক দশক পূর্বে এইরকম লিখেছিলেন থিয়োডোর অ্যাডোর্নো :

> Universal history must be construed and derived. After the catastrophes that have happened, and in view of the catastrophes to come, it would be cynical to say that a plan for a better world is manifested in history and unites it. Nor to be denied for that reason, however, is the unity that cements the discontinuous, chaotically splintered moments and phases of history– the unity of the control of nature, progressing to rule over men, and finally to that over men's inner nature. No universal history leads from savagery to humanitarianism, but there is one leading from the sling-shot to the megaton bomb. It ends in the total menace which organized mankind poses to organized men, in the epitome of discontinuity. It is the horror that verifies Hegel and stands him on his head. (Theodore Adorno, *Negative Dialectics*, trans., E.B.Ashton, London, 1990, p. 320.)

এত নৈরাশ্যবাদী ছবি পাশ্চাত্যের অনেক মানুষেরই পছন্দ নয় দেখেছি। বর্তমান কলকাতার নাড়িও আমার হাতে নেই, তাই কথাগুলো কলকাতার পাঠকের কেমন লাগবে জানি না। কিন্তু মানুষের ইতিহাসের

একটি-ই মানে খুঁজতে গেলে, তার নানান বৈচিত্র্যকে কতগুলো অভিন্ন বিশ্বজনীন পরিচয়ের (identity) মাধ্যমে ধরতে গেলে যে হেগেলীয় মায়াবাদ— অনেক সময় মার্ক্সের নাম করেই— তৈরি হয়, তার সর্বনেশে দিকের কথা পরিষ্কার করে লিখেছেন অ্যাডোর্নো :

> Under the all-subjugating identity principle, whatever does not enter into identity, whatever eludes rational planning in the realm of means, turns into frightening retribution for the calamity which identity brought on the non-identical. There is hardly another way to interpret history philosophically without enchanting it into an idea. (Adorno, *Negative Dialectics,* p. 320.)

সব্যসাচীবাবুরা বলবেন, তবে কি 'শ্রেণী', 'ক্যাপিটাল', 'প্রোলেতারিয়েত' এই বিশ্বজনীন পরিচয়জ্ঞাপক ক্যাটিগরিগুলো বাতিল ? না, এরা বাতিল নয় ; কিন্তু নানান সম্ভাব্য জগৎ-কল্পনার মধ্যে এরা একটি-ই ; একমাত্র নয়। এইসব জগৎ-কল্পনা আমাদের রচনা করতে, বাঁচতে, বুঝতে ও বর্ণনা করতে সাহায্য করে। 'নাগরিক', 'মানুষ' (the human), 'মানবাধিকার', 'ক্যাপিট্যালিজম' ইত্যাদি ক্যাটিগরির সাহায্যে আমরা এই কাঠ-পাথরের পৃথিবীকে যে-জগতে মূর্ত করে আনি, তা অসত্য কিছু নয়, তার জাগতিক ক্ষমতাও অপরিসীম, আর সেই ক্ষমতার সত্যিকারের ফলাফল-ও আছে (যেমন, সুকান্ত-র ভাষায়, কারো মোটর গাড়ি চড়া ও কারো সেই মোটর গাড়ির তলায় অহেতুক চাপা পড়া।)। কিন্তু দুনিয়ার অন্য কল্পনাও আছে, তাদের পার্থিব ক্ষমতা কম হলেও তারাও অসত্য কিছু নয়, এবং সেইসব কল্পনাকে সবসময় ও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বজনীন ক্যাটিগরির সূত্রে অনুবাদ করাও সম্ভব নয়।

এই কারণেই আমাদের আজ আর কোনো একটি 'প্রধান প্রতিপক্ষ' নেই। লড়তে হবে নানান, এবং আপাতভাবে স্ববিরোধী, ফ্রন্টে। কথাটা খুব সুন্দর করে বলেছেন সৌরীনবাবু : 'জগাইয়ের রূপককে ঘুরিয়ে নিয়ে সদর্থক অর্থেও তো পড়তে পারি আমরা।... জগাই কোনো প্রধান প্রতিপক্ষ বেছে নেয় নি। সপ্তরথীর মার বলেই জগাইয়ের লড়াই আরও জটিল।' এভাবে চিন্তাটা আমার মাথায় আসে নি, সৌরীনবাবুর কথা শুনে চমৎকৃত হয়েছি, মন আপনি সায় দিয়েছে।

এই জটিলতার সময়ে 'নির্বাসন'-এর প্রশ্নটিও জটিলতর। এজাজের বইতে মানুষের দুটি ভাগ : সকল মানুষই দেশে কি বিদেশে সুবিধেমতো 'ঘর' খুঁজছেন, কেবল রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারে যাঁরা 'ঘর' থেকে বহিষ্কৃত, একমাত্র তাঁরাই এজাজের বিচারে 'নির্বাসিত'। 'Exile' প্রসঙ্গে এজাজ লিখছেন : And I do not mean people who live in the metropolitan countries for professional reasons but use words like 'exile' or 'diaspora'– words which have centuries of pain and dispossession inscribed in them– to designate what is, after all, only personal convenience. *(In Theory,* p. 85)। 'নির্বাসন' কথাটির এই আক্ষরিক ও ছোটো-মনের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেছিলাম, সৌরীনবাবুও 'নির্বাসন'-এর বৃহত্তর পাঠ পছন্দ করেন দেখে খুশি হলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে আমার বক্তব্য যদি গ্রাহ্য হয়— যে নানান সম্ভাব্য ও পরস্পর-মেলানো-যায়-না এমন সব দুনিয়ায় আমাদের নিয়ত গতায়াত, সত্যি যদি আমরা বিভিন্ন জগৎ-কল্পনার নানান কাঠামোর interstice-এ বাঁচি— তা হলে কেবল 'নির্বাসন'-এর ছকে, বা শুধু 'ঘর' ও 'পরবাস', এই দুই-এর বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বে আমাদের জীবনের জটিলতা ধরা যাবে না। আমাদের দেশে নানান ট্র্যাডিশনে 'ঘর'-কে বন্ধন বলেও তো ভাবা হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে 'ছন্নছাড়া', 'ঘরছাড়া পাগল', 'পলাতক'— এরা তো সদর্থক চরিত্রও বটে। তাই যদি হয়, তা হলে শুধু 'নির্বাসন'-এর নয়, 'ফেরা'-র প্রশ্নটিও জটিল। এজাজের রচনায় 'ফেরা'-ও বড়ো আক্ষরিক কথা— 'a small academic elite [in the West— DC] which knows it will not return' *(In Theory,* p. 85)। আমার বাঙালি মনের কাছে পাঠের এই আক্ষরিকতা সাড়া পায় না। আমার মাথায় ঘুরতে থাকে প্রিয় ও পরিচিত গানের কলি: 'ভিখারি মন

ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো'। ভিখিরির 'ঘর' নেই আর এই কলিটির অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে (এজাজের বর্ণিত কোনো এক 'determinate socialist project'-এর ফলে) যিনি অতীতে ভিখিরি ছিলেন তিনি-ই একদিন রাজত্ব করবেন (করলে করুন, তাঁর জয় হোক!)। আমি তো ঘরে ফেরার অর্থ বুঝি এই যে, যে মন-টা ভিখিরি ছিল একদিন সেই মনটার ভিতরে ঐশ্বর্য সঞ্চিত হওয়াই হল 'ফেরা'। আর যতই দেখি, ততই ভাবি, বৈচিত্র্যের অনুভব, 'বহু'র আস্বাদ, এ ছাড়া আর মনের ঐশ্বর্য কী হতে পারে?

শ্রীসব্যসাচী দেবকে ও শ্রীসৌরীন ভট্টাচার্যকে আমার ধন্যবাদ ও সপ্রীতি নমস্কার জানিয়ে এ চিঠি শেষ করছি।

দীপেশ চক্রবর্তী

স্বরলিপি

বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে
নিশীথেরই সমীরণ হায়— হায়।
মম মন হল উদাসী, দ্বার খুলিল—
বুঝি খেলারই বাঁধন ওই যায়॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

প্‌া	প্‌া I	ন্‌া	-া	-া	সা	সজ্ঞা	-া	-া	-া[র]	সনঃসঃ	-া	-া	-া
বু	ঝি	ও	০	ই	সু	দু০	০	০	০	রে ০০	০	০	০
		ন্‌সা	-রজ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	রা	জ্ঞা	-রা	-জ্ঞা	-া	-া	-া	-রসা
		ডা০	০ ০	কি	ল	মো	রে	০	০	০	০	০	০০
		সা	রা	রা	-া	-া	-া	সরা	-গমা	গা	গা	-া	-া
		নি	শী	থে	০	০	০	রি০	০০	স	মী	০	০
		গরঃ	-সঃ -া	-া	সন্‌া	সা	-া	সা	-রসা	-া	-মা	-া	-জ্ঞা
		র ০	০ ০	০	ণ ০	হা	য়্‌	হা	০০	০	০	০	০
		-া	-া	[র]জ্ঞা	জ্ঞা	[স]রা	-া	-া	সন্‌া	ন্‌া	-া	সা	-া
		০	য়্‌	বু	ঝি	ও	০	ই	সু০	দূ	০	রে	০
		-া	-া	-া	-া ॥	{ন্‌া	সা	গা	মা	পা	পা	-া	-া
		০	০	০	০	ম	ম	ম	ন	হ	ল	০	০
		-মগা	গা	গা	-া	মা	গমা	-গমপধা	[ধ]পা	মজ্ঞা	-া	-রা	সন্‌া
		০০	উ	দা	০	সী	দ্বা০	০০০০	র	খু০	০	০	লি০
		(সা	-া	-া	-া)}	সা	-া	গা	গা	{গা	গা	গা	গা
		ল	০	০	০	ল	০	বু	ঝি	খে	লা	রি	বাঁ
		মা	-গা	মগা	-মা	-া	মা	-রা	-মা	-া	-জ্ঞা	-া	-া
		ধ	ন্‌	ও০	০	ই	যা	০	০	০	০	০	০

-া	-া	^র^জ্ঞা	জ্ঞা	^স^রা	-া	-া	সন্‌া	ন্‌া	-া	সা	-া
০	য়্‌	বু	ঝি	ও	০	ই	সু০	দূ	০	রে	০

(-া	-া	-া	-া)}	-া	-া	প্‌া	প্‌া	II II
০	০	০	০	০	০	"বু	ঝি"	

গানটির তালমুক্ত গীতরূপ বিশেষভাবে অবহিত হওয়া আবশ্যক

এই গানটি ১৩৩০ সালে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ে গাওয়া হয়। প্রফুল্লচন্দ্র (বুলা) মহলানবিশের কাছে এ গানের কথা ও সুর প্রাপ্ত এবং স্বরলিপিকৃত। গানটি সাহানা দেবী টেপ-রেকর্ডে গেয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে তাও শোনা হয়েছে (৭.৭.১৯৬৪)।

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যার প্রথমেই রইল রবীন্দ্রনাথকে লেখা এক অসাধারণ রুশ কৃষকের চিঠি। তাঁর নাম নাজ়ারোভ। যদিও তিনি এ কথা বলে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন, '... এই চিঠির লেখক এক অতি সাধারণ ব্যক্তি', আমরা সহজেই টের পাই, এই মানুষটি সাধারণ মাপের নন মোটেই। হয়তো 'পাঠশালার প্রথম চৌকাঠ'-ও পেরোনো হয়ে ওঠে নি তাঁর, কিন্তু উত্তর রাশিয়ার সিচেভা নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামের এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথের বইপত্র পড়েছেন, গীতা উপনিষদ রামকৃষ্ণকথামৃত আর বিবেকানন্দ পড়েছেন, শিখেছেন ইংরেজি ভাষা। প্লটিনাস, পিরো প্রমুখ দার্শনিকদের রচনার সঙ্গেও পরিচিত তিনি। যাঁদের চিন্তাধারার প্রতি নাজ়ারোভের বিশেষ টান, তা থেকে বোঝা যায়, একটা খোলা আকাশ ছিল ওঁর মনের।

তিনি জানাচ্ছেন, 'জীবিকা আমার চাষবাস আর মধুসংগ্রহ'। এ-চিঠি পড়ে তাঁকে আমাদের আরও বুঝতে ইচ্ছে করে, আরও জানতে ইচ্ছে করে। কোথায় শিখলেন ইংরেজি ? ওঁর সামাজিক পরিচয়ই বা কী ছিল ? কীরকম কৃষক উনি ? যে সময়ে নাজ়ারোভ এ-চিঠি লিখছেন, তখন সোভিয়েত দেশে ঐকত্রিক (কলেক্‌টিভ) চাষের গোড়াপত্তন হচ্ছে, বদল হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের। সে সময়ে কতটুকু ছিল ওঁর জমিজমা ? এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে নি। তবে অনুমান করি, 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসের লেভিন-এর মতন অতটা সচ্ছল না হলেও, ওঁর সঙ্গে নাজ়ারোভের মস্ত মিল আছে এই জায়গায় : জীবনকে নিয়ে পুতুলখেলার মন আর মেজাজ পেরিয়ে এসেছেন দুজনেই। রবীন্দ্রনাথ তাই নাজ়ারোভের কাছে শৌখিন সাহিত্যচর্চার বিষয়ও নন, নৈর্ব্যক্তিক পাণ্ডিত্যচর্বণের বিষয়ও নন। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পথ-চলার সহচর, দিশারী। ভিতরের কোনো তাড়নায় রবীন্দ্রনাথকে তাঁর এত প্রয়োজন।

উত্তর রাশিয়ার ৩১ ডিসেম্বরের (১৯২৮) এক হাড়কাঁপানো শীতের সকালে যখন জানলার ধারে ধারে তুষারখণ্ড বুনে চলছে 'গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানা ধরনের গাছ-গাছালির' চিত্রবিচিত্র নকশা, তখন রবীন্দ্রনাথের বইগুলি ওঁর 'শীতল হৃদয়কে উষ্ণ করছে।'

'যেদিন প্রথম আমি আপনার ছবি দেখি', নাজ়ারোভ লিখছেন, 'দেখে মনে হয়েছিল আপনি আমাদের সাধারণ মানুষদের একজন।' 'মানবজাতির বিচ্ছিন্নতাকে দূর' করার এক কর্মসূচি নিতে চান তিনি। 'ইয়োরোপ আর এশিয়ার সংযোগসীমান্তে' কৃষ্ণসাগরের তীরে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন এক আশ্রম, যেখানে মিলিত হবে প্রাচ্যের প্রজ্ঞা আর পশ্চিমের বিজ্ঞান।

সোভিয়েত সফরের বছর দুয়েক আগে, সে-দেশেরই এরকম একজন অজানা আত্মীয়বন্ধুর চিঠি হাতে পৌঁছোলে রবীন্দ্রনাথ যে খুবই খুশি হয়ে উঠতেন, সন্দেহ নেই। তা ঘটল না। ঘটল না, সোভিয়েত সেনসরের খবরদারিতে। নাজ়ারোভের চিঠির যা গতি হয়, সে বিবরণ পূরবী রায় দিয়েছেন। সে বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে মনে পড়ছিল পিছনের ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডের বিপ্লবের সহযাত্রী মহাকবি মিলটন সেনসরের প্রতিবাদ করেন। আজ খুব জানতে ইচ্ছে করে, ১৯২৮-২৯ সালের সেই দিনগুলিতে সোভিয়েত দেশেও মিলটনের সমানধর্মা কেউ কি ছিলেন, যিনি— তাঁর মতোই— বেহেড সেনসর-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের অস্তিত্বের সমস্ত ওজন দিয়ে বলে উঠবেন :

> Give me the liberty to know and to argue freely according to my conscience, above all liberties.

রবীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন নাজ়ারোভ, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'— এই কবিতাটি 'আমার বড়ো প্রিয় প্রার্থনাসংগীত'। এই খবরটি পেয়ে আমাদের মনে পড়ে যায়, ওই একই কবিতা আবার দার্শনিক

রাসেলকেও প্রাণিত করেছিল, যে-সময়ে উনি রুখে দাঁড়ান প্রথম মহাযুদ্ধের হিস্টিরিয়ার বিরুদ্ধে। নাজারোভ আর রাসেল ! কোথায় অখ্যাত সিচেভা গ্রামের এক রুশ কৃষক ! আর কোথায় পশ্চিম মহাদেশের এক নামজাদা দীপ্যমান দার্শনিক ! রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা অনুরণন জাগাল এই পৃথিবীর কত ভিন্ন প্রান্তের, কত ভিন্ন ধরনের মানুষের হৃদয়ে ! তা-ও আবার অনুবাদের মারফত !

\+ + +

মিশেল ফুকোর যে-রচনাটির অনুবাদ এই সংখ্যায় ছাপা হল সেটা একালের পশ্চিমী শিল্প ও দর্শনচর্চার এক গুরুত্বময় নিদর্শন। এই লেখাটির প্রসঙ্গে যাবার আগে 'লাস মেনিনাস' বিষয়ে দু-একটা কথা বলে নেওয়া ভালো।

'লাস মেনিনাস' ছবিখানি ভেলাস্‌কেথ (Velásquez ১৫৯৯ - ১৬৬০) আঁকা শেষ করেন ১৬৫৬ সালে। শব্দটি স্প্যানিশ। এর মানে 'রাজকন্যার সহচরীরা'। ছবির আয়তন বেশ বড়ো : ৩১৮ × ২৭৬ সেন্টিমিটার। 'লাস মেনিনাস'কে এক বাড়তি মর্যাদা দিল শিল্পীর আত্মপ্রতিকৃতি।

প্রায় শুরু থেকেই শিল্পী আর চিত্ররসিক মহলে 'লাস মেনিনাস'-এর অভিঘাত দূরপ্রসারিত এবং গভীর। তবে চিত্ররূপ সৃষ্টিতে ভেলাস্‌কেথ এ-ছবিতে প্রতিভার যে-অসামান্যতার পরিচয় রেখে গেছেন, তার প্রথম সম্যক সমঝদার হয়তো গোইয়া (Goya ১৭৪৬ - ১৮২৮), যিনি 'লাস মেনিনাস'-এর নকল করেছিলেন একটি এচিং-এ। শুধু তা-ই নয়। 'চতুর্থ চার্ল্‌স এবং তাঁর পরিবারবর্গ' নামে তেলরঙের ছবিখানি গোইয়া আঁকেন 'লাস মেনিনাস'-এরই আদলে। একালে ভেলাস্‌কেথের এই ছবির থীম নিয়ে ৪৪ খানি ছবি এঁকেছেন পিকাসো (১৮৮১ - ১৯৭৩)। শিল্পী, বিষয় আর দর্শকের সম্পর্কগত রহস্য এই সিরিজের ছবিতে পিকাসো যেন মাইক্রোসকোপের লেন্সের ডগায় উদ্‌ভেদ করতে চেয়েছেন তন্ন তন্ন করে। ১৯৫৭ সালের ১৭ অগস্ট থেকে প্রায় দু মাস পিকাসোকে নিবিষ্ট করে রাখে এই 'লাস মেনিনাস'।

ভেলাস্‌কেথের এই ছবিখানি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। বিপুল সেই রচনাপঞ্জির মধ্যে মিশেল ফুকোর এই লেখাটি নতুন এক ধারার সৃষ্টি করল। এই-যে নতুন ধারা, এতে এখনও কাজ হচ্ছে। সম্প্রতি এই ধারাকে যাঁরা বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন, তাঁদের মধ্যে সের্ল (Searle) আর অ্যাল্‌পার্স (Alpers)-এর আলোচনা মনোযোগ দাবি করে আমাদের।

থীমের দিক দিয়ে দুটো কেন্দ্রবিন্দু থেকে শুরু ক'রে মিশেল ফুকো ক্রমে ক্রমে ওঁর আলোচনার পরিধি ছড়িয়ে দেন। ওই বিন্দুদুটি বিচ্ছিন্ন নয় ; সংলগ্ন। প্রথমটি হচ্ছে : দর্শককে ছবির কম্পোজিশনের মধ্যেই টেনে নিয়ে আসার ঘটনা। এই সূত্রে আমাদের সমকালের একজন মস্ত নন্দনতাত্ত্বিক লিখেছেন, '... [*Las Meninas* is perhaps] the most daring case of drawing the beholder into a composition, and also artistically the most perfect.'।

ফুকোর এই আলোচনার দ্বিতীয় কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে : উপস্থাপনার (representation) স্ববিরোধ। ফুকোর বিবেচনায় 'লাস মেনিনাস' হল 'ক্ল্যাসিকাল উপস্থাপনার উপস্থাপনা'। এবং তার স্ববিরোধ এই যে 'যা এ-উপস্থাপনার বনিয়াদ, তারই' ঘটে 'আবশ্যিক অন্তর্ধান'। যা উপস্থাপ্য (উপস্থাপনার বিষয়), তা উপস্থাপিত হয় না ; যা উপস্থাপিত, তা উপস্থাপ্য নয়।

ফুকোর এই বিশ্লেষণ ছবিবিচারের চৌহদ্দির বাইরেও, সাম্প্রতিক মননের ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও আলোড়ন তোলে। তবে ফুকোর তত্ত্ব যাঁরা মানেন না, তাঁরাও এ-রচনার কদর বোঝেন। আসলে, 'লাস মেনিনাস'-এর সামনে মিশেল ফুকোর চোখমন যেভাবে সাড়া দেয়, তার ক্রিয়াতেই আমাদের ছবি-প্রত্যক্ষণের দিগন্ত আরও খুলে যায়।

এমন নয় যে 'লাস মেনিনাস' বিষয়ে মিশেল ফুকোর এই ভাষ্যই চূড়ান্ত। কী শিল্পের ইতিহাসে, কী

দর্শনের ইতিহাসে, শেষ কথা বলে কিছু নেই। এমনও নয় যে ওঁর এই ভাষ্য সবাই মানছেন। এখনও এ নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে। তবে অনেক তর্কই অযৌক্তিক। যেমন, সাম্প্রতিক কালের এক প্রসিদ্ধ ভেলাস্‌কেথ-বিশেষজ্ঞ এইরকম আপত্তি তুলেছেন : ফুকো আর ওঁর অনুবর্তীরা নিশ্চিন্তে অনুমান করে বসেছেন যে 'লাস মেনিনাস' দর্শকদের জন্যে আঁকা। কিন্তু এ অনুমান ভুল। কারণ ভেলাস্‌কেথ তো ছবিখানি দর্শকদের জন্যে আঁকেন নি ; এঁকেছিলেন রাজার জন্যে।

বড়ো বড়ো পণ্ডিতের এসব কথায় ধাঁধা লাগে। প্রথমত, রাজাও কি দর্শক নন ? এবং সেই দর্শক নন, যিনি ছবির কম্পোজিশনের মধ্যে হাজির ? দ্বিতীয়ত, এমন শিল্পী কি কোথাও আছেন, যিনি, দর্শক উপস্থিত, এইটে মনে মনে— সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে— ধরে না নিয়ে ছবি আঁকেন ?

\+ + +

'বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে'— এই গানের স্বরলিপি ছাপা হল বর্তমান সংখ্যায়। প্রাসঙ্গিক এই তথ্যটুকু এখানে যোগ করি : রাজেশ্বরী দত্তের গলায় হিন্দুস্থান-এর একটি রেকর্ডেও (H 2142) গানখানি ধরা আছে।

\+ + +

নাজারোভ-এর চিঠিখানি পাওয়া গেল এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিখানি বেছে দিয়েছেন কল্পাতি গণপতি সুব্রহ্মণ্যন্‌ আর তার ফোটোকপি পেয়েছি রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে। রামন শিব কুমার 'লাস মেনিনাস'-এর ফোটো তুলে দিয়েছেন। সুনন্দা সান্যাল এনে দিয়েছেন ওঁর মামা বনবিহারী ঘোষের লেখা স্মৃতিকথা। বনবিহারী ঘোষ আর সুনন্দা সান্যাল— দু জনেই— জানিয়েছেন, এই তিনখানি রচনার মধ্যে তৃতীয়টির প্রাথমিক পাঠ বেরিয়েছিল দিল্লির সাকেত অঞ্চলের দুর্গাপূজার সুভেনিরে ; অন্য দুটি রচনা অপ্রকাশিত। তথ্যনির্ণয়ে বা বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন : অশোক সেন, সত্যজিৎ চৌধুরী, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, সুপ্রিয়া রায়, সুদক্ষিণা ঘোষ, বাবলি ভট্টাচার্য, সঙ্ঘমিত্রা মুখোপাধ্যায় আর আলপনা রায়চৌধুরী। এঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সূচিপত্র

বর্ষ ১—বর্ষ ৩০

শ্রাবণ ১৩৪৯— মাঘ ১৩৯২—আষাঢ় ১৩৯৩

লেখক ও তাঁদের রচনা

	বাঙালীর আদি ধর্ম। ৬/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৫	২৮৪-২৯৯
পঞ্চানন মণ্ডল	সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণি। ৬/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৪	১১৯-১২৮
পরিমল গোস্বামী	জগদানন্দ রায়ের কৃতিবৈচিত্র্য। ২৬/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬	২৯৬-৩০৮
	প্রাচীন মানুষের নূতন বিপদ। ১৩/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩	১৫১-১৫৫
	রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম। ১৮/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯	৪১৯-৪২৫
পল্লব সেনগুপ্ত	হেনরি ডিরোজিওর কবিতা। ২২/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭২	২৫৭-২৮৪
পশুপতি শাশমল	পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে বলেন্দ্রনাথ।	
	২৭/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭	১৪৭-১৬৮
	স্বর্ণকুমারীদেবীর গান। ২৪/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৫	৩১২-৩২৫
পার্থ বসু	জগদানন্দ রায়ের গ্রন্থপঞ্জী। ২৬/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬	৩১৮-৩২১
পিয়রসন দ্র : ডবলিউ. ডবলিউ. পিয়রসন		
পিয়ের ফালোঁ, ফাদার	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ১৮/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮	১৮৪-১৯৩
পুণ্যশ্লোক রায়	বাংলা ভাষার সুর ও ছন্দ। ১৬/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭	৩৪২-৩৪৯
	বাংলায় পরিভাষা-সংকলনের রীতিনীতি। ১৪/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৪	২০৩-২০৮
	লেখকের উত্তর। ১৯/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯	২২১-২২৫
	দ্র: 'বাংলা ভাষার সুর ও ছন্দ', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭ ও তার আলোচনা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯।	
পুলিনবিহারী সেন	জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। ১৫/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫	১৩১-১৪২
পুলিনবিহারী সেন ও পার্থ বসু	অবনীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের সূচী।	
	১৬/২-৩, কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬	১৯৫-২০৫
পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়	নেপালচন্দ্র রায়। ২৬/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬	৩৫৫-৩৬২
	নেপালচন্দ্র রায় -রচিত গ্রন্থ	৩৬২
পূর্ণাংশু রায়	গ্রন্থপরিচয়। ২২/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭২	১৮৫-১৮৬
পৃথ্বীশ নিয়োগী	রবীন্দ্রনাথের চিত্র। ২/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১	৪১৩-৪১৪
প্রণবরঞ্জন ঘোষ	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২৪/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪	১৬১-১৭৯
	নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা। ২৩/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪	২৮১-৩০৩
	বিদ্যাসাগর-চরিত-পরিক্রমা। ২৭/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭	১১৯-১২৮
	'সাহিত্যের বিশ্বামিত্র' : প্রমথ চৌধুরী।	
	২৫/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬	৩১৫-৩২৫
প্রণব রায়	গঙ্গামঙ্গলকাব্য ও প্রাণবল্লভের 'জাহ্নবী-মঙ্গল'।	
	২৮/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০	৩২৩-৩৩৭
প্রণয়কুমার কুণ্ডু	গ্রন্থপরিচয়। ২৭/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭	৩১২-৩১৪
	দীনেশচন্দ্র সেন ও বাংলার নবজাগরণ।	
	২৩/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩	১৩৬-১৪৩
	মেঘনাদ বধ কাব্যের পাঠান্তর। ২৯/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩	৪৭-৭৬
	রবীন্দ্রকাব্যের বিরামভূমি। ৩০/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৪	২১-৪০
	রবীন্দ্রনাট্যকৃতির প্রেরণা। ২৫/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫	২৬০-২৭০
প্রতিমা দেবী	গুরুদেবের ছবি। ১/২, ভাদ্র ১৩৪৯	১১৬-১২৬

	বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা। ১৬/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৬	৪৫-৫৮
	বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন। ২৮/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯	৬৩-৭৮
	বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস। ১৩/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩	১৪-২৪
	বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি। ১৩/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩	২২২-২৩১
	বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। ১৬/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭	২৪৯-২৬৬
	বাংলা কাব্যে দুই রীতি। ১৯/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০	৩২৩-৩২৭
	বিপিনচন্দ্র পাল। ১৫/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫	১৬২-২৬৮
	বিংশ শতাব্দীর কাব্যসূচনা। ১৮/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯	৪৭৭-৪৮৭
	রবীন্দ্রনাটকের নায়ক। ১৮/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮	৫৫-৬৩
	রবীন্দ্রনাটকের পূর্বসূত্র। ২৯/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩	৪-১৯
ভবানীশঙ্কর চৌধুরী	বস্তুর চেয়ে বাস্তব। ১/৩, আশ্বিন ১৩৪৯	১৫৪-১৫৮
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	গান : উঠল ভরে সারা গগন। ১৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮	২৬০-২৬১
মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত	বিশ্বভারতীর স্মৃতি ও আচার্য নন্দলাল বসু। নন্দলাল বসু সংখ্যা, ১৩৭৩	৫৪-৫৮
মদনমোহন কুমার	আলোচনা : বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নের প্রথম প্রবর্তন। ২/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০	৩৩৫-৩৩৬
মনোমোহন ঘোষ	আলোচনা : সংস্কৃত সাহিত্য ও চিত্রকলার আদর্শ। ৩/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১	৪৭-৫০
	দ্র : নীরদ চৌধুরীর প্রবন্ধ "গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলী"। কার্তিক-পৌষ ১৩৫০।	
	কালিদাস-রচনাবলীর কালানুক্রম। ২৪/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৮৭	২১২-২২১
	সাহিত্যের রূপ ও সাহিত্যবোধ। ১/৯, চৈত্র ১৩৪৯	৫৪৪-৫৪৮
	মহাকবি ভাস। ২৪/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪	১৩২-১৩৯
মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়	বানানের অন্তরালে। ৩০/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৪৮	১৪৬-১৫৫
মলিনা রায়	অনুবাদ : পত্রাবলী। রবীন্দ্রনাথ : সি. এফ. অ্যান্ডরুজকে লিখিত	
	১৯/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০	৪০৭-৪১৩
	২০/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০	৮৬-৯৪
	২০/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭০	১৭৮-১৮৪
	২০/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০	৩১১-৩১৮
	২১/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭১	১৬৪-১৭৪
মহেন্দ্রচন্দ্র রায়	মরিস মেটারলিঙ্ক। ৭/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬	২০৩-২১৭
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কবি দান্তে। ২২/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭২ দান্তের ষষ্ঠ জন্মশতবার্ষিক উৎসবে প্রেরিত। ১৮৬৫	২৩৭
মানকুমারী বসু	স্বাগত। ১৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮	২৬৩-২৬৪
মানবেন্দ্র পাল	বিশ্বভারতী পত্রিকা : সূচীপত্র বর্ষ ১—বর্ষ ২৫। ২৬/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬	৯৯-১৫৯
মীরা দেবী	ধর্ম ও বিজ্ঞান। ২৭/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭	৪৮-৫২
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দ।	

	২/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০	৩৩৬
মৈত্রেয়ী দেবী	প্রতিমা দেবী। ২৫/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫	২৯১-২৯৫
	রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ। ১২/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩	৩১৪-৩১৮
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	টলস্টয়-গান্ধী পত্রাবলী। ১৬/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭	৩৩৫-৩৩৭
	অনুবাদ : শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়	
মোহনলাল	Goethe কেমন বিজ্ঞানী ছিলেন ? (সঞ্চয়ন)। ১/৭, মাঘ ১৩৪৯	৪৬৪-৪৬৬
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী।	
	১৬/২-৩, কার্তিক-চৈত্র ১৩৬৬	২০৬-২২০
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	সাময়িকপত্রে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী।	
	২৯/২-৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৮৩	৩০৩-৩২৪
	অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সংবলিত গ্রন্থের তালিকা অন্তর্ভুক্ত।	
মোহিতচন্দ্র সেন	পত্রাবলী। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ১/৪, কার্তিক ১৩৪৯	২২৪-২২৫
মোহিতলাল মজুমদার	রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে : মূকেরে বাচাল করে।	
	১৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮	২৬৯-২৭০
যতীন্দ্রমোহন বাগচী	গান : সপ্ত সুরের সপ্ত ঘোড়া। ১৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮	২৫৭-২৫৮
	কবি-প্রশস্তি : রঞ্জিত করি পশ্চিম তট।	
	১৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮	২৫২-২৫৪
যোগীন্দ্রনাথ রায়	কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি। ১৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮	২৫৬-২৫৭
যোগেশচন্দ্র বাগল	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ১৮/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮	২৭৮-২৮৫
	গ্রন্থপরিচয়। ২১/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১	৮৬-৯৩
	জাতীয়তার উন্মেষে সাময়িক পত্র। ১০/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৮	১৫২-১৬১
	প্রবন্ধলেখকের উত্তর। ২/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১	৪৮৩-৪৪১
	দ্র : 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' মাঘ-চৈত্র ১৩৫০	
	ও বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১	৪৩৩-৪৩৭
	প্রবন্ধ লেখকের উত্তর। ৪/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৫২	১৬০-১৬৪
	দ্র : রাজনারায়ণ বসুর জীবনের এক অধ্যায়'।	
	কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ ও কার্তিক-পৌষ ১৩৫২	১৫৫-১৬০
	প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ৭/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৫	১৬৫-১৮০
	৭/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৬	২৪১-২৫২
	ভারতবর্ষীয় সভা। ১৯/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯	৮৬-৯৩
	১৯/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯	১৫৩-১৬৩
	১৯/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯	২৯১-৩০৬
	১৯/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০	৩৪২-৩৪৮
	২০/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭০	২৯৭-৩০৬
	২২/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২	৩০-৪১
	২৩/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩	৬৩-৭৪
	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০	২৭৫-২৮৮

অনুবাদ : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পালকি-বেহারার গান। ৮/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬ — ৮৭-৮৮

কবিতা : Palanquin-Bearers

অনুবাদ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেমগাথা। ৮/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬ — ৯৩-৯৪

কবিতা : Indian Love Song অনুবাদ : বিষ্ণু দে

বাসন্তী-ইন্দ্রজাল। ৮/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬ — ৯২

কবিতা : The Magic of Spring অনুবাদ : কানাই সামন্ত

বৃন্দাবনের বাঁশরিয়া। ৮/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬ — ৯৫

কবিতা : The Flute-Player of Brindaban.

অনুবাদ : সুশীল রায়

মৃতস্বপ্ন। ৮/২, কার্তক-পৌষ ১৩৫৬ — ৯০-৯১

কবিতা : My dead dream অনুবাদ : আর্যকুমার সেন

হায়দ্রাবাদ-নগরে সন্ধ্যা। ৮/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬ — ৯৪

কবিতা : Nightfall in the city of Hyderabad.

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

সি. এফ. এন্ডরুজ

আশা। ২৭/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ — ২৫৪

কবিতা : Hope অনুবাদ : অজিত দত্ত

ক্রশ। ২৭/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ — ২৫৫

কবিতা : The Cross অনুবাদ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

জাগরণ। ২৭/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭ — ২৫৩

কবিতা : The Awakening

অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পুজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে। ২৭/৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭

কবিতা : In as much অনুবাদ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিতাংশু রায়

গ্রন্থপরিচয়। ৩০/বি: মাঘ ১৩৯২-আষাঢ় ১৩৯৩ — ১৪৯-১৫১

সুকুমার বসু

গ্রন্থপরিচয়। ১১/৪, বৈশাখ-আষাঢ়১৩৬০ — ২৪৮-২৪৯

বিচিত্রা-পর্ব : স্মৃতিকথা। ১৮/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯ — ৪৩৭-৪৪৬

সুকুমার সেন

আমাদের সাহিত্যে ভূতের গল্প। ৫/১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৩ — ৩৩-৪০

আলোচনা : "অভিধান বনাম অন্বয়"।

৪/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩ — ৩০৩

দ্র : শশিভূষণ দাশগুপ্ত-র প্রবন্ধ, মাঘ-চৈত্র ১৩৫২।

আলোচনা : ছাপা বাংলা রচনায় যতিচিহ্ন।

২০/৩ মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ — ২৮৪-২৯৬

দ্র : 'বাংলায় যতিচিহ্ন : ১৮০১-১৮৫০ কার্তিক-পৌষ ১৩৭০

আলোচনা : 'রাজতরঙ্গিণী'। ৯/৩, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭ — ২০৫

দ্র : কার্তিক-পৌষ ১৩৫৭ — ১৪৮

আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ। ২১/২, কার্তিক-পৌষ ১৩৭১ — ১১৮-১২১

সংকলক : সুপ্রিয়া রায়
সহায়ক : আশিস হাজরা,
বাবলি ভট্টাচার্য এবং কেশবচন্দ্র সিন্‌হা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ০ সহকারী সম্পাদক সুবিমল লাহিড়ী

নবপর্যায় ১-৪ । শ্রাবণ ১৪০১ - আষাঢ় ১৪০২

বিষয়সূচি

চিত্রসূচি

APRIL-JUNE 1995 | Regd. No. R. N. 2700/57 | মূল্য ২০ টাকা
Registered with the Registrar of Newspapers

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রক্তকরবী

পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ

সম্পাদনা : শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু

শোধবোধ

নাটক

সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

রবীন্দ্র রচনাবলী · অষ্টাবিংশ খণ্ড

●

মুকুল দে

আমার কথা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৭ -কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টাইপসেটিং : পেজমেকারস্‌, ২৩বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৬।
মুদ্রক : পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬।